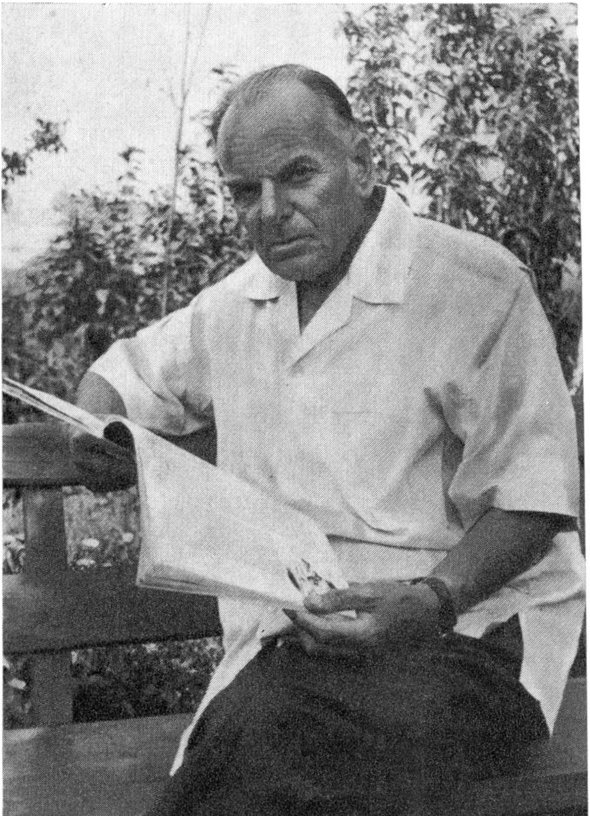
কন্‌স্তান্‌তিন পাউস্তোভ্‌স্কি

কল্‌খিদার বাদা

ও অন্যান্য গল্প





К. Паустовский

কনস্তানতিন পাউস্তোভস্কি

কল্খিদার বাদা

ও অন্যান্য গল্প

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

Константин Паустовский

«КОЛХИДА» И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

П $\frac{70302-529}{014(01)-81}$ 703—81 4702010200

সূচি

ভূমিকা	৫
কলখিদার বাদা	১১
তুষারের কাল .	২৪৮
কাচপুঁতির মালা	২৬৫
অক্টোবরের রাত	২৭৬
টেলিগ্রাম . .	২৯৫
রাশিয়ার হৃৎকেন্দ্রে .	৩২২
দেওদার-মঞ্জরীর সাজি	৩৪৯

ভূমিকা

লেখকের কাছে তাঁর নিজের রচনার ব্যাখ্যা আশা করা বৃথা। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে চেখভ বলতেন: ‘বরং আমার বই-ই পড়ুন, আমি তাতেই সর্বকিছু লিখেছি।’ চেখভের এই কথাগুলির আমি সাগ্রহ পুনরাবৃত্তি করতে চাই।

নিজের রচনা সম্পর্কে তাই আমি কয়েকটি ধারণার কথাই শুধু বলব।

আমার লেখকজীবন শুরু হয় সবকিছু জানা ও সবকিছু দেখার ইচ্ছে থেকে।

কিশোর বয়সে আমার ভীষণ টান ছিল অসামান্যের প্রতি।

অসামান্যের এই টান ছেলেবেলা থেকেই আমায় ব্যাকুল করে রাখত।

ছেলেবেলা কাটে আমার কিয়েভের ছোট্ট একঘেয়ে একটা ফ্ল্যাটে। অথচ চারপাশে সর্বদাই যেন শুনতে পেতুম তখন অসামান্যের হাওয়ার গুঞ্জন। নিজের বালকসুলভ

কল্পনা-শক্তি দিয়ে আমি যেন তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতুম।

এই হাওয়া আমার জন্যে বয়ে আনত ইউবনের গন্ধ, অ্যাটলান্টিকের তরঙ্গাঘাতে উপচিত ফেনা, গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝঞ্ঝাবজ্রের গুরুগুরু আওয়াজ, এওলিয়ান হার্পের সঙ্গীতধ্বনি।

কিন্তু অসামান্যের এই রঙিন জগতের অস্তিত্ব ছিল শুধু আমার কল্পনাতেই। আমি কখনও ঘন ইউবন দেখি নি (নিকিত্স্কি বটানিক্যাল গার্ডেনের কয়েকটি ইউগাছ ছাড়া), অ্যাটলান্টিক মহাসাগরও দেখি নি, দেখি নি গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশ আর এওলিয়ান হার্পের সঙ্গীতধ্বনিও শুনি নি কোনোদিন...।

জিমন্যাসিয়মে আমার প্রিয় বিষয় ছিল ভূগোল। তা যেন নির্লিপ্ত সমর্থন জানিয়ে বলত পৃথিবীতে অসামান্য দেশ আছে অনেক। ...সবকিছু জানা, দেখা, ভ্রমণ করা, মানবিক আবেগের বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ও দ্বন্দ্বে অংশ নেবার ইচ্ছে আমার মনে অসাধারণ কিছু একটা পেশা আয়ত্ত করার স্বপ্ন এনে দেয়। আর সর্বদাই মনে হতে থাকে সে-পেশাকে হতে হবে উদ্দীপনায়-ভরা এই জীবনের সঙ্গে জড়িত।

কিন্তু এ জগতে এমন পেশা আছে কি? যতই আমি এ কথা ভেবেছি, ততই একটার-পর-একটা পেশা আমার চোখের সামনে থেকে সরে গেছে। এ-সমস্ত পেশায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না। একনিষ্ঠ বিকাশে ও বৈচিত্র্যে এগুলি জীবনকে পুরোপুরি আলিঙ্গন করে ছিল না।

একসময় বেশ গুরুত্ব দিয়েই নাবিক হবার কথা ভেবেছিলুম। কিন্তু শিগগিরই লেখকজীবন আর-সবকিছুকে সরিয়ে সারা জায়গা জুড়ে নিল।

শেষ পর্যন্ত লেখাতেই এসে মিলে গেল পৃথিবীর সমস্ত চিত্তাকর্ষক পেশা। এ ছিল এক স্বাধীন, নির্ভীক ও কল্যাণকর কাজ।...

শাদাসিধে বাস্তবের সঙ্গে লীন-হয়ে-যাওয়া পর্যটনের কাব্যই বই লেখার শ্রেষ্ঠ উপাদান তৈরি করে। তাই আমার প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসে ও গল্পে ঘুরে বেড়ানোর ছাপ চোখে পড়বে।

প্রথমে ধরলুম দক্ষিণের পথ। এই পর্যটনের ফসল হল 'রোমাঞ্চপ্রেমী', 'উজ্জ্বল মেঘ', 'কারা-বুগাজ', 'কলখিদার বাদা' ও অন্যান্য গল্প।

উত্তরের দিকে আমার প্রথম যাত্রা — লেনিনগ্রাদ, কারেলিয়া ও কোলা উপদ্বীপে। সে ছিল আমার কাছে সত্যিই এক বিস্ময়ের ব্যাপার। উত্তরদেশের মনোমুগ্ধকর শক্তির পরিচয় পেলুম। উত্তরাঞ্চল আমার জীবনে 'শার্ল লন্‌সেভিলের ভাগ্য', 'হ্রদের তীরে ফ্রন্ট', 'উত্তরের কাহিনী', ইত্যাদি গ্রন্থগুচ্ছের আবির্ভাব ঘটায়।

তবে আমার কাছে সবচেয়ে ফলপ্রসূ আর আনন্দের ব্যাপার ছিল রাশিয়ার মধ্যাঞ্চলের সঙ্গে পরিচয়। এই পরিচয় ঘটে যথেষ্ট দেরিতে — আমার বয়স তখন ৩০ বছর ছুঁই-ছুঁই করছে। অবশ্য এর আগেও-যে আমি মধ্য-রাশিয়ায় যাই নি তা নয়, তবে সব সময়েই সেখানে গেছি কোথাও যাবার পথে, তাড়াহুড়ো করে। কখনও-কখনও এমনটাও হয়েছে: একটা মেঠো পথ কি টিলার ঢালে একটা গ্রামের দেখা পেয়েছি, আর হঠাৎ মনে হয়েছে এটা যেন অনেকদিন আগে কখনও দেখেছি, স্বপ্নেই হয়তো-বা, তবু সারা অন্তর দিয়ে একে ভালবেসে ফেলেছি।

সবচেয়ে নিবিড়, সরল আর অকপট আনন্দ আমি পেয়েছি

মেশ্চোরার বনাঞ্চলে গিয়ে। এ ছিল নিজের জন্মভূমির সান্নিধ্য পাওয়ার, পুঞ্জীভূত ও অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার, প্রিয় চিন্তাভাবনা আর কঠোর খাটুনির আনন্দ। আমার বেশির ভাগ রচনার জন্যে আমি রাশিয়ার মধ্যাঞ্চলের কাছে—শুধু তার কাছেই—ঋণী। এই রচনাগুলির নামই অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসবে; তাই আমি এখানে প্রধান কয়েকটির নাম করছি। এরা হল 'মেশ্চোরার দিকে', 'ইসাক লেভিতান', 'বনকাহিনী' ও 'গ্রীষ্মের দিনগুলি' নামের গল্পগুচ্ছ এবং 'পুরনো শ্যালতি', 'অক্টোবরের রাত', 'রাশিয়ার হৃৎকেন্দ্রে', 'ইলিন ঘূর্ণিদহ' ও অন্যান্য গল্প।

হয়তো এই প্রবন্ধ-পাঠকদের এটা ভেবে আশ্চর্য ঠেকতে পারে যে লেখক তার গল্প ইত্যাদিতে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলির বাইরের পরিবেশের ওপরই বেশি করে জোর দিচ্ছে, নিজের গল্প-উপন্যাসের চরিত্রগুলির কথা কিছুই বলছে না।

কিন্তু আমি নিজের সৃষ্ট চরিত্রদের নিরপেক্ষ মূল্যায়নে অপারগ, তাই তাদের সম্পর্কে মতপ্রকাশ আমার পক্ষে কঠিন। তাদের মূল্যায়ন পাঠকরাই করুন।

আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি যে নিজের সৃষ্ট চরিত্রদের সঙ্গে আমি একই জীবন যাপন করি, তাদের মধ্যে থেকে সর্বদা সাধু চরিত্র উন্মোচনের চেষ্টা পাই, চেষ্টা পাই তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের, তাদের ক্বচিৎ-অলক্ষ্য স্বকীয়তা দেখাবার। এতে আমার সাফল্য কতদূর তা বিচারের দায় আমার নয়।

নিজের প্রিয় নায়কদের সঙ্গে সর্বদাই আমি উপস্থিত ছিলুম তাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে—দুঃখে ও সুখে,

সংগ্রামে ও উৎকণ্ঠায়, বিজয়ে ও বিফলতার সময়ে। আর যতখানি শক্তি নিয়ে সবচেয়ে সাধারণ আর ঈর্ষার অযোগ্য চরিত্রের ভেতর সত্যিকার মানবিক গুণগুলিকে আমি ভালোবেসেছি, সেই একই শক্তি নিয়ে ঘৃণা করেছি মানুষের দোষত্রুটি, স্থূলবুদ্ধিতা ও মূর্খতাকে।

আমার প্রত্যেকটি বই-ই হল বহুবিভিন্ন বয়সের লোকের, জাতির, পেশার, চরিত্রের এবং কার্যকলাপের সমাবেশ।

খ্যাতনামা লোকেদের জীবন সর্বদাই আমার আগ্রহ জাগায়। তাঁদের চরিত্রে সাধারণ বৈশিষ্ট্য খোঁজার চেষ্টা করি—সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য যা তাঁদের মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের সারিতে উন্নীত করেছে।

কিন্তু তবু সবচেয়ে বেশি করে এবং সানন্দে আমি লিখি শাদাসিধে, অখ্যাত যতসব লোকের কথা—কুটিরশিল্পী, পশুপালক, খেয়ানৌকোর মাঝি, বনরক্ষক, বয়া-পরিদর্শনকারী, পাহারাদার আর নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু—গ্রামের ছেলেমেয়েদের কথা।

নিজের রচনার জন্যে আমি বিভিন্ন কালের আর জাতির কবি-সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী ও বিজ্ঞানীদের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। তাঁদের নাম আর এখানে উল্লেখ করব না, কারণ তালিকাটা তাহলে হয়ে দাঁড়াবে বিরাট।

তবে এ-ও বলি, সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ আমি জীবনের কাছে—সাধারণ, তবু তাৎপর্যময় এই জীবনের কাছে। তার সাক্ষী আর শরিক হবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার।

সবশেষে বলি, আমার লেখক ও মানুষ হয়ে ওঠা—এ-সবই ঘটেছে সোভিয়েত আমলে। আমার দেশ, আমার

জনগণ এবং তাদের নিজ-হাতে গড়া নতুন, সত্যিকার সমাজতান্ত্রিক সমাজ—এ হল সেই উঁচু আদর্শ, নিজের লেখা প্রত্যেকটি শব্দ দিয়ে আমি যার সেবা করেছি, সেবা করছি আর করে যাবও।

কন্‌স্তান্‌তিন পাউস্তোভ্‌স্কি

কলখিদার বাদা

বনবেড়াল

বিড়াল মারিবে যে তাহার
অবধারিত শাস্তি — মৃত্যু

— প্রাচীন মিন্‌গ্রেলীয় আইনের
একটি ধারা

দুখান*-এর জানলাগুলো দিয়ে বাতাসের ঝাপ্‌টায় ঘরে এসে ঢুকল একমুঠো ধুলো আর গোলাপের শুকনো পাপড়ি-ক'টা। পামগাছগুলো দুলতে শুরু করল, তাদের সবুজ পাতাগুলো ঝটপট করতে লাগল অস্বস্তিতে। দাঁত কিড়মিড় করার মতো আওয়াজ তুলছিল পাতাগুলো। বাড়ি-বাড়ি চিমনি থেকে উগ্‌রনো ধোঁয়া পোতি শহরের সমতল রাস্তাগুলোর ওপর দিয়ে নিচু হয়ে বয়ে যেতে লাগল। ধোঁয়ার গন্ধে ঢেকে গেল খসে-পড়া মান্দারিন-লেবুফুলের সৌগন্ধ্য। শহরের কেন্দ্রীয় চত্বরে ব্যাঙের ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ গেল বন্ধ হয়ে।

তরুণ এঞ্জিনিয়র গাবুনিয়া বলল, 'বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।' মনমরাভাবে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল সে। চুনকাম-করা একটা সাইনবোর্ডের অস্পষ্ট লেখা চোখে পড়ল তার: 'জলযোগ'।

ধীরে-ধীরে সমুদ্রের দিক থেকে উঠে আসছিল বৃষ্টির ঝালর। ঘন ধোঁয়ার মতো জলের বিস্তারে ছড়িয়ে ছিল তা,

* দুখান — ককেশীয় সরাইখানা। — অনুবাদক

আর থেকে-থেকে সেই ধোঁয়ার মধ্যে ঝিলিক দিচ্ছিল চিৎকাররত গাঙ্চিল, যেন শাদা বিদ্যুৎ।

'বছরে দু'শো চল্লিশ দিন বৃষ্টি হয় এখানে,' গাবুনিয়া ফের বলল।

'অগ্নিময় কলখিদা, বড় সাংঘাতিক জায়গা,' বিড়বিড় করে বলল লাপ্শিন। 'একজন বিজ্ঞানী হিসেব করে দেখিয়েছেন প্রতিবছর পৃথিবীতে নব্বুই ঘন-কিলোমিটার বৃষ্টি হয়। আমার মনে হয়, ওই নব্বুই ঘন-কিলোমিটরই পড়ে এই জায়গাটাতে।'

গাবুনিয়া শুনে গেল, কিন্তু কথাটা ওর মনে কিছুমাত্র ছাপ ফেলল না।

দুখান-পরিচালক, মোটাসোটা হুর-জাতের লোক একটা, হাঁপানির টানের জন্যে ভোঁসভোঁস করে নিশ্বাস ফেলে চলেছিল। এই বিশ্ব-দুনিয়ার কোনো-কিছুতেই ওর আগ্রহের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না: খানা সামনে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে-থাকা এঞ্জিনিয়াররা না, খালি একটা টেবিলে গুম মেরে বসে-থাকা লাঠিহাতে-বুড়ো আর্তেম কর্কিয়া না, স্বশিক্ষিত ভবঘুরে শিল্পী বেচো না, এমন কি আসন্ন বৃষ্টির আভাস— কেউ না, কিছুতেই না। গুমোট গরমে আর নিজের দুশ্চিন্তায় মরমে মরে ছিল সে। কেবল থেকে-থেকে চটচটে মদের গ্লাসগুলো থেকে মাছি তাড়াচ্ছিল আর কখনও-সখনও আঙুল বোলাচ্ছিল হিসেবের অ্যাবাকাস-যন্ত্রটার কাঠের গুলিগুলোয়।

বেচো দুখানের দেয়ালে ভারি চমৎকার একখানা তেলরঙের ছবি আঁকছিল। ছবির বিষয়টা তাকে বলে দিয়েছে গাবুনিয়া। একটু-একটু করে ছবিটায় ফুটে উঠছিল ভবিষ্যৎ দিনের কলখিদা—যেখানে এখন ঈষদুষ্ণ জলের মস্ত-মস্ত

বাদা সেখানে গজিয়ে উঠেছে ফুলের সুগন্ধে-ভরা কমলালেবুর বাগান। আর তাতে গাঢ় সবুজ পাতার ফাঁকে ইলেক্‌ট্রিক বাতির মতো জ্বলজ্বল করছে সোনালি ফল। পেছনে গোলাপি পাহাড়গুলোর মাথায় জমা মেঘ, যেন ধোঁয়ার মুকুট-পরা একসার আগুনের কুণ্ড, ছবিতে আরও দেখা যাচ্ছে শাদারঙের কতকগুলো স্টিমার ঘন পদ্মফুলের ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে আর ছোট-ছোট নৌকোয় ছুটির দিনের বাহারে পোশাক-পরা ছোট-বড় মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-সেদিক। ওদিকে পাড়ের ওপর কমলালেবুর বাগানে ফেল্টের টুপি আর ঘোড়সওয়ারের ব্রিচেস-পরা মিন্‌গ্রেলীয়রা এখানে-ওখানে বসে খানাপিনা করছে। পরিশেষে দেখা যাচ্ছে সির্‌ক্যাশীয় কোট গায়ে, হুবহু লেওনার্দো দা-ভিঞ্চির মুখওয়ালা আর মাথায় লম্বা কোঁকড়ানো চুল একজন বুড়ো লোক ছবির সামনের দিকটায় দাঁড়িয়ে হাত দু'খানা বাড়িয়ে দিয়েছে এই বাচ্চা-ভোলানো নিসর্গদৃশ্যের দিকে।

'লেওনার্দোকে আবার কোত্থেকে পেল ও?' লাপ্‌শিন শুধোল।

লাল হয়ে উঠল গাবুনিয়া।

বলল, 'আমার কাছ থেকে। কেন, তাতে হয়েছে কী?'

জবাবে কিছু না বলে শুধু কাঁধ-ঝাঁকানি দিল লাপ্‌শিন।

বড়-বড় বৃষ্টির ফোঁটা একটা-দুটো করে পড়তে শুরু করল। ফুটপাথে বৃষ্টি পড়ার আওয়াজ উঠল সজোরে। দেখতে-দেখতে দুখানটা ভরে উঠতে লাগল বৃষ্টির হাত এড়িয়ে ভেতরে ঢুকে-পড়া লোকের ভিড়ে। চোখ নামিয়ে একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব করে দুখানের পরিচালককে অভিবাদন জানাতে লাগল তারা। খাবারের ফরমায়েশ দিচ্ছে

না বলে লজ্জা আর-কি। আগন্তুকরা সবাই কৌতূহল নিয়ে বেচোর ছবিখানা দেখতে লাগল।

টেবিলে-টেবিলে গুঞ্জন উঠল প্রশংসার। শাদাসিধে, নরম-সরম শিল্পী-লোকটার এমন গুণপনা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সবাই। জিভ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করতে লাগল অনেকে।

সকলের অমন উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে দুখানের পরিচালক গোমড়ামুখে একটা প্লেটে খানিকটা গুঁড়ো ভুট্টাদানার পরিজ, খানকতক মাছভাজা আর একটা গ্লাসে টক মদ ঢেলে নিয়ে বেচো-র হাতে তুলে দিল। এটাই হল শিল্পীর দৈনিক বরাদ্দ খাবার বলতে খাবার, আবার মজুরি বলতে মজুরিও।

খানিকটা মদ ঢেলে হাতদুটো ধুয়ে ফেলে বেচো খাবারটুকু খেয়ে ফেলল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হেলান দিয়ে বসে চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম নিতে লাগল। প্রশংসার গুঞ্জন কানে গিয়েছিল তার। আপন মনে সে ভাবছিল, দুখানটা সমবায়-প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও দুখানওয়ালা তাকে ঠকাচ্ছে। যে-খাবার তাকে রোজ খেতে দেয়া হচ্ছে তা কিন্তু মোটেই চুক্তি-অনুযায়ী হচ্ছে না। তার ধারকাছ দিয়েও যাচ্ছে না খাবারটা।

ক্রমে বৃষ্টির শব্দ বেড়ে উঠল। দুখানে লোকের কথাবার্তার আওয়াজ চাপা পড়ে গেল সেই শব্দে। বৃষ্টির জল সজোরে ঘা দিতে লাগল বন্ধ জানলায়, রেইন-ওয়াটার পাইপ বেয়ে সশব্দে হুড়মুড় করে নামতে লাগল জল। বাড়ির দেয়ালে-দেয়ালে আর সাইনবোর্ডগুলোর ওপর দ্রুততালে বৃষ্টির বাজনা বাজতে লাগল, যেন লক্ষ-লক্ষ খুদে ছুতোর আর টিন-সারাই মিস্ত্রি ঠুকঠুক করে হাতুড়ি পিটিয়ে চলেছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে মৌসুমি বাতাস দিচ্ছে। পাঁশুটেরঙের

একপাল ভেড়ার মতো মেঘগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে সেই বাতাস, হুরিয়া পাহাড়শ্রেণীর খাড়াই দেয়ালের গায়ে আছড়ে ফেলছে সে মেঘগুলোকে।

ক্রমশ বৃষ্টির জলের সেই ছলাৎছল আর পটপট আওয়াজ, সেই ফিস্‌ফিসানি আর কলকলানি, হরেক রকমারি সেই চটুল শব্দের সঙ্গে প্রকট হয়ে উঠল আরেক ধরনের একটা আওয়াজ। আওয়াজটা অনেক মানুষের একত্রে বেদম চ্যাঁচামেচির ভারি, চাপা একটা গর্জন।

দুখানের ভেতরকার লোকজন সেই আওয়াজ শুনে জানলাগুলোর ধারে ভিড় করে এল। দেখা গেল, জলে টুপটুপে-ভেজা একদল মানুষ রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। দলটার আগে-আগে ছুটে আসছে ক'টা বাচ্চা ছেলে। আর তাদের পেছন-পেছন লম্বা-লম্বা পা ফেলে হেঁটে আসছে ঢ্যাঙামতো কাটখোট্টা চেহারার একজন মানুষ, তার কাঁধে ঝোলানো একটা বন্দুক। লোকটার চোখদুটোয় ভয়ঙ্কর ঝিলিক দিচ্ছে। লোমওয়ালা কালোমতো একটা জন্তুর ল্যাজ হাতে চেপে ধরে তাচ্ছিল্যভরে সেটাকে দোলাতে-দোলাতে আসছে সে। জন্তুটার নাকমুখ থেকে রক্ত আর বৃষ্টির ফোঁটা মিলেমিশে ঝরে পড়ছে।

দুখানের পাশের নাপিতের দোকানটা থেকে ছোটখাট-চেহারার এক বুড়ো এইসময় দৌড়ে বেরিয়ে এল। তার গালে তখনও সাবানের ফেনা-মাখা, কামানো শেষ হয় নি। পাঁশুটেরঙের সির্‌ক্যাশীয় কোটে পর্যন্ত সাবানের ফেনার বড়-বড় ফোঁটা লেগে আছে। মরা জন্তুটার গায়ে হাত দিয়েই সে পিছিয়ে এল।

চেঁচিয়ে বলল, 'সব্বোনাশ! তুই এট্টা বনবিড়াল মেরেচিস, দোস্ত্!'

শুনে উপস্থিত গোটা জনতা হৈ-হৈ করে উঠল। শিকারী এবার দুখানে এসে ঢুকল। তারপর জলে-ভেজা পেছলা জন্তুটাকে ছুড়ে দিল দুখানওয়ালার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মদের গ্লাসগুলো ঝন্‌ঝন করে উঠল। কাউন্টারের ওপর জন্তুটার ভারি লাশটা আছড়ে পড়ায় সেই ধাক্কায় গোটা ঘরখানাই কেঁপে উঠল যেন।

ইতিমধ্যে দুখানের ঘরখানা লোকে ভর্তি হয়ে উঠেছে। সবাই এমনভাবে চ্যাঁচাচ্ছে যেন একটা জীবন-মরণ সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে।

যে-লোকটা জন্তুটাকে এনেছে সে এবার হাতের তেলো দিয়ে মুখের ওপরকার বৃষ্টির ফোঁটাগুলো মুছে ফেলল। তারপর নীরস, কঠিন গলায় দুখানওয়ালাকে বলল:

'চামড়াখান কিনে লাও হে, মেনেজারসায়েব।'

সঙ্গে সঙ্গে চুপ মেরে গেল উপস্থিত জনতা। এই আজব কেনাবেচার কারবারে দু'পক্ষের একটা কথাও কান-ফসকালে চলবে না! বনবেড়ালের চামড়া কেনাবেচা বলে কথা! কে জানে, কলখিদার জলা-জঙ্গলে গুলি করে মারার মতো এটাই শেষ বনবেড়াল কিনা! কে বলতে পারে?

হলদেটে চোখদুটো মেলে দুখানওয়ালা এবার জন্তুটার দিকে তাকাল, কিন্তু একটা কথাও বলল না। অল্পবয়সী একটি মেয়ে এক-বগলে একটা মুরগি আর অন্যহাতে একগোছা গোলাপফুল নিয়ে একটা চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়াল। ব্যাপারটা আরও ভালো করে দেখা তার ইচ্ছে। বগলের মুরগিটা এবার গোলাপের পাপড়িতে ঠোকর মারা বন্ধ করে সজোরে ক্যাঁক-ক্যাঁক ডাক ছেড়ে ডানায় ঝাপট দেবার চেষ্টা পেল। এমন সময় বুড়ো আর্তেম কর্‌কিয়া হাতের লাঠিগাছটা নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'তোরে অভিসম্পাত নাগ্নক, ইয়ার! বিড়াল মেরেচিস তুই! সেকালে এয়ার শাস্তি কী ছেল জানিস? — মিত্যু।'

'দোষ লিয়েন না,' কর্কিয়ার দিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্করভাবে চোখ পাকিয়ে মরা-প্রাণীটার মালিক বললে। 'গ্নর্নজনের বাক্যিতে আপত্তি জানাচ্চি বলে দোষ লিয়েন না। তবে বলচি কী — এয়া বিড়াল লয়।'

শ্ননে উপস্থিত জনতা তো খাবি খাওয়ার যোগাড়! একমাত্র এর পরই সবাই ধরতে পারল, তাই তো, এটা তো বনবিড়াল নয় মোটেই! বরং এটারে মস্ত এট্টা ই'দ্নরের মতন দেখতে নাগচে বটে। কাউন্টারের উপর শোয়ানো লোমে-ঢাকা এই লাশটা কিসির তাইলে?

'বিড়াল না তো কী এটা — ক' দেখি?' কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে শ্নধোল কর্কিয়া।

'ভগমানের দোহাই! বলি, অত তাড়াহ্নড়ার কী আচে?' কোনোরকমে প্রচন্ড রাগ চেপে চে'চিয়ে উঠল শিকারি। 'চোখদ্নটা আচে কী কত্তে? ওদ্নটা ব্যাভার করেন-না কেনে?'

গাব্নিয়া আর লাপ্শিন কন্নইয়ের ধাক্কা দিয়ে এতক্ষণে কাউন্টারের ধারে এগিয়ে এল। সত্যি, প্রাণীটা অদ্ভুত ধরনেরই দেখতে বটে। ওর জোরালো চারটে পায়ের থাবায় হাঁসের মতো হল্নদরঙের সংযোজক পাতা। রোঁয়াহীন লম্বা ল্যাজটা টেবিল থেকে ঝুলে প্রায় মাটি ছ্ন্ইছ্ন্ই করছে।

উপস্থিত জনতাও কিছ্ন ধরতে পারছে না। দ্নখানওয়ালার দিকে সবক'টা জোড়া-চোখ সমস্যা সমাধানের আশায় তাকিয়ে। কিন্তু সে-লোকটা তখনও গোমড়াম্নখে ভোঁসভোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে আর রা-টি কাড়ছে না।

ঠিক এমনি সময়ে অকুস্থলে এসে দেখা দিল ভানো আহ্মেতেলি। পশ্নলোম-সম্পর্কিত ইন্স্টিটিউটের

স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র ভানো। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে-থাকা জনতার ভিড় ঠেলে অতি সহজেই এগিয়ে এল সে। এতই সহজে যে মনে হল জনশূন্য শহর-চত্বরটাই বুঝি পার হয়ে এল। ওর পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল আরও একজন। সে গ্রিশা, হুইস্‌ল-হাতে ছোটখাট-চেহারার মিলিশিয়াম্যান।

ভানো এসে পড়ল একেবারে কাউন্টারের ধারে। মরা জন্তুটাকে ল্যাজ ধরে উঁচু করে তুলল সে। ওদিকে গ্রিশা হুইস্‌ল বাজিয়ে ঠেলে-ঠেলে ভিড় সরাতে লাগল। কিছু-কিছু লোক আবার নাছোড়বান্দা, সরতে চায় না কিছুতে। তাদের অতিরিক্ত কৌতূহল দেখে ব্যঙ্গ করে সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল:

'কী? চোখের দেখা দেখতে না-পেলে মরে যাবে, না কী? থাক-থাক, অত হ্যাংলাপনা ভালো না! কী সব হাঁদা-গঙ্গারাম নোক, দেখে আর হেসে বাঁচি নে!'

'কোন ঠেঁয়ে মারলে হে এটাকে?' ঝাঁপালো ভুরুদুটো যথাসাধ্য কুঁচকে ভানো শুধোল শিকারীকে।

'এজ্ঞে, মেরেচি তুর্কি খালের ধারে।'

'নাম কী তোমার?'

'এজ্ঞে, গুলিয়া।'

'অ! তাহলে, গুলিয়া, তুমি দেখচি নিষিদ্ধ প্রাণী শিকার করেচ,' ধীর-গম্ভীর চালে ভানো বলল। 'এর জন্যে হপ্তা-দুই তোমাকে মেয়াদ খাটতে হবে।'

মহা খাপ্পা হয়ে ঘোঁতঘোঁত করে উঠল গুলিয়া। ভানোর দিকে মারমুখো চোখে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল:

'এঃ, ভারি আমার ইঁদুরের পাহারাদার এয়েচেন! তা, ব্যাঙ্‌-মারলেও আমারে জেলে পোরবে নাকি?'

'অত মাথাগরম কোরো না হে, দোস্ত্। এখন থাক, আদালতে প্রাণ খুলে কথা বোলো অখন... গ্রিশা, ওকে থানায় নিয়ে চল।'

গ্রিশা আর গুলিয়ার পিছু-পিছু গোটা জনতা দুখান থেকে বেরিয়ে গেল। শিকারি তখনও ফুঁসছে। মরা প্রাণীটাকে ফের ল্যাজ ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল সে। তবে তার আগেকার সেই গুমোর আর তাচ্ছিল্যের ভাবটা আর ছিল না। ঝোলানো জন্তুটার মাথা বৃষ্টিভেজা ফুটপাথে ঠুকতে-ঠুকতে চলল।

বৃষ্টি ধরে আসছে এতক্ষণে। হালকা বৃষ্টি নেমেছে ফিস্‌ফিস করে।

গাবুনিয়া, ভানো আর লাপ্‌শিন কেবল রয়ে গিয়েছিল দুখানে।

'আচ্ছা, প্রাণীটা সত্যিই কী, বলুন তো?' লাপ্‌শিন শুধোল।

যেন ভারি অবাক হয়েছে এমন ভান করে ভানো চেঁচিয়ে বলল, 'ও মা, তাও বুঝি জানেন না? ওটা তো আর্জেন্টিনার ভোঁদড়, ন্যুট্রিয়া। রিও নেগ্রো নদীর বাসিন্দা।'

'অজ্ঞতার জন্যে ক্ষমা চাইছি,' হিমশীতল গলায় বলল এবার লাপ্‌শিন। 'জানেন তো, আমি জীববিজ্ঞানী নই। আমার বিষয় হল উদ্ভিদবিদ্যা।'

'কিন্তু আপনি তো আর্দ্র মন্দোষ্ণ-মণ্ডল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। কাজেই আমার তো মনে হয়, আপনার ব্যাপারটা জানা উচিত।'

গাবুনিয়া তাড়াতাড়ি মাঝে পড়ে কথার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা পেল, নইলে ঝগড়া বেধে গিয়েছিল আর-কি। ভানো আর লাপ্‌শিনের মধ্যে দেখা হলেই হল, সঙ্গে সঙ্গে কাটা-

কাটা ধারালো কথার লেনদেন শুরু হয়ে যাবে। রোমশ গোলাপি পশমের আমেরিকান স্যুট আর পালিশ-করা আচার-আচরণের জন্যে তরুণ উদ্ভিদবিজ্ঞানীটিকে ভানোর বড়ই অপছন্দ। ভানোর ধারণা, উদ্ভিদবিজ্ঞানীটি কিছু-কিছু ল্যাজমোটা বিদেশী পর্যটকের মতোই নিজেকে সোভিয়েত ব্যাপারস্যাপারের চেয়ে উঁচুস্তরের বলে মনে করে।

রূঢ়, অভদ্র আচরণ দেখলে বড় কষ্ট পায় গাবুনিয়া। ছেলেটা ভারি লাজুক স্বভাবের। লম্বা চেহারা, সর্বদা হাসি-হাসি চোখদুটোয় তার ম্যালেরিয়া-রুগীর হলুদ ঘোলাটে ছাপ।

আপনা থেকেই লাল হয়ে উঠতে-উঠতে সে বলে, 'ন্যুট্রিয়া হল গিয়ে দুনিয়ায় সবচেয়ে ঝগড়াটে প্রাণী।'

ওর এই কথাগুলো এতটুকু ভাবান্তর ঘটাল না কারও মধ্যে। কেবল ভানো কড়া চোখে একবার তাকাল গাবুনিয়ার দিকে।

বলল, 'তুমি যখন জলাজমির জলনিকাশের ব্যবস্থা করে কলখিদাকে বেচোর ছবির ওই মন-ভুলনো বাগানে বদলে দেবে তখন ন্যুট্রিয়াগুলো যাবে মরে। তুমিই হচ্চ ন্যুট্রিয়াকে নির্বংশ করার প্রধান উদ্যোক্তা। ন্যুট্রিয়ার বংশ বাঁচানোর জন্যে জঙ্গল দরকার বুঝলে, লেবুর বাগান নয়। এখন বল, সাধে কি আমার মেজাজ বিগড়ে যায়?'

সবাই ওরা তাকিয়ে ছিল বেচোর ছবির দিকে। বৃষ্টি থেমে গেছে। ম্যাগ্নোলিয়া গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে, আর ম্যাগ্নোলিয়ার ঘন সবুজ পাতা রোদ্দুরের রঙটাকেও করে তুলেছে সবজেটে। এই নরম আলোয়-দেখা বেচোর ছবি গাবুনিয়ার চোখে সম্পূর্ণ নতুন এক তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠল। তার কেমন যেন ইচ্ছে

হল ছবির ভারি-ভারি ওজনের কমলালেবুগুলো একবার হাত দিয়ে ছোঁয়।

অন্যমনস্কভাবে সে বললে, 'কেন? মেজাজ বিগড়ে যায় কেন?'

'এত-যে কষ্ট করলাম তার জন্যে, আবার কেন?' ভানো জবাব দিল। 'দু'-দুটো বছর ওই হতচ্ছাড়া প্রাণীগুলোর পেছনে খরচ করেচি। ওদের প্রজনের ব্যাপারটার তদারকিতে কাটিয়েচি। এখন সেই গোটা কাজটাই পন্ড হতে বসেছে এটা ভাবতেও খারাপ লাগে। তাছাড়া, জঙ্গলকে জঙ্গল কেটে সাফ করে ফেলা হচ্চে—এটাও একটা লজ্জার ব্যাপার। তোমার মাটিকাটা-যন্তরগুলো বুনোশুয়োরের পালকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েচে। এমন কি শেয়ালগুলোও পাহাড়ে পালিয়ে যাচ্চে।'

'ভালোই তো! ওদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে!'

লাপ্‌শিন এবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। ভানোকে তার জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল, আর্জেন্টিনার ন্যুট্রিয়া কলখিদার বাসিন্দা বনে গেল কেমন করে। কিন্তু কিছু না-বলে সে চেপে গেল।

চারপাশের পরিবেশ ভারি অপ্রীতিকর ঠেকছে তার। উদ্ভট নামওয়ালা এই সমতল জলা জায়গাটা তার মোটেই পছন্দ নয়। একটানা উষ্ণ বৃষ্টি, কাদায় ঘোলাটে জল নিয়ে নদীগুলোর এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিতে সমুদ্রের মুখে ছুটে চলা, খোঁটার মাথায়-তৈরি কাঠের বাড়ি—কিছুই পছন্দ নয় তার। এমন কি দুখানগুলো পর্যন্ত নয়, ক্যাস্টর-অয়েলের মতো খেতে কুসুম-কুসুম গরম মদ পরিবেশন করা হয় যেখানে।

ইতিমধ্যে ফের বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সূর্যও মুখ লুকিয়ে

ফেলেছে দেখতে-দেখতে। আর বৃষ্টি শুরু হলে এ-তল্লাটে সবসময় যেমন হয় তেমনই গোটা শহর আচ্ছন্ন হয়ে গেছে নানাবিধ গন্ধে। এত উগ্র সেই গন্ধ যেন মনে হয় হাত দিয়ে ছুঁতেই যা বাকি তাদের। নাকে আসে ইউক্যালিপ্টসের মৃদু নরম সৌরভ, গোলাপের নাছোড়বান্দা মিঠে সুবাস আর লেবুর সেই টক-টক গন্ধ যাতে আঙুলের ডগাগুলো চুলকোতে থাকে। তবে এই গন্ধটা থাকে মৌসুমির প্রথম ধাক্কাটা লাগা পর্যন্তই। ফলের বাগানে পাতার মর্মর তুলে, গাছের পাতা উলটেপালটে আর রাস্তাগুলো ধুলোয় ভরিয়ে বাতাস বয়ে যায় যখন, তখন সবকিছু যায় বদলে। মাথাধরা আর আলসেমির উৎস এই সুগন্ধি হাওয়াকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় তখন তীব্র নোনা সমুদ্রবাতাস।

গাবুনিয়ার কিন্তু ভারি পছন্দ হালকা জোরালো সব রকম বাতাসই। তার মনে হয় যে-কোনো বাতাসই যেন শরীর থেকে ম্যালেরিয়ার অবসন্নতা তাড়িয়ে দেয়।

সে শুধোয়, 'ওই লোকটির বিচার হবে কবে?'

'দিন-দুই বাদে।'

ভানোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাবুনিয়াও বেরিয়ে এল রাস্তায়। রিওন নদী তখন উন্মাদের মতো তড়পাচ্ছে, ব্রিজগুলো ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে আর তরল কাদার স্রোত উলটেপালটে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে। গাবুনিয়া ধীরপায়ে হেঁটে চলল জাহাজঘাটামুখো। বোঝা যাচ্ছে, ওর হাঁটার ধরনটাতেও ম্যালেরিয়ার ছোঁয়াচ লেগেছে।

ও ভাবছে, কী জ্বালা, নরম স্বভাবের জন্যেই সবকিছুকে কেমন নিজের পক্ষে অস্বস্তিকর করে তোলে ও! ভানোর সঙ্গে কথাবার্তা এড়িয়ে চলতে চায় সর্বদা। পুরোপুরি যুক্তিহীন হলেও ভানোর ব্যাপারে কেমন একটা অপরাধবোধ

থেকে নিজেকে ও মুক্ত করতে পারে না। কেননা ও নিজে — গাবুনিয়া স্বয়ং — কলখিদার জলাভূমিগুলো থেকে যে জলনিকাশ করে চলেছে, নতুন-নতুন খাল কাটছে, আদিম অরণ্য একেবারে মূলসুদ্ধ উপড়ে সাফ করে দিচ্ছে, যেখানে নুট্রিয়ার মতো প্রাণীরা জন্মায় আগুনে পুড়িয়ে লোপাট করে দিচ্ছে সেই জঙ্গল।

নুট্রিয়াগুলোকে একসময় সুদূর আর্জেন্টিনা থেকে এনে বংশবৃদ্ধির জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল কলখিদার এই জলাভূমিতে। আর ব্যাপারটা মোটেই সহজ ছিল না। পরপর দু'-দুটো গ্রীষ্ম ধরে ভানো নতুন জলহাওয়ায় তাদের অভ্যস্ত হওয়ার ব্যাপারটা নজরে রাখছে। প্রাণীগুলোর দামি লোম সম্বন্ধে কত-যে আজগবি গল্প বলে ভানো তার ঠিক-ঠিকানা নেই। বলে, পশ্চিম ইউরোপে নাকি ওই লোম সোনার মতো দামি।

নুট্রিয়াগুলো বংশবৃদ্ধি করতেও পারে বটে! একেবারে হু-হু করে বেড়ে চলেছে ওরা। তবে একমাত্র ভানো স্বয়ং আর জনাকয়েক মিন্‌গ্রেলীয় শিকারি ছাড়া আর কেউ এ-পর্যন্ত ওদের চোখে দেখে নি। যারা দেখেছে তারা অবিশ্যি বলে যে প্রাণীগুলো নাকি একেবারে পাকা লড়ুয়ে। একবার লড়াই বাধলে পরপর কয়েকটা দিন আর রাত্তির ওরা লড়াই করে চলে, একেবারে প্রাণে না মরা পর্যন্ত কেউ কাউকে ছাড়ে না। এমনিতে ওরা অবিশ্যি ভারি ভিতু, নিজেদের এক শো হাতের মধ্যে মানুষকে ঘেঁষতে দেয় না সহজে। কিন্তু একবার যখন নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করে তখন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে, ভয়-টয় মাথায় উঠে যায়, আর তখন যে-কোনো মানুষ সহজেই ওদের কাছে ঘেঁষতে পারে, এমন কি ল্যাজ ধরে দুই লড়ুয়েকে টেনে আলাদা করে দিতে

পারে পর্যন্ত। ওদের মধ্যে লড়াইয়ের ধরনটা আবার সবসময়েই একই রকম। দেখা যায়, একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার চোয়াল লক্ষ্য ক'রে আর প্রতিদ্বন্দ্বীর দাঁতগুলো ভেঙে দিতে সচেষ্ট হয়। ন্যুট্রিয়াগুলো নিশ্বাস নেবার জন্যে একবারও ওপরে ভেসে না-উঠে একসঙ্গে পুরো পাঁচ মিনিট জলে ডুবে থাকতে পারে।

গাবুনিয়া কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না কেন-যে ভানো এই কদাকার প্রাণীগুলোকে নিয়ে এত মাথা ঘামায়।

ন্যুট্রিয়া নিয়ে পর্যবেক্ষণের জন্যে ভানো প্রায়ই মাসের-পর-মাস ওই জল-জঙ্গলের মধ্যে কাটিয়ে আসে। দেখা যাচ্ছে, আস্তে-আস্তে ও কলখিদার জঙ্গলকে ভালোবেসে ফেলেছে, তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। অথচ কীই-বা আছে এখানকার জল-জঙ্গলের মধ্যে? খালি নীরন্ধ্র, বায়ুহীন, লিয়ানালতা-জড়ানো গভীর জঙ্গল, বদ্ধ জলা, বুনো, পচাগলা, ম্যালেরিয়াবোঝাই গাছগাছড়া, আগাছা।

কলখিদার জঙ্গলকে ভানো বলে গ্রীষ্মমণ্ডলের বন, অথচ এখানকার গাছপালা বলতে প্রায় পুরোপুরিই উত্তরদেশী অ্যাল্‌ডার আর রোডোডেনড্রন বোঝায়। আসলে জঙ্গলটা উত্তর আর দক্ষিণদেশের গাছপালার অদ্ভুত এক জগাখিচুড়ি। অ্যাল্‌ডার গাছগুলো বেড়ে ওঠে অসম্ভব তাড়াতাড়ি। গাছ কেটে সাফ-করা একটা জায়গা বছর তিনেকের মধ্যেই ফের দুর্গম অরণ্য হয়ে ওঠে।

কলখিদা-অঞ্চলে চালু জলনিকাশী প্রকল্পের ব্যাপারে ভানোর অব্যক্ত বিরোধিতা বেশ বুঝতে পারে গাবুনিয়া। ম্যালেরিয়া, বন্যা আর বৃষ্টির কারণে, আর জলার মধ্যে থেকে-থেকে মাটিকাটা-যন্ত্রগুলো অচল হয়ে পড়ায় প্রকল্পের

কাজ চলে শম্বুকগতিতে, আর তাতে খোলাখুলিই উৎফুল্ল হয়ে উঠতে দেখা যায় ভানোকে।

গাবুনিয়া জানে, আজ হোক কাল হোক একদিন-না-একদিন ভানোর মুখোমুখি ওদের দাঁড়াতেই হবে। তবু মাটিকাটা-যন্ত্রগুলো পায়ে-পায়ে একটু-একটু করে ভানোর রূপকথার রাজ্যে অনুপ্রবেশ করছে দেখে কখনও-কখনও ওর বুকের মধ্যে কেমন একটা মমতার টনটনানি ধরে। দ্যাখে, যন্ত্রগুলো লিয়ানালতার জাল ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে, জলা থেকে জল সেচে তুলে কালচে-সোনালি রুই-কাতলার বংশ লোপাট করে চলেছে, বুনো শুয়োর আর ন্যুট্রিয়াদের তাড়িয়ে দিচ্ছে সমুদ্রের দিকে। আর পেছনে ফেলে রাখছে বীভৎস কুৎসিত সমস্ত খানাখন্দ, চটচটে আঠালো মাটির স্তূপ আর পচ-ধরা গাছের গুঁড়ি।

কলখিদার অরণ্যভূমি সর্বদাই ডুবে থাকে হাঁটুভোর জলে। ফলে চটচটে কাদামাটি গাছের শেকড়বাকড় ধরে রাখে কোনোক্রমে। গাছ উপড়ে ফেলতে শ্রমিকদের পক্ষে তাই গাছের গায়ে শেকল জড়িয়ে টান দেয়াই যথেষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। কাজটা পুরোপুরি নিরাপদও বটে, কেননা এভাবে উপড়নো গাছ সরাসরি মাটিতে আছড়ে পড়ে না। মানুষের বাহুমূলের মতো মোটা কাঁটাওয়ালা লিয়ানালতাগুলো মাঝপথেই তাদের লুফে ধরে ফেলে। আর সারা জঙ্গল জুড়ে বড়-বড় গাছের নিচে ছেয়ে থাকে ঘন আগাছার জঙ্গল—নানাজাতের কাঁটাঝোপ, বনলতা আর ফার্নের আস্তরণ।

এইসব গাছগাছড়ার বাড়বৃদ্ধি সত্যিই তাক লাগাবার মতো। বনলতা ক্লিম্যাটিস গাছের গায়ে পাক দিয়ে তরতর করে ওপরে উঠে যায় আর একসময় গাছের কান্ডগুলো ঘাসের আলতো ডগার মতো মট করে দেয় ভেঙে।

বৈঁচিজাতীয় একরকম ফলের কাঁটাঝোপ তো প্রায় চোখের সামনেই দেখতে-দেখতে বাড়তে থাকে। একেকটা গ্রীষ্মের মধ্যেই লম্বায় ছ' ফুট করে বাড়ে তারা।

এইজাতীয় জঙ্গলে ঘাস জন্মায় না। অন্ধকার, নিবাত-নিষ্কম্প জঙ্গল এগুলো। এ-সমস্ত জায়গায় পাখ-পাখালিও প্রায় নেই বলতে গেলে। তার বদলে আছে খালি বাদুড়। ঘুমন্ত, অগম্য এই জঙ্গলগুলো উষ্ণ বৃষ্টির মিহি কুয়াশায় ঢাকা।

যখন জোর বাতাস বয় অন্ধকার এই জঙ্গলগুলো রঙ পালটিয়ে তখন রুপোলি পারার বর্ণ ধারণ করে। কারণ, হাওয়ায় অ্যাল্ডার গাছের পাতাগুলো যায় উলটে আর পাতার নিচের দিককার রুপোলি-ধূসর রঙ পড়ে বেরিয়ে।

অনাদি কাল থেকে কত-যে দিন, মাস আর বছর ধরে কলখিদার এইসব অরণ্য গুনগুন করছে আর হাওয়ায় দুলছে আর অনুজ্জ্বল রুপোলির ঢেউ গড়িয়ে যাচ্ছে তাদের ওপর দিয়ে—তার ইয়ত্তা নেই। গাবুনিয়া তাই ভানোর দুর্জয় রাগের কারণটা বুঝতে পারে। এইসব বন একদিন সাফ হয়ে যাবে একথা ভেবে সময়-সময় তারও বড় দুঃখ লাগে।

কলখিদার জলসেচ-প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত কর্তা এঞ্জিনিয়র কাখিয়ানি অবিশ্যি গোটা ব্যাপারটা অনেক সরল শাদা চোখে দেখেন। জঙ্গল কিংবা শাপলা ফুলে-ভরা হ্রদ কিংবা গাছের ডালপালার সবুজ গুহা-গহ্বরের মধ্যে দিয়ে তিরতির করে বয়ে-চলা অগুনতি নদীর রূপ উপভোগের মন নেই তাঁর। তাঁর মতে, এ-সবের ভবিতব্য হল পরিকল্পনা অনুযায়ী বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া; এ-সবই পথের কণ্টক, উদ্দেশ্যপূরণের বাধা ছাড়া কিছু নয়।

ভানোকে কাখিয়ানি অল্পবয়সী মাথা-গরম ছোকরা ছাড়া আর কিছু ভাবেন না। জঙ্গল আর ন্যুট্রিয়ার বংশরক্ষার সপক্ষে ভানোর ব্যাকুল আবেদন-নিবেদনের জবাবে তিনি শুধুই হেলাফেলায় কাঁধ-ঝাঁকুনি দেন আর হুঁহাঁ করে যান মাত্র। সর্বদাই ভেঙচি-কাটার মতো একটা তেতো হাসি মাখানো থাকে কাখিয়ানির ঠোঁটদুটোয়, হাসিটা মুখ থেকে মোছে না কখনও। লোকে বলে, এটা নাকি অতিরিক্ত কুইনিন খাওয়ার ফল: কাখিয়ানি নিতান্ত ধীরেসুস্থে ওই বিষতেতো বড়িগুলো চিবোতে থাকেন, তারপর জল ছাড়াই গিলে ফেলেন নির্বিকারভাবে।

এই সমস্ত আদিম অরণ্যের ভবিতব্য সম্বন্ধে, যা-কিছু অতীতের সামগ্রী তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মমতা বা অনুশোচনা বোধ করা—এ হল গিয়ে এমন একটা মনোভাব যা কাখিয়ানির কাছে সম্পূর্ণ পরক। তিনি মনে করেন, প্রকৃতিকে যদি নিজের মনে থাকতে দেয়া হয় তাহলে তার ক্ষয় আর সৌন্দর্যহানি অবশ্যম্ভাবী। এই তত্ত্বকথার সমর্থনে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের বই থেকে তথ্যপ্রমাণ ধীরেসুস্থে আউড়েও যান তিনি।

আর গাবুনিয়ার কথা বলতে গেলে কাখিয়ানি অবিশ্যি তাকে যোগ্য এঞ্জিনিয়র বলেই ভাবেন, তবে মনে করেন ওর স্বপ্ন দেখার ঝোঁকটা একটু বেশি। ওর নাম দিয়েছেন তিনি 'রোমাণ্টিক এঞ্জিনিয়র'। গাবুনিয়ার ঘরে মায়াকোভ্স্কি কিংবা ব্লকের কবিতার বই চোখে পড়লে সবসময়েই তাঁর মেজাজ বিগড়ে যেতে দেখা যায়।

তিনি তখন বলেন, 'সত্যিকার ধ্রুপদী সাহিত্য যদি বলতে হয় তো অংকশাস্তরকেই তা বলা চলে। বাকি সব হৃদয়তাপের ভাপ ছাড়া কিছু নয়।'

ভানোর মতামত সম্বন্ধে সহানুভূতি ছিল একমাত্র বৃদ্ধ এঞ্জিনিয়র পাখোমভের। কলখিদার জলাজমি থেকে জলনিকাশের বিপুল পরিকল্পনাটির রচয়িতা তিনিই। নিজের ব্লু-প্রিন্টগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ে পাখোমভ কখনও-কখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন:

'এ-কাজটা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমায় আর বাঁচতে হবে না ভেবে আমি সুখী। সত্যি, কথাটা ভেবে আনন্দ হচ্ছে আমার! যতই যাই হোক, প্রকৃতিকে ধ্বংস করে ফেলাটা দুঃখের ব্যাপার।'

কিন্তু তবু দেখা যায়, যে-আদিম অরণ্যভূমির জন্যে তিনি সেইমাত্র হু-হুতাশ করছিলেন তারই মধ্যে দিয়ে নতুন কতকগুলো খাল কাটার একটা পরিকল্পনায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তিনি, আর রীতিমতো বিজয়ীর উল্লাস নিয়ে টেব্‌লের গায়ে পেন্সিলের টোকা দিয়ে বলছেন:

'এই তো! লেবুর আবাদের জন্যে আরও দু' হাজার হেক্টর জমি বেরিয়ে এল। তা মন্দ কি, কী বল?'

বৃদ্ধের নিজস্ব কতগুলো অদ্ভুত খামখেয়াল আছে। দুখানের দেয়ালে-আঁকা ছবিটিতে লেওনার্দোর প্রতিকৃতিটি ঢোকাতে তিনিই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করিয়েছিলেন বেচোকে।

প্রায় ধমকের সুরে বলেছিলেন, 'তোমার মতলবখানা কী, বল দেখি দোস্ত্? ভবিষ্যৎ কলখিদার ছবি আঁকছ তুমি আর দুনিয়ার প্রথম ওস্তাদ জলনিকাশী আর সেচ-এঞ্জিনিয়র লেওনার্দো দা-ভিঞ্চিকেই দিয়েছ বাতিল করে?'

শুনে বেচো ওঁর দিকে সন্দেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিল, 'কিন্তু লেওনার্দো তো শিল্পী ছেলেন, তাই না?'

'তাতে কী? তিনি মস্ত শিল্পী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি আবার ওস্তাদ সেচ-এঞ্জিনিয়রও ছিলেন।'

এই কথাবার্তার পরেই বেচো গাবুনিয়ার কাছে এই মহৎ ইতালীয় শিল্পীর একখানা ছবি চেয়েছিল।

নতুন, রহস্যময় একটা শব্দ 'কল্‌মাটাজ'এর সঙ্গে পাখোমভের নামটি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। শব্দটা জলাজমির জলনিকাশের একটা ব্যবস্থার নাম। লোকে শব্দটা ব্যবহার করে এমনভাবে যেন তারা মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেয়ার কিংবা সাহারাকে সমুদ্রে পরিণত করার কথা আলোচনা করছে। এমনই আজগবি শোনায় শব্দটা। যাই হোক, এ নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

চালাদিদি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে প্রধান খালটি কাটার ভারপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়র গাবুনিয়া। পরপর দু'দিন শহরে থেকে যাওয়ার সুযোগ ঘটায় সে এখন ক্যাপ্টেন চোপ-এর খোঁজে বন্দর-এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। চোপ বন্দরের ইন্‌স্পেক্টর। গাবুনিয়ার ইচ্ছে ওঁর কাছ থেকে জনা-দুই নাবিককে চেয়ে নেবে যাতে তারা গিয়ে ওর খালের নির্মাণ-প্রকল্পে একটা মাটিকাটা-যন্ত্র চালাতে পারে।

গাবুনিয়াকে প্রায়ই নানান কাজে পোতি শহরে আসতে হয়। আর প্রতিবারই শহর আর বন্দর-এলাকাটা তার চোখে নতুন রূপ নিয়ে দেখা দেয়। মনে হয় যেন একেবারেই সাধারণ, মামুলি জায়গা নয় এটা। জায়গাটাকে আজও তার অসাধারণ ঠেকছে।

বন্দর-এলাকায় গাবুনিয়ার ঘুরে বেড়াবার সময় একফাঁকে সন্ধে নেমে এল।

জাহাজঘাটাগুলো থেকে শুকনো কাঁকড়ার আর সামুদ্রিক শ্যাওলার গন্ধ ভেসে আসছে। বন্দরের হুঁশিয়ারি আলোর

মালা অশান্ত ঢেউয়ের ওপর ঝুলে আছে বেশ নিচুতেই। বাঁধের গায়ে আছড়ে পড়ে ঢেউগুলো একটানা বিলাপের সুর তুলছে, যেন কেউ ঘুমপাড়ানিয়া গান গেয়ে চলেছে ঘুম-ঘুম গলায়।

শহরের ওপর ইতিমধ্যে ফের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। নিচে থেকে শহরের আলো মেঘের ওপর পড়ে মেঘগুলোকে আলোকিত করে তুলেছে অল্প-অল্প। জলা থেকে ভেসে আসছে ব্যাঙের ডাক।

লোহার-তৈরি একটা মালগুদামের পাশ কাটিয়ে গাব্রুনিয়া প্রশস্ত একটা জাহাজঘাটার চত্বরে এসে হাজির হল। তারপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গেল সেখানে। 'আব্‌খাজিয়া' জাহাজখানা তখন বন্দরে ঢুকছে। জাহাজখানা আসছে বাতুম থেকে। জলে প্রতিফলিত তারার নীল আলোর ফুটকিগুলো জাহাজের পাশে-পাশে ঢেউয়ের ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একবার সংকুচিত একবার প্রসারিত হচ্ছে, আর মিশে যাচ্ছে জাহাজ থেকে জলে ঠিকরে-পড়া চোখ-ধাঁধানো শাদা আলোর দ্যুতির সঙ্গে। 'আব্‌খাজিয়া'কে মনে হচ্ছে ভেতর থেকে আলো-ঠিকরে-পড়া যেন একটুকরো ফাঁপা স্ফটিকপাথর।

হঠাৎ জাহাজটা হুইস্‌ল দিল। কেমন চাপা অথচ রাগী-রাগী শোনাল শব্দটা। নিচু-হয়ে-ঝুলে-থাকা মেঘলা আকাশে ধাক্কা খেয়ে শব্দটা ছড়িয়ে পড়তে লাগল ক্রমশ, জলের ওপর ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে-পড়া ঢেউয়ের বৃত্তের মতো। এরপর চালাদিদি বন থেকে সাড়া দিল তার বিষণ্ন প্রতিধ্বনি, আর শব্দটা ফের ফিরে এল একবার হুরিয়া পর্বতমালা থেকে—তবে এবার প্রায় শোনা যায়-কি-না-যায় এতই অস্পষ্টভাবে।

'আব্‌খাজিয়া' ভারি দেহটা নিয়ে পাশ ফিরে ঘুরে দাঁড়াল এবার। আর দেখতে-দেখতে গোটা জাহাজঘাটা

গমগম করে উঠল চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে, জল ছাড়ার ছড়ছড় শব্দে, বাচ্চাদের হাসিতে আর কপিকলগুলোর ঘড়ঘড় আওয়াজে।

মাছধরা বানচাল করে দিল বলে নারকীয় জাহাজখানাকে যৎপরোনাস্তি গাল দিতে দিতে অভিজ্ঞ ছিপ-ফেলিয়ে মেছোরা এবার হ্যাঁচকা টানে তাদের ছিপের সুতো গুটিয়ে নিল।

'শ্বেতকেশী' চা

ওইদিন গভীর রাত্রে অল্পবয়সী একটি স্ত্রীলোক বছর-সাতেক বয়সের একটি বাচ্চা মেয়ের হাত ধরে একটা স্টিমার থেকে নামল। স্টিমারটা ছিল একই সঙ্গে মাল আর যাত্রীবাহী। ওটা থেকে চামড়া আর তেলের এমন একটা ভাপসা গন্ধ ছাড়ছিল যে এক শো'-পা দূর থেকেও তা টের পাবার মতো। দ্রুত এসে জেটিতে ভেড়বার পর আলো-টালো সব নিবিয়ে দিয়ে স্টিমারখানা চুপচাপ হয়ে গেল।

সঙ্গের ছোটখাট কয়েকটা ব্যাগের কাছে দাঁড়িয়ে স্ত্রীলোকটি ভুরু কুঁচকে বিপন্ন চোখে চারিদিকে তাকাতে লাগল। দেখা গেল, আশেপাশে কোথাও জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই। ওর সহযাত্রী জনা তিন-চার মিন্‌গ্রেলীয় ইতিমধ্যেই হালকা পায়ে, প্রায় নাচতে-নাচতেই যেন, অন্ধকারের মধ্যে কোথায় সরে পড়েছিল। খুব সম্ভব শহরের দিকেই হাঁটা দিয়েছিল তারা।

চতুর্দিকে খালি আছড়ে-আছড়ে পড়ছিল জল। সমুদ্র গুনগুন করে চলেছিল একঘেয়ে সুরে, নির্বিকারভাবে।

'এখন আমি শহরে যাই কী করে?' অন্ধকারকেই যেন জিজ্ঞেস করল স্ত্রীলোকটি। হয়তো আশা ছিল কেউ-না-কেউ ওর কথা শুনতে পাবে। কিন্তু কোনো উত্তর এল না।

বাচ্চা মেয়েটা মায়ের দিকে কাঁদো-কাঁদো চোখ তুলে তাকিয়ে একটা হাতব্যাগের ওপর বসে ছিল।

বছর-দশেক বয়সের জুতো-পালিশওয়ালা ছেলে ক্রিস্তোফর ক্রিস্তফোরিদি অন্ধকার জাহাজঘাটা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ওর একহাতে ছিল একগাদা কঞ্চির মাছধরা ছিপ, আরেক হাতে বুরুশ আর পালিশের কালির বাক্সটা।

ক্রিস্তফোরিদি মাছধরায় সিদ্ধহস্ত। রাত্তিরবেলাতেই ছিপ ফেলা পছন্দ করে ও। এ-সময়ে বাতিঘরের চোখ-পিটপিটি সংকেত-আলোর ঠিক পাশটাতেই বসে মাছধরায় বাধা থাকে না কোনো, আবার ওইটাই স্ক্যাড্‌মাছ ধরার সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। তখন অবশ্য জোলো বাতাসে ও ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে আর ঠোঁটদুটো ঠাণ্ডায় এমন জমে যায় যে পরদিন ভোরবেলা কথাবলার ক্ষমতা থাকে না পর্যন্ত। তবু প্রতিবার চমৎকার সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে ও এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

ক্রিস্তফোরিদির বিশেষ তাড়া ছিল। কারণ পরদিন মাত্র সকাল আটটা পর্যন্তই ওর পক্ষে মাছধরা সম্ভব, তারপরই ওকে গিয়ে পেঁছিতে হবে পরপর কয়েকজন বন্দর-কর্মচারির বাড়ি তাঁদের জুতো পালিশ করতে। এঁরা হলেন ক্যাপ্টেন চোপ, বন্দরের ক্যাশিয়ার আর বন্দরের পথ-প্রদর্শক পাইলট। এর অর্থ, ওর হাতে আছে আর মাত্র ঘণ্টা-তিনেকের মতো সময়। যাই হোক, এইভাবে পেশাদারি রোঁদ সেরে ক্রিস্তফোরিদি গিয়ে বসবে বন্দরের বাস-স্টপটায়। সেখানে সারাদিন জুতো-পালিশ করে ও রোজগার করবে বড়জোর

রুব্‌ল-দুয়েকের মতো। বাসের ওই স্ট্যান্ডটায় লোকের আনাগোনা কম, তাই ওখানকার ব্যাবসাটাও তেমন লাভের না। তবু ক্রিস্তফোরিদি-যে ওই বাস-স্ট্যান্ডটাই বেছে নিয়েছে তার কারণ সমুদ্র ছেড়ে ও বেশি দূরে যেতে পারে না, সমুদ্রের ওপর ওর দুর্দমনীয় টান।

যদিও তাড়া ছিল ক্রিস্তফোরিদির তবু যে-ছোট্ট বাড়িটায় চোপ থাকতেন তার সামনে এসে একবার না-থেমে পারল না ও। তারপর একটা আলোকিত খোলা জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল। বাড়িটা ছিল বলতে গেলে একেবারে জেটির গা-ঘেঁষেই, বন্দরের সবচেয়ে নির্জন জায়গাটায়। সমুদ্রে ঝড় উঠলে ঢেউয়ের ঝাপটা ক্যাপ্টেনের বাড়ির জানলাগুলো দিয়ে ঢোকে—এত কাছাকাছি।

দেখা গেল ঘরের মধ্যে আছে জনা-তিনেক লোক। তারা বসে আছে টেবিলটা ঘিরে আর তামাকের ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেড়ে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে ঘরটা। অত গভীর রাত সত্ত্বেও টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম বিছনো। ক্রিস্তফোরিদি ওদের সবাইকে চেনে। ওরা হল—চোপ, এঞ্জিনিয়র গাবুনিয়া আর রোগা, তালঢ্যাঙা এক ইংরেজ নাবিক যাকে বন্দরে সবাই সিওমা বলে চেনে।

ওদের জাহাজ পোতি ছেড়ে যাবার সময় সিওমা লোকটা জাহাজ ধরতে পারে নি, আর তার পর থেকে ও বেকার ঘুরে বেড়ায় শহরময়। প্রথম-প্রথম লোকে যখন ওকে জিজ্ঞেস করেছে, 'কে হে তুমি?'—ও তখন ইংরেজিতে জবাব দিয়েছে, 'সীম্যান।' আর তা-ই থেকে চোপ ওর রুশী নাম বানিয়ে নিয়েছেন—সেমিওন, সিওমা।

'বাইরে—কে-ও?' হঠাৎ কান-ফাটানো আওয়াজে হেঁকে উঠলেন চোপ।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্রিস্তফোরিদি দিল দে-দৌড়। তারপর বেশ খানিকটা নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে জানলাটার দিকে ও ঘুসি বাগিয়ে নাড়ল। চোপকে যে ও ভয় পায় তা নয়, তবে পাছে কোনো ফ্যাসাদে পড়ে এই হচ্ছে ওর ভয়। ও জানত, রাত্রে বন্দর-এলাকায় ছিপ-ফেলিয়ে মাছধরাদের ঘুরে বেড়ানো সহ্য করতে পারেন না চোপ। ঠিক এই সময়ে একটা বাচ্চার কান্না ক্রিস্তফোরিদির কানে এল, আর শুনল একজন মেয়েছেলের গলা। মেয়েছেলেটি বলছে:

'কাঁদে না, ইয়োলচ্কা, কাঁদে না, ছিঃ! দ্যাখো না, এখখুনি কারও সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যাবে'খন।'

গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল ক্রিস্তফোরিদি। চতুর ছেলে ও, কথা শুনেই বুঝতে পেরেছে যে মেয়েছেলেটি নিশ্চয়ই পোতিতে নতুন আসছে, হয়তো রাতের কোনো স্টিমারে এসে পৌঁছেছে ওরা। আর ওর জানা ছিল যে শহরে যাবার বাস আরও চার ঘণ্টার মধ্যে ছাড়বে না, রাতে কোনো ভাড়ার গাড়িও মিলবে না মাথা খুঁড়লে।

ক্রিস্তফোরিদি ঠিক করল, মেয়েছেলেটির সাথে কথা কওয়া দরকার। বাচ্চা মেয়েটার অবস্থা দেখে ভারি দুঃখ হচ্ছিল ওর। কিন্তু কী করে যে কথা শুরু করবে বুঝে উঠতে না-পেরে সুর করে ফেরিওলার ঢঙে বললে:

'জুতা-পালিশ করাবেন, দিদি! জুতা-পালিশ?'

'বোকা ছেলে কোথাকার!' হেসে উঠে বললে স্ত্রীলোকটি। 'রাত্তিরবেলা কে আবার কবে জুতো-পালিশ করায়?'

যাই হোক, এইভাবে আলাপ জমে উঠল। স্ত্রীলোকটিও খুশি হল। অচেনা, নির্জন একটা জাহাজঘাটায় জুতো-পালিশওলা একটা ছেলে, তার ওপর আবার মাছ-ধরিয়ে, তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার চেয়ে সুখের ব্যাপার আর কী

হতে পারে? ছিপ ফেলে মাছ ধরে যারা তারা সাধারণত ভালোমানুষ আর বক্তার হয়ে থাকে; আর জুতো-পালিশের পেশা নেয় যারা তাদের ভাঁড়ারে জমে ওঠে বাস্তব তথ্য আর খবরাখবরের মস্ত এক সঞ্চয়। কোনো শহরে যদি বেশ কিছু জুতো-পালিশওলা ছেলে থাকে তাহলে সেখানে খবর-সরবরাহ দপ্তরের আর কোনো প্রয়োজনই থাকে না।

জুতো-পালিশওলা ছেলে আর মাছ-ধরিয়ে হিসেবে মূল্যবান গুণাবলী ছাড়াও ক্রিস্তফোরিদির বাড়তি আরও একটা গুণ আছে—সেটা হচ্ছে উৎসাহের আধিক্য। স্ত্রীলোকটির অসহায় অবস্থা দেখে দারুণ-দারুণ একগাদা পরিকল্পনা তার মাথায় খেলে গেল। কিন্তু সত্যি বলতে কি, স্ত্রীলোকটিকে কীভাবেই-বা সে সাহায্য করতে পারে? শহরের মধ্যেকার 'কৃষ্ণসাগর' হোটেল বন্দর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে। আর স্ত্রীলোকটির মালপত্র এতটা পথ টেনে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সত্যিই অসম্ভব।

তবে এসব নিয়ে বেশিক্ষণ চিন্তা করার অবসর জুটল না তার। পোতি-অঞ্চলে ভোরের আগে সচরাচর যে-বৃষ্টি হয়ে থাকে তারই সূচনা জানিয়ে এই সময়ে আস্তে-আস্তে অল্প কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল।

'এট্টু দাঁড়ান কেনে, আমি এখুনি আসচি,' কথাক'টা বলেই ক্রিস্তফোরিদি অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। স্ত্রীলোকটির পায়ের কাছে পড়ে রইল তার জুতো-পালিশের সরঞ্জামের বাক্স আর মাছধরার ছিপগুলো।

যত তাড়াতাড়ি পারে দৌড়ে ছেলেটা চোপের বাসায় চলে গেল। রাত্তিরবেলা এমন সব অসাধারণ কাণ্ডকারখানা ঘটায় উত্তেজনায় হাঁপাতে-হাঁপাতে ক্যাপ্টেনকে গল্পটা আদ্যোপান্ত শুনিয়ে দিল সে। শুনে প্রথমটা চোপ গাঁইগুঁই করতে

লাগলেন, জানালেন তাঁর বাসাটা যাত্রীদের যাতায়াতের পথে ওয়েটিং-রুম নাকি! তবু কিন্তু তিনি ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ক্রিস্তফোরিদির দিকে চোখ পাকিয়ে কটমট করে তাকিয়ে বললেন:

'তা, মেয়েটা সকাল পর্যন্ত এখেনে থাকতে পারে। অবিশ্যি আমার সারা রাত্তিরের ডিউটি, তবু যাই হোক আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্ দেখি, ছোঁড়া!'

ক্যাপ্টেন আর গাবুনিয়াকে পথ দেখিয়ে জাহাজঘাটায় নিয়ে চলল ক্রিস্তফোরিদি। আর সারা রাস্তা গাবুনিয়া ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করতে-করতে চলল। গাবুনিয়া চলে যেতেই চাইছিল, কিন্তু ক্যাপ্টেন কিছুতেই তাকে যেতে দিতে রাজি নন।

বিড়বিড় করে তিনি বলছিলেন, 'আহাম্মক মেয়েছেলেগুলোর মোকাবিলা কেমন করে করতে হয় কোনোদিন শেখা হয় নি আমার।' আর খালি চাইছিলেন গাবুনিয়া যাতে সকাল পর্যন্ত থেকে যায়।

তাই শেষ পর্যন্ত গাবুনিয়া থাকতে রাজি হয়ে গেল।

লোকদুটির রকমসকমে স্ত্রীলোকটি কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। দেখল, লোকদুটি তার মালপত্র পাকড়ে নিয়ে সরাসরি জেটির দিকেই তাকে নিয়ে চলেছে যেন। আর যতই সেদিকে এগিয়ে চলেছে ততই প্রতি পদক্ষেপে সমুদ্রের গর্জন ক্রমশ বেশি জোরালো আর নাছোড়বান্দা হয়ে উঠছে। ক্রিস্তফোরিদি আসছিল পিছু-পিছু, আর এত খুশি হয়ে উঠেছিল সে যে প্রাণ খুলে শিস দিচ্ছিল। ব্যাপারটার শেষ পরিণতি কী দাঁড়ায় তা দেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল সে। দলটার মধ্যে অবশ্য কথাবার্তা বিশেষ কিছু হচ্ছিল না, কারণ সমুদ্রের বাতাসের শব্দে আর পায়ের নিচের পাথর-

নুড়ির মড়মড় আওয়াজে পরস্পরের কথাবার্তা শোনা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

স্ত্রীলোকটি হেঁটে চলেছিল যেন স্বপ্নের ঘোরে। তার মনে হচ্ছিল বুঝি সে তখনও জাহাজেই রয়েছে। অ্যাকেশিয়া গাছের ফাঁকে-ফাঁকে বাতাসের মর্মর-শব্দে পায়ের নিচের মাটি যেন কেঁপে-কেঁপে উঠছে বলে ধারণা হচ্ছিল তার।

স্বপ্নের ঘোরেই যেন মেয়েটি এসে ঢুকল ছোট্ট শাদা বাসাবাড়িটিতে। দেখল, সেখানকার সবকটা তামার ব্যারোমিটর-যন্ত্রে কাঁটাগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে ‘পরিবর্তনশীল’ আবহাওয়ার, আর ঠিক ছাদের নিচটাতে ওপর থেকে ঝুলে রয়েছে গিলটি-করা সামনের নোয়ানো মাস্তুল সহ শাদারঙের সমুদ্রগামী ক্লিপার-জাতীয় জাহাজের একখানা মডেল।

স্ত্রীলোকটি ঘরে ঢুকতেই ঢলঢলে নীল পোশাক-পরা শণের নুড়ির মতো চুলওয়ালা একজন নাবিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর প্রথমে তার সঙ্গে পরে তার ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে করমর্দন করল। লোকটির হাতের মুঠো এত শক্ত যে ওদের দু'জনেরই আঙুলের হাড়গুলো উঠল মড়মড় করে। বাচ্চা মেয়েটি তো কাঁদতেই শুরু করে দিল।

নাবিকটি তখন বাচ্চার সামনে হাঁটু ভেঙে বসে মজার-মজার মুখভঙ্গি করতে লাগল। অবশেষে একসময় তালে-তালে তালি বাজিয়ে কর্কশ খরখরে গলায় একটা অর্থহীন ইংরেজি ফক্সট্রট নাচের সুর ধরে দিল। মেয়েটির কান্না থামানোর চেষ্টা করছিল সে। যাই হোক, কিছু না-বুঝলেও বাচ্চাটি অবশেষে হেসে উঠল।

এর ফলে অস্বস্তির ভাবটা কেটে গেল সকলেরই। স্ত্রীলোকটি গাবুনিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করল। ক্রিস্তফোরিদি বাড়ির মধ্যে থেকে যাওয়ার একটা অছিলার

খোঁজে ক্যাপ্টেনের রান্নাঘরে গিয়ে সেঁধোল, তারপর একজোড়া বহু পুরনো বুট খুঁজেপেতে বের করে বুরুশ নিয়ে সজোরে আক্রমণ করল বুটজোড়াকে। যতক্ষণ-না বুটজোড়া ঝলমলিয়ে উঠে চোখ ধাঁধিয়ে দিল তার, ততক্ষণ সে তাতে কালি লাগিয়ে বুরুশ করে চলল।

আর কাজ করতে-করতে কান খাড়া করে পাশের ঘরের কথাবার্তা শুনে চলল সে। গাবুনিয়ার প্রশ্নের জবাবে স্ত্রীলোকটি যা বলল তা থেকে সে জানল যে স্ত্রীলোকটির নাম ইয়েলেনা সের্গেয়েভ্না নেভ্স্কায়া, সে একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী (উদ্ভিদবিজ্ঞানী কাকে বলে ক্রিস্তফোরিদি তা জানত) আর সে কাজ করতে এসেছে পোতি-র মন্দোষ্ণ-মণ্ডলীয় উদ্ভিদের পরীক্ষামূলক বাগানগুলোয়। বাচ্চাটিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বড়রা এরপর চায়ের টেবিলে এসে বসল।

আর চা খেতে-খেতে তারা যে-সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আলাপ করতে লাগল তা শুনতে-শুনতে মাছ ধরতে যাওয়ার সমস্ত উৎসাহ উবে গেল ক্রিস্তফোরিদির। সারাটা রাত ওই রান্নাঘরে বসেই কাটিয়ে দিল সে, আর পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন রান্নাঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন ক্রিস্তফোরিদির চারপাশে মালার মতো ছড়িয়ে আছে এমন একসার বাতিল জুতো যা বহুদিন থেকেই তিনি ফেলে দেবেন-দেবেন করছিলেন। অথচ জুতোর জোড়াগুলোকে এখন মনে হচ্ছে যেন জাপানি ল্যাকারের পালিশ-দেয়া রীতিমতো সব শিল্পকর্ম। তার সারারাতের পরিশ্রম আর জুতোর কালি এভাবে নাহক নষ্ট হওয়ায় ক্রিস্তফোরিদির মনে কিন্তু তাবলে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা ছিল না। সেদিন রাত্রে সে যে-সব আলাপ-আলোচনা শুনল তা সবচেয়ে ভালো জুতোর কালির

গোটা একডজন কৌটোর দামের সমান বলে মনে হয়েছিল তার।

স্ত্রীলোকটি তার টুপি আর বর্ষাতি আলনায় টাঙিয়ে রেখে টেবিলের ধারে গুছিয়ে বসার পর চোপ তার ক্লান্ত কচি মুখখানার দিকে তাকিয়ে ভালোমানুষের মতো বলেছিলেন:

'তাহলে আপনি আমাদের এই স্বর্গোধামে, কলখিদায় থাকতে এসেছেন? বটে বটে, চমৎকার! তা, এখেনে কী করবেন বলে মনস্থ করেছেন?'

'এমনিতে আমি চায়ের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ, তবে এখানে যা-কিছু গাছগাছড়া জন্মায় তা-ই নিয়েই কাজ করব। বিশেষ করে আমার কাজ হবে ইউক্যালিপ্টস নিয়ে।'

'ইউক্যালিপ্টস? ও তো বাজে ব্যাপার!' ক্যাপ্টেন বললেন। 'তবে হ্যাঁ, চা অবিশ্যি ভিন্ন কথা। আমি নিজেই বলতে গেলে চায়ের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। এককালে শয়ে-শয়ে টন চা সাগরপার থেকে নিয়ে এসেছি। আচ্ছা, এই দেখুন!'

ছাদের ঝুলন্ত মডেলটার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন ক্যাপ্টেন।

'জিনিসটা চিনিয়ে দিই আপনাকে! এটা হল গে চা-বওয়া জাহাজ 'বেগোনিয়া'। দুনিয়ার সবশেষ ক্লিপার-জাহাজ। তিন-তিনটে বছর এই জাহাজ চালিয়েছি আমি।'

শুনে সিওমা প্রশংসাসূচক ঘোঁতঘোঁত আওয়াজ তুলল। আর নেভ্স্কায়া চোখ তুলে ক্লিপার-জাহাজটার দিকে তাকাল। ওর ক্লান্ত চোখদুটোর নিঃসীম প্রশান্তি আর লালচে-বাদামি ভারি চুলের গোছাটা নজরে পড়ল গাবুনিয়ার।

চোপ ভারি বক্তার মানুষ। কথা বলাটাই বিশ্রাম নেয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় বলে তাঁর ধারণা। তাঁর বন্ধুবান্ধবও অগুনতি আর প্রায়ই তিনি তাঁদের বলে থাকেন:

'আসুন, একটু বিশ্রাম আর একটু গুলতানি করা যাক।'

গাবুনিয়া নিশ্চিত জানে যে চোপ এখন কথা বলার প্রলোভন ছাড়তে পারবেন না। আর সত্যিই তাই ঘটল, তিনি টোপ গিললেন।

বললেন, 'আপনারা ভাবছেন বুড়ো বুঝি মিছে কথা কইছে, তাই না? দুনিয়ার সব ক্লিপার-জাহাজের পাট কোনকালে উঠে গ্যাছে, তাই তো? তা উঠে গ্যাছে বটে, সে-কথা মানি। তবে একখানা মাত্তর ক্লিপার—আমাদের 'বেগোনিয়া'—একেবারে লড়াই বাধার সময় পর্যন্ত সিংহল আর ইংলন্ডের মধ্যে চলাচল করেছিল। জাহাজখানা ছিল চা-বওয়া ক্লিপার আর সত্যিই ভারি সুন্দর ছিল জাহাজখানা! প্রত্যেকবার পাড়ি দেয়ার আগে আমরা ওটার গায়ে নতুন একপোঁচ ল্যাকার লাগিয়ে নিতাম, আর তখন জাহাজখানা এমন চকচক করত যে মনে হোত সবে বুঝি ওটাকে ধুয়েপুঁছে সাফ করা হয়েছে। 'পথে যেতে পচা নোংরা কয়লা-বওয়া জাহাজগুলোর ক্যাপ্টেনদের কাছে আমরা ছিলাম দু'চক্ষের বিষ। তারা আমাদের সিগ্ন্যাল পাঠিয়ে বলত, 'আমরা ময়লা লাগানোর আগে ঘাগরা তোমার তুলে চল গো অপ্সরী!' ওরা আমাদের নাম দিয়েছিল, 'চায়ের আড্ডার পা-চাটা।' প্রত্যেকটা বন্দরেও লোকে আমাদের ঘেন্না করত। কেন, শুনতে চান? দাঁড়ান—তাহলে বলি।

'আমরা চালান দিতাম চা—কলম্বো থেকে লন্ডন। আর সে চা ছিল এক বিশেষ ব্র্যান্ডের—আমার তো মনে হয় দুনিয়ার সবচে' ভয়ঙ্কর ব্র্যান্ড সেটা। তাকে বলা হোত 'শ্বেতকেশী'—অর্থাৎ, পিকো। তা, আপনি তো চায়ের বিশেষজ্ঞ। আপনি বুঝবেন ব্যাপারটা। বলা হয়, চা যখন লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে আসে তখনই তা সবসেরা হয়ে ওঠে।

পথ পাড়ি দিতে-দিতে চায়ের কড়া ভাব, সুগন্ধ আর রুচিকর ভাবটা বৃদ্ধি পায়। লোকে বলে, সময়ের সাথে-সাথে বাতাস আর গরমিতে নাকি এমনটা হয়। সেকালে আমাদের এই রুশদেশে 'ক্যারাভান'-মার্কা চা-কে কেন সবসেরা বলা হোত তারও যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি। সেই চা বছরখানেকের বেশি সময় ধরে ক্যারাভানে চেপে চীনদেশ থেকে আসত। আর আসতে-আসতে তিন-নম্বরী চা হয়ে উঠত পয়লা-নম্বরী। কী বলেন, তা-ই নয় কী? দেখলেন তো, আমিও এ-ব্যাপারের কিছু-মিছু জানি...'

সিওমা ইতিমধ্যে টেবিলে মাথা রেখে নাক ডাকাতে শুরু করেছে। চোপ তার ক্যাপটা টেনে নামিয়ে তার নাকটা ঢেকে দিলেন প্রায়, তারপর গাবুনিয়াকে বললেন:

'লক্ষ্মী-সোনা, তুমি ওকে তোমার কাজের ঠেঁয়ে নিয়ে গে, যা-হোক একটা কাজে ওকে লাগিয়ে দ্যাও দিনি। নিজের জাহাজ ধরতে পারে নি ও, তাছাড়া ইংলন্ডে ও ফিরে যেতেও নারাজ। লোকটার মনটা ভালো, তবে মগজে বুদ্ধিসাধ্যি একটু কম রাখে বলে মনে হয়। আর কথাও বড্ড কম কয়।'

'ঠিক আছে, ওকে কাজে ভর্তি করে নেব'খন। তারপর, আপনার ক্লিপারের গল্প বলুন, শুনি।'

'হ্যাঁ, ওই-যা বললাম—চায়ের এই গুণের জন্যেই আমাদের ক্লিপার-জাহাজখানা চালু ছিল। জাহাজটার মালিক ছিল 'লেস্‌লি টি কম্পানি'। বেশির ভাগ 'লেস্‌লি টি' অবিশ্যি লোহার তৈরি স্টিমারে করে চালান যেত। কিন্তু, ব্যাপারখানা বলি, চোষ-কাগজ যেমন করে কালি টেনে নেয় চা-ও তেমনি করে আশপাশের গন্ধ শুষে নেয়। তাই স্টিমারে আসতে-আসতে চায়ের আসল গন্ধ যেত নষ্ট হয়ে, আর তা শুষে

নিত লোহার, কয়লার আর চামড়ার গন্ধ, ইঁদুর আর জমা পচাজলের দুর্গন্ধ—এক কথায়, জাহাজের খোঁদলে যতকিছু ময়লা-নোংরা থাকত তার গন্ধ। আর তাই সেই চা—সেই স্টিমারে চালান-আসা চা—বিক্রি করা হোত সাধারণ মানুষজনের কাছে। আর চা-রসিকদের জন্যে, সমঝদারদের জন্যে (চুলোয় যাক তারা!) চা আসত কাঠের তৈরি ক্লিপার-জাহাজে চেপে।

'আমাদের জাহাজে ইঁদুরের দুর্গন্ধ ছাড়ত না। আমাদের জাহাজে ছাড়ত পামগাছের কাঠের আর যুঁইফুলের গন্ধ। সত্যি বলছি, মাইরি! তা, যুঁইফুলের গন্ধ কেন? না, চায়ে যাতে সুগন্ধ বার হয় তার জন্যে চালানদাররা চায়ের সাথে যুঁইফুলের কুঁড়ি, ক্যামেলিয়া ফুল আর লরেল পাতা রেখে দিত। আমাদের গন্ধ ঠাওরাবার নাক ছিল মান-কাড়ানী সোহাগিনী মেয়েছেলের মতনই ধারালো। আমাদের জাহাজের পিছুপিছু সেই মিষ্টি সৌরভের বাস রয়ে যেত, আর পথে অন্য স্টিমারের সাথে দেখা হলে তারা হেঁকে বলত আমাদের, 'এঃ, ভারি আমার মিষ্টি বাস-ছাড়ুনে এয়েচেন! ওই-যে ক্যাপ্টেন ফ্রেই যেতে নেগেচেন! জলে-ভাসা নাপতের দোকান একখান লিয়ে চলেচেন লণ্ডন!'

'আর শুধু কি তা-ই! কম্পানির হুকুম ছিল, কলম্বো থেকে লন্ডনে জাহাজ নিয়ে যেতে হবে সুয়েজ খাল দে নয়, গোটা আফ্রিকা চক্কর দে। আমরা চলতাম ধীরে-সুস্থে, তাড়া ছিল না একেবারে। মতলবখানা ছিল এই যে চায়ের চালান যত দেরি করে পথ পাড়ি দেয় ততই ভালো। তবে সে চা বন্দরে পৌঁছুলে খদ্দেরের কাছ থেকে দামও আদায় করা হোত তেমনি! এখন বুঝতে পারেন, প্রতিটি বন্দরে কেন লোকে আমাদের ঘেন্না করত।

'সবসেরা সব ব্র্যান্ডের চা আমরা চালান দিতাম, তার মধ্যে একটা ব্র্যান্ডের নাম ছিল 'শ্বেতকেশী'। আর যখনই আমি এখেনে এই গাব্‌নিয়ার পানে তাকাই, সেই চায়ের কথা মনে পড়ে যায় আমার। তোমার রগের চুলে পাক ধরেছে বলে-যে তা না কিন্তু, গাব্‌নিয়া। বেশি ভাবনাচিন্তা করলে এমন ধারা হয়। আমি জানি, তোমার বয়েস তো মাত্তর বত্তিরিশ।

'আচ্ছা, চায়ের নাম 'শ্বেতকেশী' হল কী করে সেই ব্যাপারটা জানতে পারলাম কেমন করে বলি তাহলে। শ্‌ন্‌ন্‌, ভারি আজব ব্যাপার সেটা।

'সিংহলে থাকতে একবার আমি জাহাজ ধরতে পারলাম না, এই যেমন আমাদের সিওমা ধরতে পারে নি তেমনি,' এই বলে ক্যাপ্টেন সিওমার ক্যাপটা আরও টেনে প্রায় ওর ম্‌খের ওপর নামিয়ে দিলেন। তারপর ফের শ্‌র্‌ করলেন, 'তা ভাবলাম, কী করি? একবারে পকেট ফাঁক, খাওয়ার পয়সাও নেই তখন! অথচ 'বেগোনিয়া' জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগবে। তাই লেস্‌লিদের চা-বাগানে ওভারসিয়রের চাকরি জোটালাম একটা। সেখেনে কুলিকামিনরা সব্বাই ছিল স্থানীয় লোক আর বেশির ভাগই মেয়েছেলে...'

রান্নাঘরে জ্‌তোয় ব্‌র্‌শ চালানোর শব্দ থেমে গেল এই সময়। বোঝা গেল, ক্যাপ্টেনের গল্প শ্‌নতে-শ্‌নতে এত মশগ্‌ল হয়ে পড়েছিল ক্রিস্তফোরিদি যে জ্‌তো-পালিশের ভান বজায় রাখা তার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না।

সবে ভোরের আলো দেখা দিয়েছে তখন। মাথার ওপরে আকাশ তখন সব্‌জ আর সম্‌দ্রের মতো বিপ্‌ল। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন চোপ।

বললেন, 'এত শান্ত চারিধার! ভারি সুন্দর দেখতে লাগচে!.. হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ওইখেনেই আমি জানলাম উপনিবেশ কাকে বলে, আর গ্রীষ্মমণ্ডলই-বা কী জিনিস। ওর পর থেকেই গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রতি আমার ঘেন্না ধরে গ্যাচে। ওইসব কথা ভাবলে মুখে কেমন একটা কটু আস্বাদ পাই।

'ধর, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠলে... আর মিনিটে-মিনিটে মনে হবে বাতাসের ছোঁয়া লেগে যেন শরীর তোমার আরও কচি আরও কাঁচা হয়ে উঠচে। নদীর জলে কুলকুল আওয়াজ, স্যুপের প্লেটের আকারের মস্ত-মস্ত কী-এক ধরনের নচ্ছার যতসব ফুল গাছে-গাছে আর ন্যাজে গাছের ডাল পাকিয়ে ঝুলে-থাকা বাঁদরগুলো তোমার মাথার উপর টুপটাপ করে কী-সব ফেলতে লেগেচে। দেখবে, ভুঁইয়ের উর্বরতা আর ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি চারদিকে। আর কী সুগন্ধ! গন্ধেই মানুষকে কবি করে তোলে।

'হ্যাঁ, তারপর ঘুম থেকে জেগে উঠলেই দেখতে পাবে মস্ত বড় থালাপানা একখানা সুয্যি গরমির দেশের ঝোপঝাড়ের ওপর দে উঁকি দিচ্চে। আর শুনবে মানুষের শরীরে বেত আছড়ানোর আওয়াজ আর মেয়েছেলের কান্নাকাটি আর ওভারসিয়রদের চড়াগলার দাবড়ানি। দেখতে পাবে বাচ্চারা নারকেলের খোসা চিবুচ্চে। আর দেখেশুনে তোমার ভেতরটা ফুটতে থাকবে টগবগ করে আর রাগে-দুঃখে মনে হবে মাথাটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্চে।

'লোকে বলে গ্রীষ্মমণ্ডল নাকি স্বর্গরাজ্যি। কে বলে এমন কথা? খবর্দার, আহাম্মকগুলোর কথা যেন বিশ্বাস করে বোসো না! গ্রীষ্মমণ্ডল হল গে সাক্ষাৎ নরক! চক্ষের জলে তলিয়ে-যাওয়া রাত্তির নিয়ে বাস, এই হল গে তোমার

গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশ! ক্বচিৎ কখনও হয়তো দেখবে দেশোয়ালি কোনো লোকের মুখ ফ্যাকাশে মেরে গ্যাচে, দাঁত কিড়মিড় কচ্চে সে, দেখে মনে হবে এই বুঝি ওভারসিয়রের থুতনিতে একখানা ঘুসি ঝাড়তে যাচ্চে। কিন্তু দেখা যাবে সে হাত মুঠি পাকাতেই পারচে না। এটা একটা রোগ, ওসব দেশে দেখা যায়। এ-রোগের নাম হল গে 'রবার-মুঠি'। একে গরমি, তায় জ্বরজারি, তায় আবার অমানুষিক পরিশ্রম— সব মিলে মানুষের শক্তি-সামর্থ্য একবারে শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত শুষে নেয়। সবচে' জোরালো দেশোয়ালি লোকের হাতের মুঠো আমি বিনা আয়াসে মাত্তর দু'টো আঙুল দে খুলে দিতে পারতাম। এই হল গে তোমার গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশ!

'হ্যাঁ, ভালো কথা। আমাকে এমন একটা চা-বাগানে কাজ দেয়া হল যেখেনে 'শ্বেতকেশী' ব্র্যান্ডের চা জন্মায়। সত্যি-সত্যি, সেই চা-পাতার ডগাগুলা শাদাটেপানা দেখতে।

'তা, একদিন হল কী, এক পাকাচুলো মেয়েছেলের সাথে দেখা হয়ে গেল আমার। মেয়েছেলেটা গুটিসুটি মেরে ভুঁয়ে বসে অঝোরে কাঁদছিল। তা শুধোলাম, কী হয়েচে? জানা গেল, মেয়েছেলেটার সোয়ামি অসুস্থ, কিন্তু তবু সোয়ামির দেখাশোনা করতে সে ঘরে যেতে পারচে না। কেননা, তাহলে ওপরওলারা তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করবে, আর নয়তো মারধর করবে তাকে। আমি তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম, আর তখন দেখতে পেলাম কত অল্প বয়েস মেয়েছেলেটার। এই—আপনার চেয়ে বয়েসে বড় হবে না। তা, তাকে বললাম, 'যা, ঘরমুখো চলে যা, তোকে ছুটি দেয়ার দায়িত্ব আমি ঘাড়ে নেব অখন।' তা, মেয়েটা আমার হাতে চুমো দে বললে, 'হুজুর মালিক, এইসব ওপরওলা

আমাদের 'পরে কী অত্যেচারটা-যে করে তা আপনি জানেন না! আমাদের দুঃখুকষ্ট দেখে এমন কি চা-পাতা পর্যন্ত পাকাচুলো শাদা হয়ে যায়। চা-পাতা পর্যন্ত, বুইলেন! আর তাই আমরা এই চায়ের নাম দিচি 'শ্বেতকেশী'...।'

এই পর্যন্ত বলে থমকে গেলেন চোপ।

'কিন্তু এর মধ্যে আমি আবার এলাম কী করে, প্রভু?' গাবুনিয়া শুধোল। 'এই চা আর আমার মধ্যে সম্পর্কটা কী?'

'সম্পক্কটা হল এই যে তোমার জন্যেই গ্রীষ্মমণ্ডলকে ঘেন্না করা ভুলে বসেচি।' বলে চোপ একমুহূর্ত থামলেন, তারপর নেভ্স্কায়ার দিকে ফিরে আর মাথার ইঙ্গিতে গাবুনিয়াকে দেখিয়ে ফের বলে চললেন, 'বুঝলেন, এই লোকটাই আমাদের এ-অঞ্চলে সোভিয়েত গ্রীষ্মমণ্ডল গড়ে তুলতে লেগেচে। এটা আমি বেশ ধরতে পারচি: সেই একই প্রকার ঐশ্বর্য, সেই এক জমির উর্বরতা, তবে সবকিছুর সাথে মিশে আচে স্বাধীনতা আর একটা বড় লক্ষ্য। প্রাণ ঢেলে খাটার যুগ্যি একটা যে লক্ষ্য আচে তা মানতে হয়!

'সেদিন পাখোমভের সাথে দেখা। তা সে বলে কী, 'আপনি কিচ্ছুটি বোঝেন না, চোপ। হ্যাঁ, আমরা জলা-অঞ্চলের জলনিকেশ করে তার জায়গায় নতুন একটা গ্রীষ্মমণ্ডল বানাচ্চি। বুঝলেন? এখেনে আমরা কমলানেবু, পাতিনেবু, শণ, চা আর কতকিছুর-যে আবাদ করতে লেগেচি কী বলি। ম্যালেরিয়ার জ্বর নির্মূল করে দিচ্চি এ-তল্লাট থেকে আর সমুদ্দুরের ধার-বরাবর স্বাস্থ্যনিবাস বানিয়ে চলেচি। এ-সবই অবিশ্যি খুব ভালো জিনিস, তবে এটাই প্রধান কথা না। প্রধান কথা হল, যাদের খাটুনি হল গে স্বেচ্ছাধীন, স্বাধীন, সেইসব মানুষজনের জন্যে প্রকৃতিকে নতুন করে

বানিয়ে তুলচি আমরা। আমাদের এই গ্রীষ্মমণ্ডলকে আমরা এমন ফলেফুলে ঐশ্বর্যে ভরে তুলব যা আপনাদের ওই চা-বাগানের কত্তারা স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবতে পারে নি। আমাদের নতুন যুগের শক্তি-সামর্থ্য যে কতখানি তার প্রমাণ দেব আমরা এখেনে, আর তা আপনার সবচে' উদ্ভট কল্পনাকেও বলবে—দূরে থাক!' সত্যি, লোকটা বড্ড ভালো, আমাদের এই পাখোমভ! এমন লোক, যেখানে-সেখানে মেলে না!..'

গাবুনিয়া দাঁড়িয়ে উঠল এবার। খালকাটার প্রকল্পে ফিরে যাওয়ার জন্যে চালাদিদির দুপুরের ট্রেনটা ধরতে হবে তাকে।

এতক্ষণে বন্দরের সকাল তার স্বমূর্তি ধারণ করেছে। মালবোঝাই আর মালখালাসি মজুররা হৈ-চৈ জুড়েছে, কপিকলগুলো জোর আওয়াজ তুলছে ক্যাঁচকোঁচ করে। শহরগামী বাসটাও ভেঁপু বাজাচ্ছে ঘনঘন। মোটা, ধরাগলায় চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে একটা সমুদ্রসারস পাখার ঝাপট দিয়ে জানলার ওপাশে উড়ান দিল একসময়।

মুখে ফিকে হাসি ফুটিয়ে চোখ তুলে তাকাল নেভ্স্কায়া। চোখের পাতাদুটো ওর ভারি-ভারি ঠেকছে। কষ্ট করে জেগে থাকার চেষ্টা পাচ্ছে ও।

'শুনুন গো, উদ্ভিদবিজ্ঞানী!' হঠাৎ চোপ যেন খেঁকিয়ে উঠলেন। 'আমি বলি কী, পাকাপাকি বাসা না-পাওয়া পর্যন্ত আপনি এখেনেই থেকে যান-না কেন? হোটেলে আবার জীবন কাটানো যায় নাকি, তার ওপর আবার কচি বাচ্চা নে? এখেনে আমার গোটাদুই ঘর আচে, তা একটা ঘর আপনাকে ছেড়ে দেব'খন। আর ক্রিস্তফোরিদি আপাতত আপনার কচি বাচ্চাটার দেখাশোনার ভার নিতে পারে। যখন

সে নিজেই প্রায় কচি বাচ্চার সামিল তখন থেকেই মায়ের হুকুমে তাকে নিজের ছোট দুই বোনকে সামলে রাখতে হোত।'

'সত্যি-সত্যি মন থেকে বলছেন তো?' নেভ্স্কায়া শুধোল। 'স্বীকার করতে লজ্জা নেই—এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে সোজা হয়ে বসে থাকতেও পারছি না যেন।'

'আমরা বেরুচ্চি এখন। তা আপনি স্বচ্ছন্দে আরাম করে থাকতে পারেন। বুঝলেন? কোনো আপত্তি নেই,' বলতে-বলতে নিজেই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলেন চোপ।

ক্রিস্তফোরিদিকে সঙ্গে নিয়ে গাবুনিয়া আর চোপ চলে গেলেন। আর নেভ্স্কায়া ঢুকল গিয়ে পাশের ঘরে, যেখানে বাচ্চা মেয়ে তার অকাতরে ঘুমুচ্ছে। ক্লান্তভাবে একখানা কৌচে নিজেও শরীর এলিয়ে দিল সে।

এই সময়ে সিওমা ঘুম ভেঙে জেগে উঠল হঠাৎ। হাই তুলে, টুপিটা মাথার ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে ইংরেজিতে বলে উঠল সে:

'লেডিজ অ্যান্ড জেন্ট্ল্মেন, দ্য শো গোজ অন!' (ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, খেলা জমে উঠেছে!)

বলেই চারপাশে তাকাল। দেখল, ঘরে কেউ কোথাও নেই। তবে পাশের ঘরে ঘুমন্ত স্ত্রীলোকটি আর তার বাচ্চার একটানা নিশ্বাসের শব্দ কানে এল। পা টিপে-টিপে রান্নাঘরে ঢুকে এককোণে-রাখা একগাছা ঝাঁটা তুলে নিল সে, তারপর মেঝে ঝাঁট দিতে শুরু করল। আর থেকে-থেকে ঝাঁটাগাছটা হাওয়ায় দুলিয়ে আর নয়তো স্টিমারের স্ক্রু-মাস্তুলের মতো করে সেটাকে এক-চক্কর ঘুরিয়ে ফিস্ফিস করে বলতে লাগল:

'লেডিজ অ্যান্ড জেন্ট্ল্মেন, দ্য শো গোজ অন!'

শিকারি গ্লুলিয়া

মানুষ যখন একা অরণ্যে সেঁধোয়,
তখন অগ্নিকুণ্ডের পাশে তাকে সঙ্গ
দেয় নির্জনতা।

—ন. তিখনোভ

বিষণ্ন মনমরা শিকারি গ্লুলিয়া নিজের তৈরি অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে পোষা কুকুরটার সঙ্গে কথা বলছিল। ম্যালেরিয়ার পালাজ্বর আসব-আসব করছিল কুকুরটার। শুয়ে-শুয়ে কাঁপছিল সেটা, দাঁতের পাটির ফাঁকে জিভের ডগাটা বেরিয়ে পড়েছিল। হলদে-হলদে চোখ মেলে মনিবের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল কুকুরটা।

ওদের চারপাশে ঘিরে ছিল ঘন জঙ্গল। দিন শেষ হয়ে আসছিল, আর সন্ধের আগে যে-অদ্ভুত একটা নৈঃশব্দ্য নেমে আসে এসব জায়গায় কুকুরটার কানে তা-ই ঝিঁ-ঝিঁ'র আওয়াজ তুলে বাজছিল। তার মনে হচ্ছিল, মশার পাল ছেঁকে ধরেছে তাকে আর সে-কারণে কেমন যেন স্নায়বিক আক্ষেপে থেকে-থেকে কানদুটো নাড়াচ্ছিল কুকুরটা।

নারিওনালি হ্রদের নির্জন পাড়গুলো ঢেকে ছিল ঝোপঝাড়ের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে। অ্যাল্‌ডার-গাছের সেই জঙ্গলে এখানে-ওখানে কালোরঙের হর্নবীম বা কোঁকড়ানো তুঁতফলের গাছ এক-আধটা মাথা জাগিয়ে উঠেছিল। আর ছিল লম্বা-লম্বা কাঁটাওয়ালা হলদে-হয়ে-আসা লিয়ানালতার ঝাড়, মোরগের পায়ের পেছনদিককার নখের মতো। আর এইসব গাছের নিচে গভীর ছায়ায় বিছুটির মতোই অজস্র জন্মেছিল দুর্গন্ধওয়ালা ফার্নগাছ।

'তোর কাছে আমি ক্ষ্যামা চাই,' পোষা কুকুরটাকে বলছিল

গ্নলিয়া, 'তবে আমি কিন্তু সৎ শিকারি, আমি মেনশেভিক না।'

আর কুকুরটা যেন সায় দিয়েই ল্যাজ নাড়ল।

'ওই ছোঁড়া মাতব্বরটারে যদি আমি উচিত সাজা না দিই তাইলে গোটা দ্নিয়া আমার গায়ে যেন থ্নক দেয়,' রাগে হিংসেয় জ্বলেপ্নড়ে বলে চলল গ্নলিয়া। 'এঃ, বলে কী— এট্রা নোংরা মার্কিন ইঁদ্নরের জন্যে আমারে নাকি দশ র্নব্‌ল জরিমানা দিতে নাগবে! ইঁদ্নরের গভ্‌ভে ঢালতে হবে নাকি দশ-দশটা র্নব্‌ল! ছোঁড়া আবার আদালতে বলল, 'তুমি চুরি করে শিকার করেচ। জন্তুটারে অনেয্যভাবে চুরি করে মেরেচ তুমি।' ছোঁড়া আমারে গাল পাড়ল, বলল কিনা 'চোর-শিকারি'। তা, দোস্ত্, চুরি করা—সেটা আবার কী? জজসায়েব ব্নইঝে দেলেন, 'চুরি করে শিকার করার অথ্ নিষিদ্ধ পেরানি শিকার করা।' তা, চুরি করে শিকার করার অথ্ আমি লিজেই ভালো জানি। কিন্তু ভানো-ছোঁড়া বলে কী, আমার নাকি একশত র্নব্‌ল জরিমানা আর দ্ন'হপ্তার মেয়াদ খাটা উচিত।'

বলতে-বলতে ঘেন্নায় একদলা থ্নতু ফেলল গ্নলিয়া।

'ল্যাজায় এক-চিলতে রোঁয়া নাই এমন এট্রা দ্নগ্গন্ধ ইঁদ্নরের জন্যে নাকি দ্ন'হপ্তার মেয়াদ! শ্ননে আমি-যে-আমি, সে-ই আদালতের মধ্যে হেসে খ্নন হলাম। এমন চিচ্‌কার দে হাসলাম যে জজসায়েব পর্যন্ত চোখ তুলে তাইক্যে রলেন, তাপ্পরে মিলিশিয়ার নোক গ্রিশারে কলেন, 'নোকটার হল কী? তুমি কি ওরে মাতাল অবস্তায় আদালতে এনেচ নাকি?' তা, শ্ননে গ্রিশা বলল, 'নোকটা হাসি চাপতে লারচে। মনে ভাবচে, ও আদালতে নাই, রেতের লাচগানের আস্তানায় এয়েচে।'

বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল গ্ন্লিয়া।

'তা জজসায়েব কলেন, 'মার্কিন ম্ন্ল্ন্কের লদী রিও নেগ্রোর বাসিন্দে পেরানিটারে যখন গ্ন্লি করে মেরেচ তখন এয়া মোট্টেও হাসির ব্যাপার না, ব্ন্য়েচ? এয়ার দাম কত তা জানো তুমি? এয়ার এট্টা-এট্টার দাম নগদা একশত ডলার করে, তার অত্থ, দ্ন্ই শত সোনার র্ন্ব্ল। এয়া মিথ্যে কথা না, লিজের গভ্ভধারিণী মায়ের কাছে যেমন সত্যি বলি, এয়া তেমনি সত্যি কথা। তুমি কিছ্ন্ই জানো না, বিলকুল ম্ন্র্ন্খ্ন্য-স্ন্র্ন্খ্ন্য মান্ন্ষ, গ্ন্লিয়া।'

'তা, আমি কলাম, 'আমারে মাপ করে দেন, বাব্ন্সায়েব। ন্যাকাপড়া আমি শিখি নাই—এয়া খাঁটি কথা। তবে স্ন্প্সা আর হোপির মধ্যিকার তল্লাটে আমি কিন্তু সবসেরা শিকারি, তা বলে রাখচি, হ্যাঁ। আপনেদের মধ্যি এমন কে আচে যে নিশ্ন্ত্ রাত্তিরে নেদোয়ার্দ খালে গে জ্যান্ত ফিরে আসতে পারে? এমন নোক একজনাও নাই! কে জানে আপনেদের মধ্যি কোন-কোন লদীর জলের রঙ কালো আর কোন-কোন লদীর জলের রঙ নাল? আপনেদের মধ্যি এমন কে আচে যে হর্গায় গে ব্ন্নো শোর গ্ন্লি করে মারতে পারে, কি বিড়ালের নখের আঁচড়ে চোখের দফা নিকেশ না-করে জ্যান্ত বনবিড়াল ধরতে পারে? কেউ নাই, একজনাও নাই! কিন্তু জলের সাপ কি মিঠে জলের মাছ যেখেনে-যেখেনে যেতে পারে গ্ন্লিয়াও যেতে পারে সেখেনে। কাজেই যা বলবেন, হ্ন্শিয়ার হয়ে বলেন!'

'এবার কথার মধ্যি মাথা গলাল ভানো, আর যেন একখান ছ্ন্রি চাইল্যে আমার কলজেটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেল। বলল, 'নাভের কারবার কিনা তাই দেখচি স্ন্প্সা আর হোপির মধ্যির তল্লাটে তুমি সেরা শিকারি বনে গেচ। আমি

কিন্তু চাই সোভিয়েত রাষ্ট্রকে নিয়ে কারবার যেখেনে সেইখেনে তুমি সেরা শিকারী বনে যাও।'

'তা, সেই দুধের ছ্যানাটারে আর কী বলতে পারতাম? আমি শুধু চিচ্কার দে বললাম, 'ওরে হতভাগা গাধা, চুপ যা দিনি, চুপ যা!' ছোঁড়াটারে আচ্ছা করে ঘা-কতক দেয়ার জন্যে আমি নাফ দে ওঠলাম, কিন্তু মিলিশিয়ার নোকটা পাকড়ে ধরল আমারে। বলল, আদালতের মধ্যি নাকি নড়াই করার নিয়ম নাই। নড়াই করতে হলে বাজারখোলায় চলে যাও!

'তাপ্পর সবাই মিলে আমারে গাল পাড়তে আর চ্যাঁচাতে নাগল। আমারে মাসখানেক কয়েদ করে রাখতে তৈরি ছেল ওয়ারা। এমন সময় গাবুনিয়া—ওই-যে সোন্দরপানা ইঞ্জিনিয়ার-ছোঁড়া, সাম্গ্রেদি-র বুড়া ইঞ্জিন-ডেরাইভার গাবুনিয়ার ছেলে—সে এসে ঢোকল, আর আদালতে কী-একখান বক্তিতেই-না দেল ছোঁড়া।...'

বলতে-বলতে চুপ করে গেল গুলিয়া। গাবুনিয়ার সেই আহামরি বক্তৃতাটা মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। নাছোড়বান্দা মশার মতো গাবুনিয়ার কথাগুলো ওর স্মৃতির আনাচেকানাচে গুন্গুনিয়ে ফিরতে লাগল, কিন্তু গুলিয়া কিছুতেই তা পাকড়াও করতে পারছিল না। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ও বন্দুকটা হাতে তুলে নিল।

'যাই হোক, যা বলবার ছোঁড়া খুব কষে বলেছেল! হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে যেন বলেছেল, 'আপনাদের মাথা খাইট্যে কাজ করা উচিত। জলাগুলা থেকে জলনিকাশ করচি আমি, আর অল্প ক'দিনের মধ্যিই ওই মার্কিনী ইঁদুরগুলার বাঁচবার মতন আর কোনো জায়গা থাকবে নি, সবক'টা মরে ফৌত হয়ে

যাবে-নে শিগগিরই। কাজেই আপনেরা এই বেচারা নোকটারে নিয়ে পড়েছেন কেনে? বিচের যদি করতেই নাগে তো আমার বিচের করেন!' গাব্‌নিয়া, বলশেভিক-ছোঁড়া, ঠিক এই কথাগুলোই শুইন্যে দেল—আহা, ছোঁড়া একশত বচ্ছর পরমায়ু নে বেঁচেবত্তে থাকুক। ছোঁড়া আরও বলে কী, 'পার্টি যখন কয়েচে নোকজনারে শিক্ষে দিতে, তখন দন্ড দে নাভটা কী? ওরে আমার হাতে ছেড়ে দ্যান কেনে? আমি ওরে উচিতমতো কাজে নাগাব-নে।' সত্যি, গাব্‌নিয়া না-এসে পড়লে বাজারের ছিঁচ্‌কে চোরদের মতন আমারেও জেলে পচে মরতে হোত এতক্ষণ। ...চল্‌, রে, দোস্ত, যাওয়া যাক।'

কুকুরটা ধীরেসুস্থে উঠে হেলেদুলে মনিবের পিছু-পিছু চলল। পকেট থেকে পরিষ্কার ভাঁজ-করা একখানা কাগজ টেনে বার করে তার ভাঁজ খুলল গুলিয়া, তারপর আলোর দিকে উঁচু করে মেলে ধরল। ও যদি লেখাপড়া জানত তাহলে পড়তে পারত যে কাগজখানায় লেখা আছে:

'ভূ-সংস্থানের বিবরণ-সংগ্রাহক আবাশিদ্‌জের জন্যে। পত্রবাহক গুলিয়া একজন শিকারি। কলখিদার জলা-জঙ্গলে এই লোকটির চেয়ে ভালো পথ-প্রদর্শক আর নেই। সবচেয়ে দুর্গম অঞ্চলগুলিও গুলিয়ার নখদর্পণে। কেন্দ্রীয় জলা ও জঙ্গল-এলাকাগুলির মানচিত্র রচনায় এর সাহায্য অমূল্য বলে গণ্য করতে পারবেন আশা করি।—প্রধান খাল-খননের ভারপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়র গাব্‌নিয়া।'

কাগজখানা ফের পকেটে পুরে জোরে-জোরে পা ফেলে জঙ্গলে ঢুকল গুলিয়া। রোমান দুর্গটার ধ্বংসস্তূপের দিকে

যাচ্ছিল সে। দুর্গটার ধসে-পড়া দেয়ালগুলোর অর্ধেকটাই আশপাশের জলা গ্রাস করে নিয়েছে, দেয়ালগুলোয় গজিয়ে উঠেছে জলজ আগাছা। জায়গাটা বুনো শুয়োর শিকারের পক্ষে প্রশস্ত।

আদালতে গুলিয়ার জবানবন্দীর কথাগুলো ছিল খাঁটি। জঙ্গল-এলাকা ওর মতো এত ভালো করে আর কেউ চেনে না। কিন্তু কী করে যে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে হয় সেটাই ওর জানা নেই। দিনরাত্তির অনবরত শিকারের পিছু-পিছু ঘুরে বেড়িয়ে আর খোলা আকাশের নিচে জ্বলন্ত ধোঁয়ানো অগ্নিকুণ্ডের পাশে ঘুমিয়ে, জলা-এলাকায় নাকানিচোবানি খেয়ে ঘুরে বেড়িয়ে আর ওত্-পেতে-থাকা শেয়ালদের তীক্ষ্ন শিস দিয়ে তাড়িয়ে-তাড়িয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলার কায়দাটাই ভুলে বসে আছে ও। প্রাণ খুলে কথা ও একমাত্র নিজের সঙ্গেই বলতে পারে, আর নয়তো বলতে পারে পোষা কুকুরটার সঙ্গে।

গুলিয়ার স্ত্রী মারা গেছে বছর-কুড়ি আগে। ছেলেপিলে হয় নি ওদের। স্ত্রী বেঁচে থাকতে — তার মানে সেই বিপ্লবের আগে — ও জমি-জিরেত আবাদ করত। আর তখন আর-সকলের মতো ও-ও নদীর কাদা ঢেলে দিত নিজের জমির ওপর আর সেই কাদা কাজ করত সারের। জলাজমিতে ও রুইত ভুট্টার চারা। আর তারপর, নদীগুলো বানের জলে পাড় ভাসিয়ে নিলে শতচ্ছিদ্র নিজের নৌকোখানায় চেপে ও চলে যেত জলে-ভাসা ভুট্টাখেতের ফসল কাটতে, যেমন হ্রদের জলে লোকে শরবন কাটে, তেমনিভাবে।

শুকনো ডাঙাজমির বড়ই অভাব ছিল দেশে। ছোট্ট একটা ভিটেঘরের মাপের একটুকরো ডাঙাজমির অধিকার নিয়ে

গোটা বারো বছর ধরে এক পড়শির সঙ্গে গুলিয়া তখন আদালতে মামলা চালিয়েছিল।

জীবন চলত তখন খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে, ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার অন্ত ছিল না। প্রতি বছর নতুন-নতুন ট্যাক্সের বোঝা চাপত, আর তার ভয়ে আধমরা হয়ে থাকত মানুষগুলো। প্রত্যেক বছর অল্প-বিস্তর গাঁয়ের লোক জ্বরে ভুগে মারা পড়ত আর গোরু-মোষ পটল তুলত অজস্র। আর প্রতি বছর সব্বোনাশা পাহাড়গুলো থেকে বরফ-গলা ঠাণ্ডা জলের বান নেমে এসে ওদের বিচ্ছিন্ন গাঁখানাকে দিত ডুবিয়ে। আর বিপ্লবের ঠিক আগেই একবছর গোটা গাঁকে গাঁ জ্বরে উজাড় হয়ে গেল। তবে এটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। তার জীবনে গুলিয়া নিজেই এমন সাতখানা গাঁ ফৌত হয়ে যাবার কথা স্মরণ করতে পারে।

ওদের গাঁয়ে সে-বছর প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল মাত্র দু'জন— গুলিয়া নিজে আর আর্তেম কর্‌কিয়া। গাঁয়ের বাড়ি-বাড়ি পোড়ো বার-বারান্দার বেড়ার গায়ে শোকের চিহ্নস্বরূপ কালো একটুকরো করে ন্যাকড়া বেঁধে দিয়ে ওরা দু'জন সেবার পোতি শহরে চলে আসে।

গাঁয়ের কুকুরগুলোও গাঁ ছেড়ে সরে পড়ে এদিক-ওদিক। তাদের কিছু-কিছু জলা-জঙ্গলে চলে গিয়ে বুনো হয়ে যায়, আর বাকিরা পোতি আর সেনাকি শহরের বাজার-অঞ্চলে চলে এসে ভিক্ষেসিক্ষে করে পেট চালাতে থাকে। গুলিয়া এইরকম একটা গাঁয়ের কুকুর যোগাড় করে নিয়ে আর দুখানওয়ালার কাছ থেকে একটা বন্দুক ভাড়া করে শিকারি বনে গেল।

এর পর থেকে শহর ছেড়ে সব সময়েই সে ঘুরে বেড়াত জলা-জঙ্গলে আর এরই ফাঁকে জীবনও কখন তাকে পাশ

কাটিয়ে এগিয়ে গেল। অন্য লোকে দলে-দলে যোগ দিল নানা যৌথখামারে। রিওন নদীর ওপর গড়ে উঠল একটা বিদ্যুৎকেন্দ্র। কিন্তু বাদা-অঞ্চল তখনও যে-পতিত সেই পতিতই রয়ে গেল, রয়ে গেল আলো-হাওয়াশূন্য হয়ে, আর বিশ-তিরিশ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে প্রতিটি গর্ত, প্রতিটি খানাখন্দ ডুবে রইল বদ্ধ জলে।

তারপর একদিন এল এঞ্জিনিয়ররা, এল মজুররা, আর এল যতসব মাটিকাটাই-যন্তর। আর গুলিয়া বুঝল যে বাদা-অঞ্চলের দিন ফুরিয়েছে। বাদার জমি ভরাট করে সেখানে নাকি কমলালেবু আর পাতিলেবুর বাগান বসবে, আর সেই নতুন জায়গার নামও হবে নতুনতরো: না, মিন্‌গ্রেলিয়া নাম আর থাকবে না, হবে কলখিদা।

তা, মুখ্যু মানুষকে নিয়ে একটু মজা করার লোভ কে-ই বা ছাড়তে পারে? এমন কি আর্তেম কর্‌কিয়াও গুলিয়ার পেছনে লাগতে ছাড়ল না। বলল, 'বুইলি, কলখিদা হল গে এক যৌথখামার যেখেনে মেয়েনোকেই সব কামকাজ করবে আর ব্যাটাছেলেদিগে দিবে ভাইগ্যে—বিশেষ করে তোর মতন অপদাত্থ কুঁড়ের বাদশাদিগে তো বটেই। গোটা সোভিয়েত মুলুকে আমাদিগেরটাই হবে গে পের্‌থম কলখিদা।' গুলিয়া ওর কথায় বিশ্বাস করে প্রথমটায় তো ভারি দুশ্চিন্তাতেই পড়ে গিয়েছিল। তা, ওয়ার কথায় অবিশ্বেস করা যায় কেমন করে, তাই বল?—একে বুড়া মানুষ, তায় আবার যে কিনা ছোঁড়া-বয়েসে এক-চুমুকে আধ-কলসি মদ সাবাড় করে দিত বলে নাম কিনেচে, তারে?

যখন গুলিয়া জানতে পারল কর্‌কিয়া ওকে বোকা বানিয়েছে তখন একবার ওর ইচ্ছে হল যে সোজা গিয়ে

মুখের ওপর কর্কিয়াকে হাঁদা বলে গাল দেয়। তবে শেষ পর্যন্ত ভেবেচিন্তে এমন কাজ সে করল না, কারণ যতই যাই হোক কর্কিয়া তার চেয়ে বয়েসে দশ বছরের বড়।

বাদা ঠেঙিয়ে পোড়ো দুর্গটার দিকে এগুতে-এগুতে গুলিয়া আপনমনে ভাবল, 'আচ্ছা, এই জলা-অঞ্চলের জলনিকেশের কাজ সারা হয়ে গেলে কোন চুলায় যাব আমি?' কিন্তু তারপরই ওর মনে পড়ল গাবুনিয়ার দেয়া চিঠিখানার কথা, আর ঠিক করল যে-করেই হোক একটা বুনো শুয়োর শিকার করে ছোকরা এঞ্জিনিয়রকে সেটা উপহার দিতে হবে। গুলিয়ার সহজ সরল জীবননীতির মূল কথা ছিল— রক্তের বদ্লা রক্ত, আঘাতের বদ্লা আঘাত, সাহায্যের বদ্লা সাহায্য।

গত দু'দিন ধরে ও এখন জঙ্গলে ঘুরছে। অদ্ভুত-অদ্ভুত সব ব্যাপার ওকে ঘিরে ধরছে দু'দিন ধরে, কিন্তু সেদিকে নজর দিচ্ছে না ও। ওর কাছে জঙ্গলের সব রহস্যের মোহ নষ্ট হয়ে গেছে।

রিওন, ত্সিভা আর হোপি নদীর ছুটন্ত ঘোলা জলের রহস্য ওর ভালো করেই চেনা। বেশ কয়েক শো বছর ধরে গড়ে-ওঠা পলিপড়া উঁচু-হয়ে-ওঠা খাতের ওপর দিয়ে বয়ে নদীগুলো সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। আশপাশের নাবাল জমির চেয়ে নদীগুলোর খাত বেশি উঁচু, আর যখন তাদের জল ফুলে-ফেঁপে ওঠে (শুধুমাত্র রিওন নদীতেই বছরে শ'-দেড়েক বারেরও বেশি ঢল নামে) তখন দু'কূল ছাপিয়ে ওঠে তারা আর তারপর গোটা জঙ্গল-এলাকা ভাসিয়ে দেশটাকে বিশাল একটা কাদাগোলা জলের হ্রদ বানিয়ে তোলে।

মাঝে-মাঝে গুলিয়া অবাক হয়ে ভাবে, 'আচ্ছা, নদীগুলো বাদার থেকে এমন উঁচু হয়ে ওঠল কেমন করে? মনে লেয়

যেন ওয়াদের খাতগুলো মানুষের হাতে-গড়া।' গাবুনিয়ার আঁকা দেশটার আড়াআড়িভাবে-কাটা মানচিত্র দেখেও ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারে নি ও। অথচ ওই রিলিফ ম্যাপে কিন্তু পরিষ্কার দেখানো ছিল যে কলখিদার প্রধান নদীগুলো উঁচু বাঁধের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে আর সেই বাঁধগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে আছে 'তাল্‌ভেগি' বা প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড নাবাল জমি, যেখানে রিওন আর হোপি নদীর বাড়তি জল উপচে পড়ে।

কিন্তু বাদা-অঞ্চলের সমস্ত নদীই কি রিওন আর হোপির মতো পাগলা? গুলিয়া এমন ডজনকয়েক ছোট-ছোট নদীর কথা জানে যেগুলোয় স্রোতের টান নেই বললেই হয়—স্বচ্ছ, ঘুমন্ত জলের ধারা যেগুলো, চলছে না বলেই মনে হয় যাদের। তীর থেকে তাদের জলের ওপর ঝুঁকে থাকে ঘন ঝোপঝাড়। গুলিয়া যখন এই ধরনের সব নদীতে নৌকো বেয়ে চলাচল করেছে তখন আলো-ঝলমলে বিকেলগুলোও কখনও-কখনও ওর কাছে আলো-আঁধারিতে ভরা ঝাপসা গোধূলির মতো ঠেকেছে, কারণ নদীগুলোর দুই পাড়ের গাছের মাথা পরস্পর জড়াজড়ি করে জলের ওপর পাতো আর ডালপালার পুরু একটা চাঁদোয়া তৈরি করে রেখেছে। এইসব নদীর জলের উৎস পাহাড়ি ঢল নয়, বাদার জঙ্গল থেকেই জল সংগ্রহ করে এরা সেই জল ঢিমে-তেতালা চালে বয়ে নিয়ে যায় সমুদ্রে।

এই ছোট নদীগুলিকে এঞ্জিনিয়াররা বলে 'পরগাছা' আর 'ম্যালেরিয়া-রুগী'। পরগাছা বলে এইজন্যে যে এদের জল এদের নিজস্ব নয়, রিওন আর হোপির উপচে-পড়া জলই এদের সম্বল। আর ম্যালেরিয়া-রুগী বলে এই কারণে যে এদের স্রোত এত ধীরগতি যে জ্বরে শক্তি-সামর্থ্য ফুরিয়ে

গেছে এমন রুগী-মানুষের ঢিমে-তালে চলার সঙ্গে তার তুলনা চলে।

বাদার উষ্ণ জল আটকে রেখেছে সমুদ্র। কাগজের পাতের মতো সমতল জমি, আর সমুদ্রের উপরিতল থেকে জমির উচ্চতার মাত্রা কাগজের পাতের বেধের সমান বললে তবেই এই পার্থক্যের উচিত মাপটা যথার্থ বলা হয়। ছোট-ছোট নদীর সমুদ্রে জল ঢেলে দেয়ার মতো যথেষ্ট জোর নেই। সমুদ্রের ঢেউ সেই জল ঠেলে পেছনে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। আর তাই নদীগুলো অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাশ ফিরে সমুদ্রের তীর-বরাবর বইতে থাকে যতক্ষণ-না কোনো শান্ত খাঁড়ির সন্ধান পায়। আর ওই খাঁড়ি বেয়েই সেই জল অবশেষে সমুদ্রে গিয়ে মেশে।

সমুদ্রের ঝড়কে, বিশেষ করে বছরের দুই বিষুব-সংক্রান্তিতে সামুদ্রিক ঝড়কে গুলিয়া অসম্ভব অপছন্দ করে। সমুদ্র তখন এমন বীভৎসরকম গর্জন করতে থাকে যে এমন কি জঙ্গলের ভেতর থেকেও তা গুলিয়ার কানে যায়। ওর তখন মনে হয় যেন সমুদ্র পাড়ের বাধা ডিঙিয়ে ঝাঁপিয়ে এগিয়ে আসতে চাইছে আর অ্যাল্ডার-বনের ওপর কালো-কালো ঢেউয়ের বাড়ি মেরে গাছগুলোকে যেন চূর্ণ-চূর্ণ করে ভেঙে উপড়ে ফেলতে চাইছে। আর তখন জলে-ভাসা হতভাগা দেশটা জুড়ে চলতে থাকে একটানা প্রচণ্ড বৃষ্টি।

এইসব ঝড়ঝাপটা থামলে পর আসে বান। ঝোড়ো সমুদ্রের ঢেউ বালির পাহাড় জড় করে সবক'টা নদীর মুখ বন্ধ করে দেয়। আর ছোট-ছোট যতসব নদী এই বাধার পাহাড় ভাঙতে না-পেরে আটকে পড়ে, তারপর ভাসিয়ে দেয় আশপাশের জমি-জায়গা।

এই ধরনের বন্যা ততক্ষণ চলতে থাকে যতক্ষণ-না নদীর জল যথেষ্ট উঁচু হয়ে উঠে সমুদ্রের জড়-করা বালির বাঁধের মাথা ছাপিয়ে ওঠে, যতক্ষণ-না নদীর জল বালি ধুইয়ে সরিয়ে সমুদ্রে গিয়ে মেশে আর পাড় থেকে দশ-বিশ মাইল পর্যন্ত সমুদ্রের জল কাদায় আর ময়লা আবর্জনায় মাখামাখি করে রাখে।

একেকবারের বন্যার পর গোটা তল্লাটটা দেখতে লাগে যেন কালচে-পাঁশুটে কোনো রঙ দিয়ে কেউ তা ছুপিয়ে দিয়েছে। এখানকার সবক'টা গাছগাছড়া, লিয়ানালতার ঝাড় আর ঘরদোর তখন মাখামাখি হয়ে থাকে মোটা এক-পরত চটচটে মাটির আস্তরণে। তবে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এই আস্তরণ শুকিয়ে খসে পড়ে।

এই বন্যা নিরোধের ব্যাপারে গুলিয়ার নিজস্ব একটা দাওয়াই জানা আছে। ও জানে, সবক'টা নদীর মুখ অ্যাল্‌ডার-গাছের ঘন জঙ্গলে এমনভাবে ছেয়ে আছে যে নদীর স্রোতের টান তাতে ভীষণভাবে ঝিমিয়ে পড়েছে। কাজেই নদীর স্রোতকে পথ করে দেয়ার জন্যে মোহানার এই ঝোপ-জঙ্গল কেটে সাফ করা দরকার। কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে এ-পর্যন্ত কেউই মাথা ঘামায় নি আর গুলিয়াও এ-বিষয়ে কাউকে কিছু বলে নি। কেউ ওর মতামত জানতেও চায় নি এ-ব্যাপারে। কেউ কিছু জিজ্ঞেসা করে নি পর্যন্ত। কেউ না! এমনই আহাম্মক লোকজন সব!

গুলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। গাবুনিয়াই একমাত্র লোক যে কোনোকিছু ব্যাপারে ওর মতামত জানতে চেয়েছে। আদালত-ঘরে গাবুনিয়া সেদিন ওকে শুধিয়েছিল যে গুলিয়া মাঝে-মাঝে একেকদল কর্মীকে বাদা-অঞ্চলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করতে পারে কিনা। তা, ও

বলেছিল—পারে বৈকি, নিশ্চয় পারে! আর তার পরই গাবুনিয়া ওকে এই চিরকুটখানা লিখে দিয়েছিল।

ফের একবার আদালতের কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় গুলিয়ার গালদুটো রাগে লাল হয়ে উঠল। না, ওই পুঁচকে কুত্তার ছানা ভানোর ওপর মোক্ষম শোধ তুলতে না-পারলে ওর চলবে না!

গুলিয়া যখন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে রোমান দুর্গের ধ্বংসাবশেষের কাছে এসে উপস্থিত হল তখন সন্ধে হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই দিয়ে বানানো দুর্গের পাঁচিলটা বেশ নিচু, মাটির নিচে অনেকখানি বসে গেছে তা। আর সেই পাঁচিলের ভেতরদিকে আছে নলখাগড়া আর হলুদ আইরিসঝোপে-ছাওয়া ছোট্ট একটা জলা।

পাঁচিলের ধারে আগুনের একটা কুণ্ড তৈরি করে গুলিয়া বসল, তারপর ঝোলা থেকে নোংরা এক-ড্যালা পনির বের করে তা-ই দিয়ে রাতের খাওয়া সারল। ওর মাথার ওপর চক্রাকারে চামচিকের দল উড়ে বেড়াতে লাগল, একেবারে বাঁধাধরা পথে এদিক-ওদিক করতে লাগল তারা অনবরত, যেন অদৃশ্য কতগুলো সুতোয় তারা ঝুলছে।

সঙ্গী কুকুরটা শুয়ে ছিল ওর পাশেই। আর কখনও-কখনও আচমকা মাথাটা তুলে দাঁত কড়মড় করে যেন মাছি তাড়াচ্ছে এমনভাবে উড়ন্ত চামচিকেগুলোকে কামড়াতে যাচ্ছিল।

ঝলমলে তারার সমুদ্রের নিচে রাতের অন্ধকার গোটা জঙ্গল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। মশার ঝাঁকের গুনগুনুনি গেল থেমে। বাদার মধ্যে কী-একটা প্রাণী যেন হঠাৎ নিশ্বাস ফেলল, তারপর কুলকুচোর শব্দ তুলল জলে। দূরের পাহাড়গুলোর মাথায় শেষ আলোর আভাসটুকুও দেখতে-দেখতে মিলিয়ে গেল।

আগুনের কুণ্ড থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল, কাঠকুটো ফাটতে লাগল ফটফট করে। কুকুরটা ঘুমিয়ে পড়েছিল, আলগা চামড়ায় থেকে-থেকে টান ধরছিল তার। রাতটাকে আরেকটু সহনীয় করে তোলার জন্যে গুলিয়া গান ধরল। বুনো শুয়োরদের জল খাবার জায়গাটায় ভোর-ভোরই যেতে হবে তাকে।

হঠাৎ গান থেমে গেল। বন্দুকটার দিকে আস্তে-আস্তে হাত বাড়াল গুলিয়া, কুকুরটাকেও খোঁচা দিয়ে জাগাল। জঙ্গলে এত বছর ঘোরাঘুরি করার পর এই প্রথম ভয় পেয়েছে ও। রোদে-পোড়া বাদামি গালদুটোয় ওর হিমঘাম দেখা দিয়েছে। হাতদুটো অল্প-অল্প কাঁপছে।

দুর্গের পাঁচিলের ওধারে ছোট্ট ডোবাটার দিকে চোখদুটো ওর স্থির হয়ে আছে। আইরিসঝোপের মধ্যে তারার আবছা আলোয় অস্পষ্টভাবে ওর চোখে পড়ল মানুষের একটা উঁচনো হাত।

কুকুরটা গরগর করে উঠল। আর কী করছে তা না-ভেবেচিন্তেই গুলিয়া বন্দুকটা তাক করে গুলি ছুড়ল। সঙ্গে সঙ্গে উঁচনো হাতখানা থেকে একটা আঙুল গেল অদৃশ্য হয়ে। কুকুরটাও ডোবায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কাটা আঙুলটা মুখে করে ফিরে এল। তারপর গুলিয়ার পায়ের কাছে রাখল আঙুলটা। দেখা গেল, বেশ বড়সড় শাদারঙের আঙুলটা মেয়েদের আঙুলের মতোই সুঠাম আর কমনীয়। গুলিয়া হাত দিয়ে ছুঁল ওটা। ও হরি, আঙুলটা যে পাথরে গড়া!

এরপর গুলিয়া নিজে ডোবার জলে নামল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে জলের মধ্যে থেকে উঁচিয়ে-থাকা সেই আশ্চর্য ভৌতিক প্রত্যঙ্গটার দিকে তাকিয়ে রইল। হাতের কব্জির কাছটায় জড়িয়ে ছিল লিয়ানালতার একটা ডাঁটা, দেখতে

লাগছিল কালচে টানটান একটা শিরা যেন। গুলিয়া এবার হাতখানা নিজের হাতে ছুঁল। মার্বেল পাথরের ঠান্ডা ছোঁয়া ঠেকল হাতে।

হাঁটু গেড়ে বসে ছুরি দিয়ে জলার মাটি খুঁড়তে লাগল গুলিয়া। দেখতে-দেখতে পাঁকের নিচ থেকে একটি স্ত্রীলোকের মুখাবয়ব দেখা দিল: তার লম্বা টিকলো নাক আর অল্প-একটু ফাঁক-করা দুটো ঠোঁট। গুলিয়া একটা দেশলাই-কাঠি জ্বালল। পাথরের নারীমূর্তিটির মাথার চারপাশে জড়ানো ঘন চুলের মোটা-মোটা বিনুনির ওপর ছাতা পড়ে গেছে।

এক-টুকরো ন্যাকড়া ডোবার জলে ভিজিয়ে মূর্তিটার মাথা আর ঘাড় থেকে ছাতার পলস্তারা ঘসে-ঘসে তুলল গুলিয়া।

অন্ধকার আরও ঘন হয়ে উঠেছিল ইতিমধ্যে।

আগুনের জ্বলন্ত কুন্ডটা থেকে একখানা কাঠ তুলে এনে মূর্তিটার গায়ে আলো ফেলল গুলিয়া। চোখে পড়ল রোমান দেবীমূর্তির তকতকে একখানা মুখ মার্বেল পাথরের গোল-গোল অক্ষিগোলকের মধ্যে দিয়ে ড্যাবড্যাব করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। আগুনের আলোয় মুখখানা যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। মার্বেল পাথরের স্ত্রীলোকটি ওর দিকে তাকিয়ে হাসল বুঝি।

একটা মুখখিস্তি করে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল গুলিয়া। জঙ্গলটাকে আর মূর্তিটাকে, ন্যুট্রিয়া আর ভানো আহ্‌মেতেলিকে যা মুখে আসে তা-ই বলে গাল পাড়ল। বুঝল, ভাগ্য ওর সঙ্গে রসিকতা জুড়েছে। জঙ্গলও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে এতদিনের ঘাগু শিকারীকে। দ্যাখো কান্ড! ন্যুট্রিয়া শিকারের জন্যে দশ রুবল জরিমানা আর আদালতে একটা দুধের বাচ্চার কাছ থেকে অপমান সয়েও

ওর নিস্তার নেই, বুনো শুয়োরের বদলে এখন মিলল কিনা পাথরের একটা মেয়েছেলে!

শহুরে লোকগুলোর মাথায় এখন-যে কোন্ বদ-মতলবের ফিকির ঘুরবে তা শুধু শয়তানই জানে! মূর্তিটার আঙুলখানা গুলি করে উড়িয়ে দেয়ার জন্যে ওকে যদি ফের আদালতে টেনে-হিঁচড়ে হাজির করে, তাহলে? বললেই হল যে গুলিয়া আবার বে-আইনীভাবে শিকার করে বেড়াচ্ছে। আর স্বয়ং গুলিয়াই-যে এমন একটা কাজ করেছে এ-বিষয়েও কারও কোনো দ্বিমত হবে না। কারণ, আর কোনো মিন্‌গ্রেলীয়ের এমন দুঃসাহস হবে না যে এই পোড়ো দুর্গটার ধারে-কাছে ঘেঁষে।

মার্বেলের হাতটায় বুলেট সেঁধনোর গর্তে আঙুল বুলোয় গুলিয়া। রাগে আগুন হয়ে ও ঘামতে শুরু করেছে। শুকনো ডালপালা যোগাড় করে খ্যাপার মতো মূর্তিটার গায়ের ওপর ফেলতে লাগল ও, যতক্ষণ-না সেটা পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভোরের দিকে বৃষ্টি শুরু হল। গুলিয়ার আগুনের কুণ্ড হিস্‌হিস্ শব্দ তুলে দাপাতে লাগল। নিবু-নিবু আগুনের ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করতে লাগল গুলিয়ার।

ও উঠে দাঁড়াল। থুতু ফেলল। তারপর জলকাদা মাড়িয়ে চলল রিওন নদীর দিকে। জলে-ভেজা ওর ফেল্টের টুপি আর পশমি কামিজ থেকে কুকুরের গায়ের গন্ধ ছাড়ছিল। স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডায় পা-দুটো কনকন করছিল ওর।

বুনো শুয়োরের নামগন্ধ নেই। মনে হচ্ছে যত শয়তানের বংশ মাটিকাটা-যন্তর গোটা বাদা-অঞ্চল থেকেই শিকার-টিকার খেদিয়ে দিয়েছে।

সারা জঙ্গল নিঝুম নিস্তব্ধ। গুলিয়ার মনে হচ্ছে যেন

গাছগুলো সব ঘাড় ফিরিয়ে মহা উদ্বেগ নিয়ে ওকেই দেখছে। সব সময়ে যেমন হয় তেমনি সমুদ্রের দিক থেকে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো তেরছাভাবে এসে মুখে বিঁধছে। গুলিয়ার মুখে ঝাপটা মেরে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো জামার ফাঁক দিয়ে ওর বুক আর পিঠ গড়িয়ে নামতে লেগেছে। মনে হচ্ছে ম্যালেরিয়ার জ্বর আসছে।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে রিওনের ধারে এসে দাঁড়াল গুলিয়া। হাজার বছর আগে যেমন করত তেমনিভাবেই নচ্ছার নদীটা কাদাগোলা ঘোলা জল পাকিয়ে-পাকিয়ে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ঢালছে। নদী থেকে কয়েক ঢোক জল খেল গুলিয়া, তারপর থুতু ফেলল। বালি কিচ্‌কিচ্‌ করে উঠল দাঁতে। জলটা কেমন কষা আর টকটক ঠেকল ওর, খেয়ে তেষ্টা মিটল না।

ফুলে-ফেঁপে উঠে, পাড় ছাপাছাপি করে সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে নদী। ছোট-ছোট চড়াগুলোও নদীর সঙ্গে ভেসে চলেছে যেন। মাসখানেক আগে যে-চড়াটায় ও একটা রাত কাটিয়ে গেছে সেটার দিকে গুলিয়ার চোখ পড়ল। চড়াটা নদীর মোহানার দিকে শ'-খানেক পা সরে গেছে বলে মনে হল।

গোঙাতে-গোঙাতে আর কাঁপতে-কাঁপতে গুলিয়া গুঁড়ি মেরে সেঁধোল সেই ঝোপটার মধ্যে যেখানে নৌকোটা চোখের আড়ালে ও বেঁধে রেখেছিল।

একবারের তরেও পেছন ফিরে তাকাল না ও। একমাত্র নদীতে নৌকো ভাসিয়ে উঠে বসার পরই পেছনে তাকিয়ে জঙ্গলটার দিকে নিজের তামাটে হাড়-জিরজিরে হাতখানা মুঠি পাকিয়ে নাচাল। গালাগাল দেয়ারও আর ক্ষমতা ছিল না ওর। কেবল নীলচে ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল বার-কয়েক আর কথার বদলে গলা ঠেলে বেরোল ফোঁপানির আওয়াজ।

আর তখনই গুলিয়া বুঝল গাছগুলো কেন তখন অমন করে ওর দিকে ফিরে-ফিরে তাকিয়েছিল। ও চিরকালের মতো জঙ্গল ছেড়ে চলে যাচ্ছে বলে ওদের শেষ শিকারিকে ওরা দুঃখিতভাবে বিদায় জানাচ্ছিল, এইমাত্র।

কিংবা কে জানে, গাছগুলো সত্যিই হয়তো কিছু ফিরে তাকায় নি, হয়তো সবটাই ওর চোখের বিভ্রম—কিংবা জ্বর-বিকারের ঘোর? কিন্তু সে যা-ই হোক, কী এসে-যায় তাতে? ভেবে অসহিষ্ণু ভাবে কাঁধ-ঝাঁকানি দিল গুলিয়া।

এর ঘণ্টা-দুই বাদে ভূ-সংস্থানবিৎ আবাশিদ্‌জে দেখলেন চালাদিদি গ্রামে তাঁর বাড়ির কাছে একজন শিকারি মাটিতে শুয়ে আছে। জ্বরের সাংঘাতিক তাড়সে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে শিকারিটি। আর একটা মরকুটে-চেহারার কুকুর কাছে দাঁড়িয়ে তার গাল চেটে দিচ্ছে। আবাশিদ্‌জে কুকুরটাকে খেদিয়ে দিয়ে লোকটির কাছে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। আর গোঙাতে-গোঙাতেই লোকটি পকেট থেকে একখানা চিরকুট টেনে বের করে আবাশিদ্‌জের হাতে দিল।

চিরকুটখানা পড়বার পর আবাশিদ্‌জে বললেন, 'ঠিক আচে, গুলিয়া। আমরা তোমারে ভূ-সংস্থানবিৎ বানিয়ে নেব-নে। তবে এখন বাড়িতে এসে এট্টু শুয়ে পড় দিনি।'

গুলিয়া হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু ওর ঠোঁটদুটো ভেঙে দুমড়ে একটা যন্ত্রণার ভঙ্গি করল মাত্র। টলতে-টলতে উঠে দাঁড়িয়ে ও আবাশিদ্‌জের পিছু-পিছু একটা কাঠের বাড়িতে এসে ঢুকল। দেখল, বাড়িখানার সবক'টা দেয়াল জুড়ে নীলরঙের অসংখ্য ম্যাপ ঝুলছে।

রিওনের পলি

শহরের উপকণ্ঠে পালেওস্তোম। নামটা হল একটা হ্রদের, যার জল সবুজ আর সেই জল সর্বদাই কুয়াশার পাতলা চাদরে মোড়া। কুয়াশার ওপরে হ্রদের ধার ঘেঁষে চওড়া-চওড়া পাতার কালো ছাতা মেলে দাঁড়িয়ে আছে প্লেইন-গাছের বন, আর সারা দিন ধরে সমুদ্র-সারসরা হ্রদের ওপর ডিগবাজি খেয়ে-খেয়ে আর চিৎকার করে ডেকে-ডেকে ফিরছে।

পালেওস্তোমের ওপারে কল্‌মাটাজের জলনিকাশী-ব্যবস্থার কাছে পেঁছিনোর জন্যে নেভ্‌স্কায়া একখানা নৌকো ভাড়া করল।

নৌকোখানা জলনিকাশী-ব্যবস্থার কাছাকাছি এলে নদীর পাঁকের গন্ধ নাকে এল নেভ্‌স্কায়ার, স্লুস বা জলকপাটের মধ্যে দিয়ে কলকল করে জল যাবার শব্দও শুনতে পেল সে। উইলোগাছের চারা-গজানো নিচু পাঁক-জমানো বাঁধের ওধারে কলখিদার নতুন মাটি আস্তে-আস্তে মাথা জাগিয়ে উঠছে দেখা গেল।

এখানে বেড়াতে আসার পরিকল্পনাটা বহুদিন ধরে মনে-মনে এঁচে রাখার পর অবশেষে সেটাকে কাজে পরিণত করার মতো সময় পেয়ে নেভ্‌স্কায়া এখানে এসেছে। কল্‌মাটাজ বলতে সত্যিই কী বোঝায় সেটা পাখোমভের কাছ থেকে জানার জন্যে ও বদ্ধপরিকর।

মাঝিদের হ্রদের পাড়ে নৌকো ভেড়াতে বলল ও, তারপর হালকা চালে একলাফে বাঁধের ওপরে গিয়ে উঠল। গরম গুমোট হাওয়ায় রোদে-ঝলসানো হোগলাবনের গন্ধ নাকে লাগল ওর।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পাখোমভকে দেখতে পেয়ে ও তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে চলে এল। বৃদ্ধ কাছাকাছি একটা জলকপাটের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কাঠের-তৈরি নলগুলো দিয়ে নিচে যে-জল পড়ছিল তার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। একমাথা উস্কোখুস্কো শাদা চুলওয়ালা ছোটখাট মানুষটিকে সত্যিসত্যিই ম্যাজিকওয়ালা বলে ঠেকছিল।

লজ্জা-লজ্জা মুখ করে নেভ্স্কায়া হেসে বলল, 'আপনি কিন্তু অনেক আগেই আপনার কাজ সম্বন্ধে বলবেন বলে কথা দিয়েছিলেন।'

পাখোমভ কেমন যেন বিচলিত চোখ তুলে ওর দিকে তাকালেন। তারপর বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'জলটা আবার পরিষ্কার হয়ে পড়ছে। আচ্ছা শয়তানি কাজ-কারবারের ঝামেলায় পড়া গেছে যা হোক!'

নেভ্স্কায়া কিন্তু কিছুই বুঝল না। ও দেখল, পালেওস্তোমের পাশাপাশি ওর সামনে আরও একটা প্রকান্ড, অগভীর জলের হ্রদ। হ্রদটা চারিদিক থেকে ময়লা পাঁকের বাঁধ দিয়ে ঘেরা আর ঘন শরবনে ঢাকা। এই হ্রদ থেকে জল কাঠের জলকপাটগুলোর মধ্যে দিয়ে আস্তে-আস্তে বয়ে গিয়ে পালেওস্তোমে পড়ছে। এ-সবের মানে কী? জল পরিষ্কার হয়ে পড়ছে বলে পাখোমভই-বা এত বিচলিত হচ্ছেন কেন?

'দেখবেন, শেষে কিন্তু বিরক্তি বোধ করলে এই বুড়ো মানুষটাকে দুষবেন না যেন!' অসন্তুষ্টভাবে বিড়বিড় করে বললেন পাখোমভ। 'শুনুন বলি তাহলে। কলখিদা সম্বন্ধে সত্যিই কিছু জানে এমন লোক আছে কিনা সন্দেহ। এমন কি যারা বেশকিছু পড়াশুনো করেছে তাদের বেলাতেও কথাটা খাটে। অনেকে ভাবে জায়গাটা বুঝি গ্রীসের মধ্যে,

আর তারপর যখন জানতে পারে যে জায়গাটা আর কোথাও নয় সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেই তখন যেন আকাশ থেকে পড়ে। ভাবুন একবার, কী লজ্জার কথা! পুশকিনের একটা ব্যাপার আমার ভারি ভালো লাগে, সেটা এই যে তিনি অনেক কিছুর খবর রাখতেন। তাঁর সেই লাইনক'টা মনে পড়ে? সেই-যে লিখেছেন: 'একদিকে ফিন্‌দেশের হিমেল পাহাড় অপরদিকে কলখিদার অগ্নিবেলা'? কিন্তু থাক এ-সমস্ত কথা!' বলে বৃদ্ধ যেন হাত নেড়ে কথাগুলোকে সরাতে চাইলেন।

'আমাদের চারপাশে সমুদ্রের ধারের এই-যে সমতল দেশটা দেখছেন—এরই নাম কলখিদা। বয়েস এর খুবই কম, মাত্র দু'লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বছর। তার আগে এই জায়গাটার জমিটমি কিছুই ছিল না, ছিল সার্‌মাতীয় সাগরের একটা খাঁড়ি। এখানকার নদীগুলো পাহাড় থেকে রাশি-রাশি মাটি এনে সমুদ্রে ফেলে, বিশেষ করে পাহাড়ের মাথায় বরফ গলার সময়। রিওন নদী তো প্রায় দু'শো কিলোমিটার পর্যন্ত সমুদ্রের জল কাদাগোলা করে ফেলে। প্রতি বছর এই নদী হাজার কোটি ঘন-মিটার উর্বর মাটি ধুয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে।

'পোতি থেকে সমুদ্র ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, প্রায় চোখে ধরা পড়ে এমনভাবে। প্রতি বছর সমুদ্রের পাড় ছ'মিটার করে এগিয়ে চলেছে। শহরের পার্কের ভেতর যে-পুরনো তুর্কী দুর্গটা আছে সেটা দেখেছেন তো? গত ষোলো শতকে সুলতান মুরাদ ওটা তৈরি করিয়েছিলেন। সে সময়ে দুর্গটা ছিল একেবারে সমুদ্রের ধারে। সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ত দুর্গের দেয়ালে। আর এখন? এখন সমুদ্রের ধার থেকে দুর্গ বেশ কিছুটা দূরে চলে গেছে।

'গোটা দেশটাই এখানে বাদা-অঞ্চল। কেন? না, প্রথম কথা, এখানকার জমিতে ঢাল নেই। আর তাছাড়া সারাক্ষণ বৃষ্টি আর নদীর বন্যা তো আছেই।

'দেশটা একখানা থালার মতো মসৃণ সমতল। এমন কি হুরিয়া পাহাড়ের ঠিক পায়ের কাছটাও সমুদ্রের পিঠ থেকে মাত্র মিটার-দুয়েক উঁচু। আর এ-জায়গাটা, যেমন ধরুন পোতি শহর, সমুদ্র থেকে এক মিটারেরও কম উঁচু। তার মানে, সত্যি বলতে কি, আমরা জলের ওপরই বাস করছি।

'এইসব জলাজমিই এখানকার উদ্ভিদ-জগতের বৈচিত্র্য নষ্ট করে দিয়েছে, উদ্ভিদ-জগৎকে করে তুলেছে সাংঘাতিকরকম একঘেয়ে। নিজেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন: শুধু অ্যাল্ডার আর অ্যাল্ডার! ধুত্তোর ছাই, অ্যাল্ডার ছাড়া গাছের বংশ নেই এদেশে! এছাড়া থাকার মধ্যে আছে অল্প কিছু হর্নবীম আর বীচগাছের ঝাড়। দূরে, দিগন্ত জুড়ে যদি ওই পাহাড়ের সারি না-থাকত তাহলে এই কলখিদা অঞ্চল থেকে পিন্স্ক-এর চারপাশে যে বাদা-অঞ্চল আছে তার মধ্যে কোনো তারতম্য করা যেত না। তা-ই বা বলি কেন, জানেন এখানকার এই জলাগুলোয় জলজ আশশ্যাওড়া পর্যন্ত জন্মায়। সত্যি, সেই একই আশশ্যাওড়া যা নাকি উত্তরমেরু-অঞ্চলের তুন্দ্রায় পাওয়া যায়। আর লোকে সোহাগ করে বলে কিনা এ-জায়গাটা নাকি গ্রীষ্মমণ্ডলের মতো!

'কিন্তু এখানকার গাছপালায় বৈচিত্র্যের এতখানি অভাব কেন? আপনি নিজেই তো উদ্ভিদবিজ্ঞানী। নিশ্চয় আপনি আমার চেয়ে ভালো করেই জানেন গাছের গোড়ায় কমপক্ষে মিটারখানেক আন্দাজ শুকনো জমি থাকা দরকার। কিন্তু গোটা অঞ্চলটাই যখন জলে সপসপ করছে তখন এই মিটারখানেক শুকনো মাটি মিলবে কোত্থেকে? তাই জলার

আগাছা আর আজেবাজে গাছ ছাড়া কিচ্ছুটি জন্মায় না এ-তল্লাটে।

'কলখিদা অঞ্চলের আবহাওয়া হল দক্ষিণ জাপান কিংবা সুমাত্রার মতো। গরমি এখানে খুব। তবু কিন্তু এ-জায়গাটা ম্যালেরিয়ায় উজাড়-হয়ে-যাওয়া মরুভূমির মতো। কথাটা একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি। অনেকটা সেই গ্রীষ্মমন্ডলের নব-ক্যালিডোনিয়ার ফৌজদারি সাজা-পাওয়া বন্দীদের কলোনির মতো। এখানকার এই জলাগুলো না-থাকলে আমরা অনায়াসে জাভা কিংবা সিংহলকে হারিয়ে দিতে পারতাম, তা সে যতই উর্বর হোক আর ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি থাক-না কেন সে-সব দেশে। কাজেই আর কী করা? বাদাগুলোর জল সেচে ফেলা দরকার।

'তাহলে ব্যাপারটা চমৎকার! আর ঠিক এই কাজটাই করছি আমরা এখানে। ওই পাহাড়গুলোর কাছে—যেমন ধরা যাক, চালাদিদিতে, যেখানে গাবুনিয়া কাজ করছে—সেখানে জমি অল্প-একটু ঢালু। আর তাই মামুলি খাল কেটে সেখানকার জলার জল নিকেশ করা সম্ভব। আবর্জনা, মাটি, এইসব দিয়ে বাঁধ বেঁধে বন্যার সময় সেখানে নদীগুলোকে বশে রাখাও যায়। এ-সবই একেবারে প্রথম ভাগের পাঠ। কিন্তু এ-সবই সম্ভব একমাত্তর গাবুনিয়ার অধীন ওই অংশটায়। এখানে অমনধারা ব্যবস্থা করা অসম্ভব। এখানে জমিতে ঢাল নেই বললেই চলে, আর খালগুলোও মাটির ওপরকার স্তর, অর্থাৎ বিশ সেন্টিমিটারটাক অপ্রয়োজনীয় কাদাজল, ছাড়া আর কিছুই নিকেশ করে না। অর্থাৎ কিনা, আমাদের জলনিকেশের অপর কোনো ব্যবস্থা খুঁজে বের করতে হয়। তা, সেই ব্যবস্থাটা কী? কী আবার, তা হল গিয়ে কল্‌মাটাজ...।'

এরপর আড়চোখে নেভ্‌স্কায়ার দিকে তাকাতে-তাকাতে কাগজে তামাক মুড়ে একটা সিগারেট পাকাতে লাগলেন পাখোমভ।

নেভ্‌স্কায়া দেখল পালেওস্তোমের পাড়ে এই জায়গাটা ভারি মনোরম। কুয়াশা আর সূর্যের আলোর লুকোচুরিতে চারিদিক রুপোলি, স্বচ্ছ সৌন্দর্যে ভরে উঠেছে। থেকে-থেকে ওর মুখে এসে চাপড় দিচ্ছে দুষ্টু কোলের ছেলের মতো হাওয়ার একেকটা দ্রুত, হালকা ঝলক।

'তা, কল্‌মাটাজ ব্যাপারটা কী?' পাখোমভ ফের শুরু করলেন। 'এটা হল, বাদাগুলোকে কাদাগোলা নদীর জল দিয়ে ভাসিয়ে তারপর সেগুলোর জল নিকেশ করা। এক ধরনের একটা কারিগরি বিদ্যের ধাঁধা বলতে পারেন এটাকে। কল্‌মাটাজের ব্যবস্থা জলাগুলোর জল নিকেশ করছে আবার সেইসঙ্গে নতুন পলিমাটির পুরু একটা স্তর গড়ে তুলছে। যেমন, আমার এখানেই ধরুন। আমরা এই বাদার চারপাশ ঘিরে বাঁধ দিয়েছি, ওদিকে রিওন নদী থেকে কতগুলো খাল কেটে এনেছি বাদা পর্যন্ত আর তৈরি করেছি ক'টা জলকপাট। রিওনের জল যতক্ষণ-না পুরোপুরি ঘোলা হয়ে উঠছে, পাতলা কাদার চেহারা নিচ্ছে জল, ততক্ষণ আমরা অপেক্ষা করেছি। তারপর স্ল্যুস-গেটগুলো খুলে দিলাম আমরা, আর রিওনের জল দিয়ে ভরে তুললাম বাদাটা। আবার বাদার অপরদিকে আরও একসার স্ল্যুস-গেট আমরা বানিয়েছিলাম, যাতে রিওনের জলের কাদা বাদায় থিতিয়ে যাবার পর বাদার বাড়তি জল পালেওস্তোমে ছেড়ে দেয়া যায়। ব্যাপারটা বেশ সরল, তাই নয় কি? পলি থিতিয়ে গেল যেই অমনি আমরা ওপরকার পরিষ্কার জলটা নিকেশ করে দিলাম। এরপর ফের একবার বাদাটা কাদাগোলা জলে ভরে

তুললাম, আবার পলি থিতিয়ে গেলে ফের জল নিকেশ করলাম। এইভাবেই ব্যাপারটা চলতে থাকবে আর-কি। মোটমাট, এই হল গিয়ে ব্যাপার। এইভাবে প্রায় বিনি-খরচায় বাদার জমিতে নতুন-নতুন মাটির স্তর জমে উঠতে থাকবে। আর এই নতুন পলির স্তর গড়ে না-উঠলে এ-তল্লাটে আধা-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গাছপালা গজিয়ে তোলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এখন এইসব বাদার জলের নিচে নতুন পীট আর গুঁড়ি-গুঁড়ি আগাছা ছাড়া কিচ্ছুটি থাকে না, আর এদের ওপর জন্মায় খালি অ্যাল্‌ডারগাছ। অথচ এই কল্‌মাটাজ-ব্যবস্থা চালু করতে পারলে চমৎকার মাটি পাওয়া যাবে। এখানকার পলির কাদা একেবারে ফাস্‌টো ক্লাস। একটা ডুমুরগাছের ডাল ভেঙে পুঁতে দিন এই মাটিতে, দেখবেন মাস-চারেকের মধ্যে তাতে ফল ধরতে শুরু করেছে।

'রিওন নদী নীল নদের চেয়ে দ্বিগুণ পলিমাটি বয়ে নিয়ে চলে। নীল নদকে চিরকাল দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ঘোলা জলের নদী বলে লেখালেখি হয়। কেন? না, তার প্রতি ঘন-মিটার জলে দেড় কিলোগ্রাম করে পলিমাটি পাওয়া যায়। অথচ রিওনের ওই পরিমাণ জলে পলিমাটি পাওয়া যায় তিন কিলোগ্রাম করে! নীল নদের জলে-ধোয়া দেশ মস্ত এক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল একদিন। কিন্তু কলখিদায় আমরা যে-উদ্ভিদ জগতের বোলবোলা গড়ে তুলতে চলেছি তা মিশরীরা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। ওদের পলিমাটিতে যে-পরিমাণ ফস্‌ফরাস আর নাইট্রোজেন আছে, আমাদের আছে তার দ্বিগুণ।

'বুঝলেন, এই হল গিয়ে ব্যাপার। আর বেশিকিছু আমার বলার নেই। গত পাঁচ বছরে আমরা দেড় মিটার পুরু

পলিমাটির একটা স্তর গড়ে তুলেছি। এ-জমি কাজে লাগবে কমলালেবু আর পাতিলেবু ফলানোর জন্যে।'

নেভ্স্কায়া বলল, 'কিন্তু খাল দিয়ে পরিষ্কার জল পালেওস্তোমে আসছে বলে আপনি কেন বিচলিত বোধ করছেন, তা আমি বুঝলুম না। এমনটাই হওয়া উচিত নয় কি? এর মানে তো সবটুকু পলিমাটি বাদায় থিতিয়ে যাচ্ছে।'

'আরে, গণ্ডগোল তো সেখানেই,' জবাব দিলেন পাখোমভ। 'জলের স্রোত আরও জোরালো হওয়ার দরকার ছিল, যাতে মাটির মোটা দানাগুলো থিতিয়ে যায় আর মিহি, ঝুরঝুরে দানাগুলো জলের সঙ্গে মিশে পালেওস্তোমে এসে পড়ে। মিহি দানার পলি খারাপ জিনিস। এতে মাটি ভারি হয়ে ওঠে।'

যদিও পাখোমভ কল্মাটাজ সম্পর্কে একেবারে মোদ্দা কথাগুলোই বুঝিয়েছিলেন, তবু তাঁর এই ব্যাখ্যা নেভ্স্কায়ার চোখে জগৎটাকে এমন সাগ্রহ বিস্ময়ে ভরিয়ে তুলল বলে মনে হল যে সে যেন চাইল সময় এখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাক।

উদ্ভিদবিজ্ঞানী নেভ্স্কায়া মানসিক শৃঙ্খলাবোধে নিজেকে সুশিক্ষিত করে তুলেছিল। তবু তার প্রকৃতিতে ছিল মনমাতানো সাধারণীকরণের দিকে প্রবল একটা ঝোঁক। কল্মাটাজ-ব্যবস্থাকে সে শুধু বাদার জলনিকাশের নিছক নতুন একটা পদ্ধতি হিসেবেই দেখল না, ব্যবস্থাটাকে আরও অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ বলে ঠেকল তার। এর মধ্যে সে দেখতে পেল প্রকৃতির ওপর মানুষের পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটাকে, দেশের ভূ-দৃশ্যের নতুন রূপসৃষ্টিকে।

পাখোমভের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নাবিষ্টভাবে হাসল সে। আর হাঁক পেড়ে নৌকোর মাঝিদের যখন ডাকল, তখন সেই ডাকের আওয়াজ বেজে উঠল স্পষ্ট রিন্‌রিন করে। তবু

সেই আওয়াজে তার চারপাশের উষ্ণ হ্রদের নৈঃশব্দ্য ভেঙে চুরচুর হল না। আর যখন সে চুপ করে গেল তখন সবার কানে এল মৌমাছিদের গুনগুনুনি।

পাখোমভ বললেন, 'আমাকে একটু শহরে পৌঁছে দিন দিকি। একটু বাড়ি যাওয়া দরকার আমার।'

নৌকো থেকে নামার পর পোতির শহরতলি ধরে অনেকক্ষণ হাঁটতে হল ওঁদের। সমুদ্রের ধার থেকে সংগ্রহ-করা পাথরের নুড়ি দিয়ে বাঁধানো এ-অঞ্চলের রাস্তাঘাট, আর সেই রাস্তায় ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছে গলায় গাছের চেরা ডালবাঁধা যতসব রোমশ শুয়োর। যাতে বেড়ার ফাঁক দিয়ে গলে সব্জি-বাগানে ঢুকতে না-পারে তার জন্যেই শুয়োরের গলায় এই চেরা ডাল বাঁধার ব্যবস্থা।

এমন সময় কে যেন ওঁদের ডাকল। দেখা গেল ডাকছেন কাখিয়ানি। রাস্তার পাশের একটা কাঠের বাড়ির বারান্দায় বসে আছেন তিনি, সামনে একপাঁজা নকশার প্রতিলিপি। আর ওঁর মা ব্যস্ত আছেন সব্জি-বাগানে। তাঁর মাথায় মুসলমানী কায়দায় কালো মসলিন কাপড়ের পরিপাটি বনেট, যা নাকি বিবাহিতা জর্জীয় মহিলাদের প্রথাসিদ্ধ মাথাঢাকার বস্ত্র।

শোনা গেল কাখিয়ানি চিৎকার করে ওঁদের বলছেন, 'আরে, দাঁড়ান, দাঁড়ান, কমরেডরা! একমিনিট একটু দাঁড়াবার ফুরসত নাই নাকি আপনাদের? এদিকে আজ আমি দারুণ একটা কথা শুনেচি, বুঝলেন? বুড়া শালিকোর ঘোড়ার গাড়িতে চেপে যখন জাহাজঘাটার দিকে যাচ্চি তখন বুড়া আমায় বললে কী জানেন? বললে: 'আমি কী ভাবতেচি জানেন, কমরেড কাখিয়ানি? ভাবতেচি, আজ থেকে দশ বছর বাদে ইস্টিমারগুলার পক্ষে রাত্তিরে আমাদের বন্দর খুঁজে বার

করার জন্যি আর সার্চলাইট দেখার দরকার করবে না। তারা নেবুর গন্ধ নাকে শুঁকেই জাহাজঘাটায় ঠিক এসে ভিড়তে পারবে!' বুঝলেন, কাব্যি, যেখানেই যান শুনবেন লোকে কাব্যি করচে! এর আর ছাড়ানছোড়ন নেই! এমন কি ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ানরাও কবি বনে যাচ্চে। যেদিকেই যান নতুন হাফিজ দেখতে পাবেন গন্ডা-গন্ডা!.. তা, আমার এখেনে একটু আসুন না দু'জনে?'

নেভ্স্কায়া এসে সব্জি-বাগানে ঢুকে কাখিয়ানির মায়ের সঙ্গী হল। কুয়ো থেকে বালতি করে জল তুলতে সে সাহায্য করল তাঁকে। বৃদ্ধা তখন কয়েক আঁটি প্রকাণ্ড সবুজ পেঁয়াজকলি জলে ধুচ্ছিলেন।

রসে-টইটুম্বুর শাদা পেঁয়াজগুলো শুঁকতে-শুঁকতে নেভ্স্কায়া বলল, 'কী চমৎকার পেঁয়াজ! মনে হচ্ছে খেতে খুব মিষ্টি হবে!'

শুনে বৃদ্ধা শুধু হাসলেন, কোনো উত্তর দিলেন না। রুশভাষা ভালো বলতে পারেন না উনি।

কাখিয়ানির বাড়ি থেকে বেরিয়ে নেভ্স্কায়া গেল এবার শহরের পরীক্ষামূলক বাগানগুলোয়। তারপর সেখান থেকে বাড়ির দিকে যখন রওনা দিল তখন গোধূলির আলোয় ভরে গেছে শহর, নেমে আসছে পোতির সেই মনোরম সন্ধে যখন মনে হয় শহরের আলোগুলো যেন শূন্যে নিরবলম্ব হয়ে ঝুলে আছে। গত দু'দিন বৃষ্টি হয় নি শহরে।

রাস্তাগুলোকে বাগানের ছায়াঢাকা পথের মতো লাগছিল। উঁচু খোঁটার মাথায়-বসানো কাঠের তৈরি বাড়িগুলো থেকে বাতিগুলো ঝকঝকে শাদা আলো ছড়াচ্ছিল। ছেঁড়া, চটকানো গোলাপের পাপড়িতে ছেয়ে ছিল ফুটপাথগুলো। ঘাড় উঁচু করে ভারি শিঙ্গুলো পেছনে হেলিয়ে দিয়ে মোষেরা পথে-

ছড়ানো গোলাপের শুকনো পাপড়ির ওপর দিয়ে ক্যাঁচকোঁচ শব্দে গাড়ি টেনে নিয়ে চলেছিল।

নীলাভ সন্ধে ঝুলে ছিল সমুদ্রের ওপর, ঝলমলিয়ে তুলেছিল তা বাড়িঘরের কাচের জানলা। আর যতসব ফলবাগানের ভেতর দিয়ে, আবছা অন্ধকারে-ভরা রাস্তার মোড় আর কাঁটাগাছের বেড়া ডিঙিয়ে বন্দরের নিশানী বাতি তীব্র আলো ছড়িয়ে ঝলমল করছিল। মনে হচ্ছিল যেন গাছের পাতার অন্ধকার জালে আটকা পড়ে ছটফট করছে বহুদূরের এক উজ্জ্বল গ্রহ।

বাড়ির কাছাকাছি আসতে নেভ্স্কায়ার নজরে পড়ল ক্রিস্তফোরিদিকে। দেখল, রান্নাঘরের জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে উড়ে বাইরে-এসে-পড়া আঁটিবাঁধা গোছা-গোছা পেঁয়াজ লুফে নিচ্ছে ছেলেটা আর বাচ্চা ইয়োলচকা গোছাগুলো টেনে-টেনে নিয়ে যাচ্ছে কাছের গুদামঘরটায়। রান্নাঘরের জানলার ওধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন চোপ। অনবরত গালাগাল দিতে-দিতে তিনিই পেঁয়াজের আঁটিগুলো বাইরে ছুড়ে-ছুড়ে ফেলছিলেন।

নেভ্স্কায়াকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'এই-যে, অভিনন্দন! আসচে বছরের ফসল ওঠা পর্যন্ত এখন আপনার ভাঁড়ারে পেঁয়াজের ছড়াছড়ি...। দাঁড়ান, দাঁড়ান! এখুনি ঘরে ঢুকবেন না! আগে আমি ঘরগুলোয় একটু হাওয়া খেলিয়ে নিই।'

'কী ব্যাপার? হল কী?'

'হবে আবার কী, মাথা আর মুণ্ডু! গ্রামদেশে বাস করছেন যখন, তখন দেশ-গাঁয়ের নিয়মকানুনগুলো জানা উচিত, বুঝেছেন? তা, আপনি বুঝি কারও বাগানের পেঁয়াজের সুখ্যাতি গেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কাখিয়ানির মায়ের বাগানের।'

'ঠিক তাই, যা ভেবেছিলাম!'

জানা গেল যে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান শালিকো ঘণ্টা-দুই আগে এ-বাড়িতে গাড়ি হাঁকিয়ে এসে পেঁয়াজকলি সহ পেঁয়াজের দশ-দশটা বড়-বড় আঁটি রান্নাঘরের মেঝেয় এনে ফেলেছে। বাড়িতে তখন দুটো বাচ্চা ছাড়া আর কেউ ছিল না। কিন্তু ক্রিস্তফোরিদির গাদা-গাদা প্রশ্নের উত্তরে শালিকো শুধু এইটুকু ছাড়া আর কিছুই বলে নি। শুধু বলেছে:

'আরে, চুপ যা, বাচ্চা! কাখিয়ানি সায়েবের মা এয়া ভেট পেইঠেচে।'

লজ্জায় নেভ্স্কায়ার মাথা হেঁট হয়ে গেল। বাড়িতে এসে অতিথির কোনো কিছু পছন্দ হলে মিন্‌গ্রেলীয়রা-যে সেই জিনিসটি অবশ্যই অতিথিকে উপহার দিয়ে থাকে — এদেশের এই প্রাচীন প্রথাটির কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে সে কিনা অসাবধানে সুন্দর পেঁয়াজগুলোর প্রশংসা করে বসেছিল। আর তারই শাস্তি এখন ভুগতে হচ্ছে ওকে!

'আরে, এ তো কিছুই না,' চোপ ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন। 'নেহাতই সামান্য ব্যাপার! তবে কখনও-কখনও এর ফল খুব মারাত্মক হতে পারে। যেমন, শুনুন বলি। জারের আমলে মিন্‌গ্রেলিয়া দেশটা ছিল দাদিয়ানি সামন্ত-রাজাদের অধীন। তা, তারা ছিল ঝাড়ে-বংশে একদম পাঁড় মাতাল আর কুঁড়ের বাদশা। স্রেফ ভোজ দে আর মদ গিলে বিলকুল ফতুর হয়ে গেছিল তারা। এমন কি শোবার বিছানাপত্তরও বিকিয়ে গেছিল। কিন্তু বাড়িতে যখন অতিথ্ আসত তখন খানদানি মেজাজ না-দেখিয়ে পারত না। তখন অতিথ্‌দের ঘোড়া ভেট দিত তারা। তবে ঘোড়াগুলোর আসল মালিক ছিল চাষীরা। দাদিয়ানিদের নিজেদের ঘোড়া-ফোড়া বলতে

কিচ্ছু ছিল না। চাষীদের ধনে মনিবরা এইভাবে পোদ্দারি করত যখন, চাষীরা তখন চুপটি মেরে থাকত, কিচ্ছুটি বলত না। তারা বসে থাকত অতিথ্‌রা কখন চলে যায় তারই অপেক্ষায়। আর তারপর অতিথ্‌রা যখন দাদিয়ানিদের জমির সীমানা ছাড়িয়ে চলে যেত, তখন চাষীরা তাদের পাকড়াও করে ঘোড়া-ফোড়া সব কেড়ে নিত। আর শুধু কি তাই? অতিথ্‌দের মেরে একবারে চিঁড়ে-চ্যাপ্‌টা করে দিত তারা, যাতে আর শিগগিরি তারা দাদিয়ানিদের ধারে-কাছে ঘেঁষতে ভরসা না পায়।'

সেদিন রাত্রে খাবার সময় রোস্ট-করা ভেড়ার মাংসে এতটা পেঁয়াজ দিল ওরা যে অত পেঁয়াজ খেয়ে ওঠা ওদের সাধ্যে কুলোত না, যদি-না সিওমা অনেকখানি খেয়ে ওদের উদ্ধার করত।

একদিনের জন্যে সিওমা সেদিন শহরে এসেছিল। এ-সময়ে সে কাজ করছিল চালাদিদিতে, গাবুনিয়ার অধীনে। মাটিকাটা-যন্ত্র চালানোর কাজ।

মাটিকাটা-যন্ত্র কীভাবে কাজ করে প্রবল উৎসাহ নিয়ে তা সে সবাইকে দেখাল—শিস দিয়ে, জিভের টকটক আওয়াজ করে আর কাল্পনিক চেইনের ঘড়ঘড়্‌ শব্দ মুখ দিয়ে তুলে। ইয়োলচকা তো একেবারে মোহিত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ওইদিন সন্ধেয় ওরা প্রথম জানল যে সিওমার আসল নাম হল জিম বার্লিং, জন্ম স্কটল্যান্ডে, আর একদিন 'ক্লন্‌ডাইক' স্টিমারখানা একটা দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ায় ও-ও প্রায় ডুবে মরার দাখিল হয়েছিল।

কথাটা প্রমাণ করার জন্যে সিওমা ওর জার্সির গলাটা টেনে নামিয়ে বুকের ওপর বড়-বড় বিস্ময়সূচক চিহ্নের মতো

তিনটে নীলরঙের আঁচড়ের দাগ দেখাল। কিন্তু বুকের ওপর অমন দাগ যে কী করে হল তা ভেঙে বলল না, ব্যাপারটা রহস্যই থেকে গেল। বরাবরের মতো সেদিনও সিওমা টেবিলের ধারে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল, আর কেউ ওকে জাগাল না।

পাহাড়ি আঁধি

রোঁয়াওয়ালা চকচকে পাতাগুলো আঙুলের ডগায় নিয়ে অল্প-একটু ঘষলেন চোপ, আর সঙ্গে সঙ্গেই হাতটা সরিয়ে নিলেন। যেন একটা আগুনে-তাতা লাল লোহার শিক হাতে ধরেছেন চামড়ায় এমনই জ্বলুনি ধরল তাঁর। এবার হাতখানা ঘনঘন সামনে-পেছনে নাড়তে লাগলেন আর মুখে গালাগালের তুবড়ি ছুটল, 'ধুত্তোরি, চুলোয় যাক, চীনে বিছুটিগাছের নিকুচি করেছে!'

ভাবলেন শিগগিরই হয়তো যন্ত্রণাটা চলে যাবে, কিন্তু দেখা গেল, কমা দূরে থাক ক্রমশই তা বেড়ে উঠছে। মনে হল, একেবারে হাড়ের মধ্যে সেঁধোচ্ছে যেন যন্ত্রণাটা আর হাড়গুলোকে শক্ত করে মারাত্মক লোহার বাঁধনে বেঁধেছে।

এবার চোপের মনে ভয় ঢুকল। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গেট দিয়ে আবাদের বাইরে বেরিয়ে এলেন। এতক্ষণে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনদিকে তাকিয়ে দেখলেন মুছে-যাওয়া অস্পষ্ট অক্ষরে একটা সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে: 'সাবধান! খালি-হাতে গাছের পাতা ছুঁইবেন না!'

সঙ্গে সঙ্গেই নেভ্স্কায়ার কথা মনে হল ক্যাপ্টেনের।

ভাবলেন, 'আচ্ছা আহাম্মক মেয়েছেলে তো! আগে থাকতে আমাকে নিষেধ করে নি কেন?'

কিন্তু এই ভাবনাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, ওঁর মতো অমন ঘাগু নাবিক মেয়েছেলে সম্বন্ধে অমন কথা বলতে পারলেন কেমন করে? নিজে থেকেই কি তিনি ছুটির দিনে নেভ্স্কায়ার সঙ্গে সুপ্সায় এই নচ্ছার গাছের আবাদ দেখতে আসতে চান নি? তাহলে? নিজেকে ছাড়া আর কাকে দুষতে পারেন তিনি? কেউ তো তাঁকে জোর করে ধরেবেঁধে এখানে নিয়ে আসে নি!

চোপ-যে খালি বকতে ভালোবাসেন তা-ই নয়, সব ব্যাপারে তাঁর কৌতূহলও সাংঘাতিক। নেভ্স্কায়া একবার তাঁকে চীনে বার্নিশ-গাছের পরীক্ষামূলক আবাদের কথাটা বলেছিল। বলেছিল, এই গাছের আঠা থেকে চমৎকার এক ধরনের কলাই করার মোটা বার্নিশ তৈরি হয়। যতই সময় যাক-না কেন কিংবা আবহাওয়া যতই স্যাঁতসেঁতে হোক এ-বার্নিশের পালিশ তাতে নষ্ট হয় না, আগুনেও এর উপরিতলে চিড় ধরে না। চোপের নিজের চোখে-দেখা জাপানি বাক্সের কথা এ-সময়ে মনে পড়েছিল তাঁর। সেই সমস্ত বাক্সও ছিল এই গাছের আঠা দিয়ে বার্নিশ-করা। আর সেই বার্নিশের কলাই ছিল স্বচ্ছ ইস্পাতের মতো শক্ত।

নেভ্স্কায়ার কাছ থেকে চোপ আরও জেনেছিলেন যে এই বার্নিশ জাহাজ-তৈরিরও কাজে লাগে। জাহাজের খোলের যে-অংশ জলের নিচে ডুবে থাকে তার বাইরের দিকে এই আঠার পালিশ লাগানো হয়। নাবিক হিসেবে এই ব্যাপারটা ওঁর কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। আর তাই নেভ্স্কায়া আর লাপ্শিন যখন এই বার্নিশ-গাছের আবাদ

দেখতে সুপ্‌সায় যাওয়া ঠিক করল, উনিও তখন তাদের সঙ্গী হতে চাইলেন।

হাতের যন্ত্রণাটা ক্রমেই বেড়ে উঠছে। হাতখানা পকেটে পুরে চোপ বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। কয়েকটা বুড়ো অ্যাকেশিয়া গাছের হালকা ছায়ায় দাঁড়িয়ে তাঁদের ধুলোমাখা ফোর্ড গাড়িখানা স্বপ্নে মশগুল হয়ে আছে। নেভ্‌স্কায়া বা লাপ্‌শিনের কোথাও কোনো পাত্তা নেই।

গাড়িতে উঠে ওদের জন্যে বসে-বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন ক্যাপ্টেন। আকাশের দিকে তাকালেন একবার, কিন্তু আকাশের চেহারাটা তেমন ভালো ঠেকল না। জোর বাতাস নেই, অথচ হাওয়া ক্রমশ গরম হয়ে উঠছে। পাহাড়গুলোর ওপর ঝুলে আছে লালচে ধুলোর একটা কুয়াশা। সাবানের ফেনার মতো দেখতে লাগছে কুয়াশাটাকে। গত চারদিন বৃষ্টি হয় নি গোটা তল্লাটে।

'আশা করি পাহাড়ি আঁধির খপ্পরে পড়তে হবে না,' আপন মনে কথাগুলো বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন ক্যাপ্টেন।

দেশটায় একেবারে নরকের আবহাওয়া! সারা বছর বৃষ্টি হয় এখানে, আকাশের জল ঢালার আর বিরাম নেই। আবার সারা বছর ধরেই চীনে ধোপাখানার মতো যেমন গরম তেমনি স্যাঁতসেঁতে জায়গাটা। আর তারপর কালেভদ্রে এককেবার পাহাড়ি আঁধি বইতে শুরু করবে, আর তখন মনে হবে যেন বালুঝড় আর মরুভূমির দেশ, গনগনে আগুন আরব দেশটাই এসে ঘাড়ে চেপে বসেছে কলখিদার।

অবশেষে লাপ্‌শিনকে গাড়ির কাছে আসতে দেখে ক্যাপ্টেন বললেন, 'মনে হচ্ছে পাহাড়ি আঁধি উঠছে। আমাদের তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া দরকার।'

লাপ্‌শিন একথার কোনো জবাব দিল না। গাড়ির বনেটের

ঢাকাটা খুলে এঞ্জিনের কলকব্জা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

'দেমাকি শয়তান কাঁহাকা!' মনে-মনে বললেন ক্যাপ্টেন। পকেটে-পোরা হাতখানা তাঁর ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে শিরাগুলোর মধ্যে যেন শিসে ভরে দেয়া হয়েছে।

ফের শুধোলেন, 'পাহাড়ি আঁধি কাকে বলে জানেন?'

'কাকে আবার? ঝড়কে,' লাপ্‌শিন বলল। 'তা, আপনার মতো অমন ঝানু জলদস্যু এত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?'

'কেন মাথা ঘামাচ্চি তা আপনি একবার আঁধির খপ্পরে পড়েন তো টের পাবেন!'

ইতিমধ্যে নেভ্‌স্কায়া এসে পড়ল আর গাড়ির পেছনের সিটে ক্যাপ্টেনের পাশে উঠে বসল। লাপ্‌শিন বসল স্টিয়ারিং-হুইলে। চোখে একজোড়া গগল্‌স পরে নিয়ে সে গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই গরম একঝলক বাতাস এসে নেভ্‌স্কায়ার মুখে ঝাপট মারল, এলোমেলো করে দিল তার চুলগুলো। শিউরে-শিউরে উঠে অধৈর্যভাবে গাড়িখানা ছুটে চলল দিগন্তজোড়া প্রকাণ্ড শাদা মেঘপুঞ্জের দিকে।

দিগন্তের এই মেঘপুঞ্জ ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো দ্রুতগতিতে। আর যত কাছে এগিয়ে আসতে লাগল ততই তা ছড়িয়ে পড়তে আর উঁচু হয়ে উঠতে লাগল। দেখতে-দেখতে পাহাড়ের সারির মতো আকাশ ছুঁল তা। আর হঠাৎ একসময় গাড়িখানা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই মেঘের ভেতর। তারপর গাড়ি এগিয়ে চলল নিঃশব্দে, অ্যাকেশিয়া ফুলের পাপড়ির পুরু জাজিম মাড়িয়ে।

আসলে যা মেঘপুঞ্জ বলে মনে হয়েছিল তা ছিল প্রাচীন অ্যাকেশিয়া গাছের একটা জঙ্গল। আর এখন অ্যাকেশিয়ার শাদা পাপড়িগুলো গাড়ির উইন্ডস্ক্রীনের ওপর আছড়ে পড়তে লাগল, তারপর গাড়ির পেছনে ফুরফুর করে উড়ে যেতে লাগল আকাশের দিকে।

আর পথের দু'পাশের গাছগুলো ছুটে-ছুটে এগিয়ে এসে পেছনে পড়ে যেতে লাগল, অনবরত ছুটে এসে পড়ে যেতে লাগল পেছনে, তুষারফলকের উন্মাদ, শাদা দমকের মতো। নিশ্বাস নেয়ার মতো স্বচ্ছ হাওয়া ছিল না সেই বনে, ছিল কেবল অ্যাকেশিয়া ফুলের মিষ্টি, ভারি সৌগন্ধ্য।

'ভারি অদ্ভুত তো!' খুশিতে চেঁচিয়ে বলে উঠল নেভ্‌স্কায়া।

লাপ্‌শিন গাড়ির স্পীড আরও বাড়িয়ে দিল। অ্যাকেশিয়ার উড়ন্ত পাপড়ির জন্যে তার পক্ষে সামনেটা দেখা কষ্টকর হচ্ছিল। শাদা ফুলের ঝাঁকা মাথায় গাছগুলোর ওপর সূর্য ঝুলে ছিল ম্লান আলো ছড়িয়ে। মনে হচ্ছিল যেন গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে সে-ও চলছে।

গাড়ির এঞ্জিনে কী-একটা যেন ভেঙে গেল। গাড়ি থামিয়ে বনেটের ঢাকার নিচে ডুব দিল লাপ্‌শিন। নেভ্‌স্কায়া আর ক্যাপ্টেন গাড়ি থেকে নেমে উপড়ে-পড়া একটা অ্যাকেশিয়া গাছের গুঁড়ির ওপর এসে বসলেন। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বললেন না। সূর্য তখন মধ্য-আকাশে মিটমিট করছে, ঝলসানো শাদা রঙ গাঢ় লাল হয়ে এসেছে তার।

'এ দেখি একবারে তুর্কি গোসলখানা বনে গ্যাছে,' গজগজ করে বললেন চোপ। 'এ তো ইউরোপের না, এশিয়ার আবহাওয়া!'

নেভ্‌স্কায়া কিন্তু একথা মানল না। বলল, কলখিদার

আবহাওয়া তার ভারি চমৎকার ঠেকে। আধা-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের অনেক জায়গাই এর চেয়ে কম গরম। এ-জায়গায় শীত তো বলতে গেলে নেই-ই। আর গ্রীষ্মকাল থাকে বছরের ছ'মাস জুড়ে, সারা বছর ধরে এখানে জন্মায় গাছপালা। এর বেশি আর কী চান চোপ? পোতির কাছে রিওন নদীর ধারে কোদর নামের গাঁখানা গোটা ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে গরম জায়গা।

'তাই নাকি?' অবাক হওয়ার ভান করে ঠাট্টার সুরে বললেন চোপ। 'আশ্চর্য্যি, এ তো জানতাম না!'

কথাটা গ্রাহ্য না-করে কড়াসুরে বলল নেভ্স্কায়া, 'এখানকার আবহাওয়ায় উত্তাপের মাত্রা একেবারে একরকম থাকে। হঠাৎ-হঠাৎ উত্তাপের ওঠাপড়া ঘটে না।'

'কেবল মাঝে-মাঝে এর অন্যথা ঘটা ছাড়া।'

'অন্যথা কী রকম?'

'কী রকম তা টের পাবেন আধ-ঘণ্টার মধ্যে, যখন পাহাড়ি আঁধি নেমে আসবে।... ভাবছি, এমন বাতাসের হাত থেকে আপনার ঠুনকো গাছপালা বাঁচাবেন কেমন করে!'

আধা-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সমস্ত গাছপালা সম্পর্কেই ক্যাপ্টেন ওই 'ঠুনকো গাছপালা' কথাটা ব্যবহার করে থাকেন।

'হাওয়া আটকানোর জন্যে আমরা লম্বা-লম্বা গাছের বেড়াজাল বানাব।'

শুনে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ঘোঁতঘোঁত করে উঠলেন ক্যাপ্টেন।

নেভ্স্কায়া ফের বলল, 'আবহাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আপনার যখন এতই কৌতূহল তখন তো আপনার আলাপ করা উচিত লাপ্শিনের সঙ্গে। অণু-আবহাওয়া নিয়ে উনি পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছেন।'

'অণু-আবহাওয়া? সেটা আবার কী পদার্থ?' বিড়বিড় করে বললেন ক্যাপ্টেন।

সেই মুহূর্তে অবশ্য তিনি কোনো ধরনের আবহাওয়ার বিষয়েই জানতে আগ্রহী ছিলেন না—তা সে স্বাভাবিক, অথবা অণু, অথবা নারকী, কোনো কিছুই নয়। আসলে তাঁর হাতে তখন এত যন্ত্রণা হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল কেউ যেন হাতের ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে।

এমন সময় লাপ্‌শিন হেঁকে বলল, 'গাড়ি তৈরি!'

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে গাড়িতে উঠতে-উঠতে নেভ্‌স্কায়া ব্যাখ্যা করতে লাগল, 'ব্যাপারটা খুবই সরল, বুঝলেন! আবহাওয়া আসলে নানা ধরনের ছোটখাট জিনিসের ওপর নির্ভর করে। এমন কি এক শো মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যেও তারতম্য ঘটতে পারে এর।... না না, ওজর-আপত্তি তুলবেন না। কথাটা খাঁটি সত্যি। এই-যে বন দেখছেন, এরও নিজস্ব একটা আবহাওয়া আছে। আর এর পাঁচ কিলোমিটার দূরে যে-বাদা আছে তারও জলবায়ু একেবারে তার নিজস্ব। এ থেকে তা সম্পূর্ণ-আলাদা হতেও বাধা নেই। একটা গভীর খাদের নিচেকার আবহাওয়ার সঙ্গে ওই খাদের ওপরকার সমতল মাটির জলবায়ু মোটেই একরকম নয়। এই যে ব্যাপারটা, একেই আমরা বলে থাকি অণু-আবহাওয়া—অর্থাৎ, অল্প একটু দূরে-দূরে আবহাওয়ার এই তারতম্যকে। এটা জানা খুবই দরকারি, বিশেষ করে আপনার ওই 'ঠুনকো' গাছপালার জন্যে তো বটেই।'

'দারুণ-ব্যাপার তো!' বিড়বিড় করে বললেন চোপ। এতক্ষণে পকেট থেকে তিনি হাতখানা টেনে বের করলেন। হাতে কাপড়ের ঘষা লেগে যন্ত্রণা অসহ্য বেড়ে উঠেছে।

ওঁর দিকে তাকিয়ে নেভ্‌স্কায়া এবার ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

বলল, 'এ কী অবস্থা হয়েছে আপনার? হাতখানা দেখেছেন একবার?'

'বিছুটির ঘষা লেগেছে হাতে।'

'কোন বিছুটি?'

'আপনার ওই চীনে বিছুটি।'

'কী বলছেন আপনি?' চেঁচিয়ে উঠল নেভ্‌স্কায়া। 'আরে, ওখানে তো সর্বত্র জর্জীয় আর রুশ ভাষায় নোটিশ লট্‌কানো ছিল। আপনি যে এমন বাচ্চা ছেলের মতো কাজ করবেন তা তো ভাবি নি! এ-যে সাংঘাতিক ভয়ের ব্যাপার!'

'কী মনে করেন, হাতখানা কেটে বাদ দিতে হবে নাকি?' যন্ত্রণায় মুখ কালো করে ক্যাপ্টেন বললেন।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে নেভ্‌স্কায়া এবার চিৎকার করে লাপ্‌শিনকে বলল:

'শিগগির, শিগগির! উনি চীনে বার্নিশ-গাছে হাত পুড়িয়ে ফেলেছেন। আমাদের এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শহরে পৌঁছতে হবে।'

চোখে-পরা মোটর-ড্রাইভারের চশমায় দ্রুত ঝিলিক হেনে লাপ্‌শিন একবার পেছন ফিরে ওর দিকে তাকাল, তারপর পায়ের চাপ দিল অ্যাক্সিলারেটরে। ওর সংকীর্ণ কাঁধের ওপরকার কর্কশ পশমী জ্যাকেটটায় আড়াআড়িভাবে গভীর একটা ভাঁজ ফুটে উঠল।

অ্যাকেশিয়ার বন পেছনে রেখে গাড়িখানা এবার ছুটে ফাঁকা মাঠে বেরিয়ে এল। আর ঠিক তখ্‌খুনি নেমে এসে ওদের মুখে ঝাপট দিল পাহাড়ি আঁধি।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন নিজেকে বাঁচাতে মাথা নামিয়ে নিলেন

ড্রাইভারের সিটের পেছনে। নেভ্স্কায়াও মুখখানা পেছন দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছিল। তার মনে হল যেন ঝোড়ো বাতাস তার নাকে-মুখে জ্বলন্ত একটুকরো তুলো ঠেসে গুঁজে দিয়েছে।

লাল ধুলোর ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে দিয়ে সে দেখল অ্যাকেশিয়া বনের ওপর পাহাড়ি আঁধি নেমে আসার নিষ্ঠুর দৃশ্যটা। চিরকালের জন্যে ওর স্মৃতিতে ছাপ রেখে গেল সেই দৃশ্য। যেন কার অদৃশ্য হাতের দ্রুত একটামাত্র ধাক্কায় গাছ থেকে অ্যাকেশিয়ার ফুলগুলো উপড়ে সাবানের ফেনার বিলীয়মান বুদ্বুদের মতোই উড়ে গেল, তারপর ফরফর-করে-ওড়া ফুলের পাপড়ির একটা সমুদ্র ঝড়ের বাহনে উঠে গেল অদৃশ্য কোন এক আকাশে।

ঝড়ের বাতাস এত জোরে ছুটে এসেছিল যে মনে হচ্ছিল তার যাত্রাপথের মধ্যে জায়গায়-জায়গায় যেন পুরোপুরি শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে। আর সেই সমস্ত জায়গায় এমন কি নিশ্বাস নেয়ার মতো বাতাসটুকুও নেই। কেবল আগুনগরম ধুলোর রাশ হিস্‌হিস শব্দ তুলে ছুটে আসছিল শূন্য জায়গাগুলো ভরে তুলতে।

ধুলোর প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড দেয়ালের ঝাপ্‌টা ওদের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। সামনের রাস্তা দেখতে পাচ্ছিল না লাপ্‌শিন।

'আমাদের ফের বনটায় ফিরে যাওয়া দরকার,' গাড়ির স্পীড কমিয়ে যাত্রীদের দিকে ফিরে সে চেঁচিয়ে বলল। 'ঝড়ের ঝাপ্‌টাটা ওখানে কম লাগবে।'

'না, আমরা ফিরে যেতে পারি না!' নেভ্স্কায়া পাল্‌টা চেঁচিয়ে বলল। 'খবরদার, ফেরবার চেষ্টা করবেন না আপনি!'

কী আর করা! কথাটা মেনে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল লাপ্‌শিন। আচ্ছা ভাবে-ভরা বোকা মেয়ের পাল্লায় পড়া গেছে যাহোক! সামান্য একটা পোড়া ঘা নিয়ে এত হৈচৈ করার আছেটা কী?

জ্বালাপোড়া-ধরানো বাতাস ঠেলে কোনোক্রমে এগোচ্ছিল গাড়িখানা। আর নিচুগলায় শাপ-শাপান্ত করে যাচ্ছিলেন চোপ। ধুলোর ঝাপটায় চোখদুটো তাঁর অন্ধ হবার যোগাড় হয়েছিল। হাতখানা ইতিমধ্যে ফুলে ঢোল আর শক্ত হয়ে উঠেছিল আর বুকটা ঢিপঢিপ করছিল প্রচন্ড—তবে সেই হৃৎস্পন্দন টের পাওয়া যাচ্ছিল ঠিক বুকে নয়, নচ্ছার হাতখানার প্রচন্ড দপদপানিতে।

এর আগেও চোপ পাহাড়ি আঁধির কবলে পড়েছেন। তাই প্রাণপণে যন্ত্রণা সইতে-সইতে নেভ্‌স্কায়ার দিকে ফিরে বললেন:

'ধুলার ঝড় শিগগিরি থামবে। এ নিয়ে অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। তবে এই গরমিটাই সবচেয়ে খারাপ জিনিস।'

ওঁর কথাটা ঠিক ধরতে পারল না নেভ্‌স্কায়া। গরমি বলতে কী বোঝাতে চাইছেন উনি? ভাবল, ওঁর নিজেরই বুঝি জ্বর-জ্বর ঠেকছে, তাই হাত বাড়িয়ে চোপের ভালো হাতখানা ছুঁয়ে দেখল একবার। কিন্তু মাথা নেড়ে চোপ বললেন:

'না-না, আমার কিছু হয় নি। আমি ঠিক আছি। কেন, বুঝতে পারছেন না তাপ বেড়ে চলেছে?'

এতক্ষণে নেভ্‌স্কায়া টের পেল যে একটু-একটু করে বাতাস ক্রমশ গরম হয়ে উঠছে। হঠাৎ একটা উদ্ভট চিন্তা এক মুহূর্তের জন্যে তার মাথায় খেলে গেল: এরকমটা যদি বেশ কিছুক্ষণ চলে তাহলে ওরা সকলেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

গাছের পাতা আর ফুলগুলোকে যেমন করে ধ্বংস করে দিয়েছে ঝোড়ো বাতাস, তেমনিভাবে ওদেরও তা দেবে শেষ করে।

দেখতে-দেখতে গলা শুকিয়ে গেল ওদের, তেষ্টায় ছাতি ফাটার উপক্রম হল। লাল ধুলোর একটা মেঘ মাথার ওপর বহু উঁচুতে ফেনিয়ে উঠতে লাগল, ঢেউ তুলে বারবার ফুঁসে ছুটে যেতে লাগল সূর্যের দিকে। আর ঝড়ের প্রতিটি দমকের সঙ্গে সঙ্গে বাতাস বাচ্চার হাতের বলের মতো সূর্যকে নিয়ে যেন গেণ্ডুয়া খেলতে লাগল। আর উত্তাল ধুলোর স্রোতের ওপর থেকে রক্তের মতো লাল একখানা থালা ক্ষণে-ক্ষণে অদৃশ্য হয়ে যেতে ও ফের ঝলমলিয়ে উঠতে দেখা গেল।

ক্যাপ্টেন একবার আকাশের দিকে তাকালেন।

'সেকেন্ডে ষাট মিটার,' বিমর্ষভাবে বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

'সে আবার কী?' নেভ্‌স্কায়া চিৎকার করে শুধোল।

'ওপরের ওই ঝড়—সেকেন্ডে ষাট মিটার বেগে ছুটছে। টাইফুনের থেকেও সাংঘাতিক এই ঝড়! এই পাহাড়ি আঁধি একঘণ্টার ভেতর উত্তাপ পঁচিশ ডিগ্রি বাড়িয়ে দেবে!'

ইতিমধ্যে ধুলো থিতিয়ে গিয়েছিল। আর নেভ্‌স্কায়া দেখল সে তাকিয়ে আছে অদ্ভুত ধরনের একটা নতুন দেশের দিকে, যেন কোন দূরের অগ্নিকাণ্ডের আভায় ঝলমল করছে সেই দেশ।

দিগন্ত তখনও ঢাকা ইটরঙের ধুলোর আস্তরণে। একটা হলদেটে আলোর আভা ছড়িয়ে আছে সবকিছুর ওপর। নেভ্‌স্কায়ার মনে হল এ-ধরনের নিসর্গদৃশ্য একমাত্র দেখেছে সে প্রাচীন শিল্পীদের সময়-জীর্ণ ক্যান্‌ভাসগুলিতে।

গাড়ির পেছনের একখানা টায়ার ফেটে গেল এইসময়। গাড়ি থামিয়ে লাপ্‌শিন মুখের আর ঘাড়ের ঘাম ঘষে-ঘষে মুছল। তারপর জ্যাকেটখানা গা থেকে খুলে ছুড়ে ফেলে দিল গাড়ির মেঝেয়।

'আমরা এবার পুড়ে ছাই হয়ে যাব,' খিটখিটে মেজাজে বলল ও। তারপর বাইরে হাত বাড়িয়ে গাড়ির গায়ে সজোরে একটা ঘা মারল। গরমের চোটে গাড়ির রঙ ইতিমধ্যে ফেটে গিয়েছিল, এখন এই ধাক্কায় ওর হাতে সেই রঙের খানিকটা উঠে এল। 'আর দেখতে হবে না, মিনিটখানেকের মধ্যে সব ক'খানা চাকা ফেঁসে যাবে'খন। এমনিতেই চাকাগুলোর অবস্থা তেমন যুতের নয়,' বলল লাপ্‌শিন।

'শহর থেকে এ-জায়গাটা কতদূর হবে?' নেভ্‌স্কায়া শুধোল।

'তা, দশ কিলোমিটারের কম হবে না।'

বাকি রাস্তার খুঁটিনাটির কথা মনে-মনে একবার ভেবে নিল নেভ্‌স্কায়া। এরপর দু'কিলোমিটার পথ যেতে হবে সমুদ্রের একেবারে ধার ঘেঁষে, গাড়ির চাকায় সমুদ্রের ঢেউ এসে লাগবে তখন। এছাড়া আর কোনো দ্বিতীয় রাস্তা নেই। তারপর কাপার্‌চা নদী পার হতে হবে খেয়ানৌকোয় চেপে। আর তারও পরে পুরো সাত কিলোমিটার পথ পার হলে তবে শহর।

'সমুদ্রের ধারে চলুন,' লাপ্‌শিনকে বলল ও। 'তাহলে আমরা জল ছুঁয়ে যেতে পারব। সমুদ্রে এখন ঢেউ হবে না, কারণ বাতাস পাড় থেকে সমুদ্রের দিকে বইছে। আর জল পেলে টায়ারগুলো অন্তত বাঁচবে।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, আগে একটু দম ফেলে নি,' জবাবে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল লাপ্‌শিন।

কেউ কোনো কথা বলল না। অ্যল্ডারের একটা ঝোপের ধারে গাড়িখানা দাঁড়িয়ে ছিল ওদের। চোখের সামনেই ওদের অ্যল্ডারের পাতাগুলো শুকিয়ে কুঁচকে আর কালো হয়ে উঠছিল। আর প্রচন্ড বাতাস সেই পাতাগুলোকে ছিঁড়ে উড়িয়ে সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ক্যাপ্টেন কাত্রে উঠলেন। উঃ, যদি একফোঁটা জলও পাওয়া যেত তাহলে হাতখানা ভিজিয়ে নিতে পারতেন উনি!

নেভ্স্কায়া একেবারে নিশ্চল হয়ে বসে ছিল। অ্যল্ডার গাছগুলোর পাতা ছিঁড়ে উড়িয়ে নেয়ার দৃশ্যটা দেখছিল বসে-বসে।

এরপর সমুদ্রের ধারের পাঁশুটে বালিতে ওদের গাড়িখানা নেমে এল যখন, তখন হঠাৎ গাড়িখানা পিছলে গেল একবার। অর্থাৎ, গাড়ির আরেকখানা চাকা ফাটল।

নিজের মনে গালাগাল দিতে-দিতে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল লাপ্শিন। ক্যাপ্টেন আর নেভ্স্কায়ার ওপর বিতৃষ্ণায় ভরে উঠছিল ওর মন। ওরা দু'জন কিছু না-করে দিব্যি চুপচাপ বসে আছে আর গ্যাসোলিনের ধোঁয়ায় ওর নিজের দম আটকে যাচ্ছে আর এঞ্জিন নিয়েও দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। এটাই ছিল ওর বিতৃষ্ণা জাগার কারণ। কলখিদা নামটাকেই ও মনে-মনে শাপ-শাপান্ত করছিল। আর দেখল কখন যেন এই কুচিন্তাটা ওর মাথায় ঢুকেছে যে জায়গাটাকে আধা-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে পরিণত করার পরিকল্পনাটা যেন কখনোই সফল না-হয়, যেন পাতিলেবুর বাগানগুলো প্রথম পাহাড়ি আঁধির বিষনিশ্বাসে পর্যবসিত হয় নোংরা ভস্মে।

বিতৃষ্ণাভরা চোখে পেছন ফিরে নেভ্স্কায়ার দিকে তাকাল লাপ্শিন। আর দেখল, নেভ্স্কায়ার মুখখানাও ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, তার চোখের পাল্টা চাহনিতে ওর চেয়ে কম

বিতৃষ্ণা প্রকাশ পাচ্ছে না। নীলচে একটা আলোও ঝিলিক দিচ্ছে মেয়েটার চোখে।

'একেবারে হুবহু বেড়ালের মতো,' ভাবল লাপ্‌শিন। মুখে তেতো হাসি ফুটিয়ে সে এবার জোরে বলল:

'আমরা শুধু-শুধুই শক্তিক্ষয় করে মরছি।'

'কেন? শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে পেরে উঠব না, বলছেন? তাই কি?'

'নিশ্চয়ই। কখনোই পারব না আমরা।'

লাল ধুলোর মেঘ এবার ঝাপট মেরে নেমে এল উত্তপ্ত, বেগুনিরঙ সমুদ্রের ওপর। তারপর দিগন্তে পেঁছে ঘন হয়ে জমে দাঁড়াল তা, আর আস্তে-আস্তে রঙ বদলে কালো হয়ে উঠল। সমুদ্র খাঁ-খাঁ করছিল, জনমনুষ্যের চিহ্ন ছিল না কোথাও।

কাপার্‌চা নদী থেকে অল্প দূরে থাকতে গাড়ির তৃতীয় টায়ারখানাও ফেঁসে গেল। গাড়ি চলবার সম্ভাবনা রইল না আর। অতএব গাড়ি ফেলে রেখে পায়ে-পায়ে ওরা আস্তে-আস্তে খেয়াঘাটের দিকে এগোতে লাগল।

নেভ্‌স্কায়ার মাথায় নতুন দুশ্চিন্তা ঢুকেছে তখন। খেয়ানৌকোখানা যদি নদীর ওপারে থেকে থাকে? মাঝিরা তাহলে এমন ঝড়ে নিশ্চয়ই নৌকো এপারে আনবে না।

পাহাড়ি ঝড় নরম মাটিকে তখন পাথরের মতো শক্ত করে তুলেছে। মাটির বুকে দেখা দিয়েছে আঁকাবাঁকা কালো-কালো ফাটল। অথচ ওইদিন সকালবেলা সুপ্‌সা যাওয়ার পথে গাড়ির চাকার চাপে ভিজে জোলো মাটিতে ওরা বজবজ করে জল উঠতে দেখেছে।

নেভ্‌স্কায়ার পাশে-পাশে হাঁটতে-হাঁটতে হাতের যন্ত্রণা ভোলবার প্রাণপণ চেষ্টায় ক্যাপ্টেন কথা বলে চললেন। ওকে

শান্ত করার জন্যে তিনি হাতের ব্যাপারে মিথ্যে করে বানিয়ে বললেন যে এখন আগের মতো আর যন্ত্রণা হচ্ছে না।

আর এই সময়েই তিনি এক অপ্রত্যাশিত, আশ্চর্য আবিষ্কার করে বসলেন। তা হল এই যে সত্যিকার নেভ্‌স্কায়াকে এই প্রথম এক-নজর ঠাহর করে দেখার সুযোগ পেলেন তিনি। এর আগে চিরকালই তিনি মেয়ে-বিজ্ঞানীদের ভেবে এসেছেন বেশি পড়াশুনো করার ফলে হতশ্রী, তুচ্ছ, রুগ্ন প্রাণী বলে, যারা নাকি নারীসুলভ কমনীয়তা হারিয়ে বসেছে। সম্ভবত দীর্ঘদিনের এই বদ্ধমূল সংস্কারের বশেই কখনও তিনি নেভ্‌স্কায়ার সঙ্গে সত্যিকার মন খুলে কথাবার্তা যাকে বলে তার অবতারণা করেন নি, কখনও এমন কি আগ্রহ নিয়ে ওর দিকে ভালো করে তাকিয়েও দেখেন নি।

এখন কিন্তু তিনি নেভ্‌স্কায়াকে দেখতে লাগলেন অবাক বিস্ময়ে, প্রশংসার দৃষ্টিতে। আর সে-দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতার ভাবও যে বেশকিছুটা মিশে ছিল না এমন নয়। নতুন চোখে তিনি দেখতে লাগলেন মেয়েটির ফ্যাকাশে, সংকল্পে-দৃঢ়বদ্ধ মুখচোখ, যেন-বা বিরক্তির ফলে দ্রুততর তার হালকা পদক্ষেপ, তার অন্ধকার, ক্ষুব্ধ দুটো চোখ আর ধুলোকালিমাখা গালের ওপর এসে-পড়া লালচে-বাদামি রঙের চুলের গোছাটা।

অবশেষে কাপার্‌চার ধারে এসে পেঁছিনো গেল। বাতাসের ধাক্কায় নদীর জলে ফেনা উঠছে, ফোয়ারার মতো জল ছিটিয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। স্বস্তির গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে নেভ্‌স্কায়া দেখল, নাঃ, খেয়ানৌকোটা শেষ পর্যন্ত নদীর এপারেই আছে। কিন্তু হলে কী হবে, ধারে-কাছে কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

ক্যাপ্টেন তাঁর হাতখানা জলে ডোবালেন। নদীর ঠান্ডা জলে কিছুটা আরাম বোধ হল।

'চলুন, তাহলে যাওয়া যাক!' নৌকোর দিকে যেতে-যেতে খুশি-খুশি গলায় বলে উঠল নেভ্‌স্কায়া। 'নৌকোয় অন্তত দাঁড়গুলো রয়ে গেছে।'

শুনে লাপ্‌শিন ওর দিকে শূন্যচোখে তাকাল।

তারপর শান্ত গলায় বলল, 'আমি আগে কখনও ভাবি নি যে পাহাড়ি ঝড় এত শিগগির মানুষের মাথা খারাপ করে দেয়। আগে তো জানতাম সাধারণত দ্বিতীয় দিন থেকেই মানুষ অকারণে খিটিমিটি বাধাতে শুরু করে দেয়। তারপর তৃতীয় দিনে ঝগড়া হৈ-হল্লা শুরু করে লোকে, আর চতুর্থ দিনে সাধারণত আঁধি থেমে যায় আর মানুষ মানসিক ভারসাম্য ফিরে পায়। এখানকার স্থানীয় লোকে এই রকমই তো বলে।'

'মানে? কী বলতে চান আপনি?' কঠিন গলায় শুধোল নেভ্‌স্কায়া।

'মানে, বলতে চাই যে নদী পার হওয়া অসম্ভব। যদি বরাত খুব ভালো থাকে, তাহলে খেয়ানৌকো ঝড়ের টানে সমুদ্রে বেরিয়ে যাবে। আর বরাত মন্দ হলে, সোজা তলিয়ে যাবে জলের নিচে।'

'তাহলে আমাদের কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?'

'অপেক্ষা করা, আবার কী!'

'না, আমরা কিছুতেই অপেক্ষা করতে পারি না!' চেঁচিয়ে বলে উঠল নেভ্‌স্কায়া। 'আপনি নিজেই তো জানেন যে তার ফল কী হতে পারে।'

শুনে কাঁধ ঝাঁকাল লাপ্‌শিন।

জবাবে বলল, 'ক্যাপ্টেনকেই জিজ্ঞেস করুন-না কেন। এসব ব্যাপারে ওঁর তো অভিজ্ঞতা বেশি।'

শুনে নদীর দিকে একবার তাকালেন চোপ। বিপদের ঝুঁকি-যে অবশ্যই যথেষ্ট তা না-বললেও চলে।

প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড গেরুয়ারঙের ঢেউ তুলে, মুখে ফেনার কুলকুচো ছড়িয়ে আর গর্জন করতে-করতে নদী ছুটে চলেছে সমুদ্রের দিকে। আর নদীর পাড়ের ঝোপঝাড়গুলো বাতাসের দাপটে প্রায় মাটিতে শুয়ে পড়ে ডালপালা দিয়ে জলের গায়ে ঝাপট মারছে।

নিজের হাতের কথা ভুলে গেলেন চোপ। কেবল সমুদ্রযাত্রার বহুকালের ঐতিহ্যগুলো মনে পড়ছিল তাঁর, ঝড় আর জাহাজডুবির সময়ের চমৎকার সব আইনকানুনের কথা। সমুদ্রে যখন জাহাজ ডুবতে থাকে তখন জাহাজ থেকে প্রথমেই মেয়েদের আর বাচ্চাদের নামিয়ে দেয়া হয়! আর এখন নিজের হাত পুড়ে গেছে বলে একটি মেয়েকে তিনি বিপদের মুখে ঠেলে দেন কেমন করে? চুলোয় যাক তাঁর হাত! ওসব ঠিক হয়ে যাবে'খন।... এতসব ভেবেচিন্তে তিনি বললেন:

'এখন পার হওয়ার ঝুঁকি আছে প্রচুর। অপেক্ষা করাই বরং ভালো। আমার হাত এখন দিব্যি ভালো আছে।'

'কেন মিথ্যে ধাপ্পা দিচ্ছেন, চোপ?' চটে উঠে নেভ্স্কায়া বলল। 'দেখেছেন, আপনার হাত একেবারে নীল হয়ে গেছে। আর কোনো কথা নয়, আমরা এখনই পার হব।'

রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে প্রতিবাদ করার ভাষা যোগাল না চোপের মুখে। শুধু বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে। আমরা এখুনি পার হব।'

এবার লাপ্‌শিনের দিকে ফিরে নেভ্‌স্কায়া সংক্ষেপে বলল:

'আসুন!'

কিন্তু লাপ্‌শিন কোনো উত্তর দিল না। শুধু একবার জামা-পরা ওপর-হাত দিয়ে মুখখানা মুছল। আর দেখা গেল, কালো-কালো ঝুলকালির ছোপ লেগেছে জামার হাতায়।

ক্যাপ্টেনকে দেখিয়ে নেভ্‌স্কায়া বলল, 'এ-অবস্থায় উনি দাঁড় বাইতে পারবেন না। আমার একার পক্ষেও নৌকো বাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই, বুঝতে পারছেন, সবকিছু আপনার ওপর নির্ভর করছে।'

'আমি যাচ্ছি না,' ধীরভাবে জবাব দিল লাপ্‌শিন।

রাগে নেভ্‌স্কায়া ফ্যাকাশে মেরে গেল।

'ভিতু কোথাকার!' চেঁচিয়ে বলতে-বলতে চোখে জল এসে গেল ওর। 'আপনি যখন 'বিজ্ঞানীদের উন্নত ধরনের নৈতিকতা' নিয়ে বারফট্টাই করেন তখন কী-যে বোঝাতে চান আপনি তা এতক্ষণে বোঝা গেল!.. ঠিক আছে। চলুন, চোপ!'

পেছন ফিরে লাপ্‌শিন দূরে ফেলে-আসা গাড়িখানার দিকে আস্তে-আস্তে হেঁটে চলে গেল। এমন কি শিস দিতেও শোনা গেল তাকে।

নেভ্‌স্কায়া আর চোপ ভারি নৌকোখানা নিঃশব্দে ঠেলে পাড় থেকে জলে নামালেন। লাপ্‌শিনের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন খালি একবার বিড়বিড় করে বললেন:

'আ মোলো যা! চুলোয় যাক ছোঁড়া!'

নেভ্‌স্কায়া দাঁড় বাইতে লাগল। চোপও একহাতে বাইতে

লাগলেন। যন্ত্রণার কাত্‌রানি চাপা দেয়ার জন্যে দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে রইলেন তিনি।

ওঁদের চোখের সামনে নদীর দুই পাড় পাঁশুটে নাগরদোলার মতো ঘুরে-ঘুরে নাচতে লাগল। ঝড়ের বাতাস শিস দিয়ে ছুটে এসে দাঁড়গুলোয় আটকা পড়ে গিয়ে সেগুলোকে ভেঙে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল। নেভ্‌স্কায়ার বেরেক্যাপ উড়ে গেল হাওয়ার দাপটে। ওর লালচে চুলের গোছা আলগা হয়ে খুলে পড়ে আশ্চর্য এক নিশানের মতো হাওয়ায় উড়তে লাগল।

নৌকোর দু'পাশের নিচু কাঠের পাটায় সজোরে ঘা দিতে লাগল ঢেউ। পোড়া হাতখানা দিয়ে চোপ নৌকোর ভেতর থেকে জল তুলে-তুলে ফেলতে লাগলেন। নেভ্‌স্কায়া ভিজে একশা' হয়ে গিয়েছিল। অমানুষিক পরিশ্রম করতে হওয়ায় প্রত্যেকটি মাংসপেশী টানটান হয়ে উঠেছিল তার।

ওকে দেখে ক্যাপ্টেন মনে-মনে ভাবছিলেন, 'এত শক্তি ও পেল কোথা থেকে?'

নদীর মোহানার দিকে আগাগোড়া সতর্ক নজর রেখে চলেছিলেন তিনি। দ্রুত মোহানাটা কাছে ঘনিয়ে আসছিল। নৌকো থেকেই তিনি মোহানায় নোংরা সমুদ্রের ক্রোধোন্মত্ত জল দেখতে পাচ্ছিলেন।

'আমাদের সমুদ্দুরে চলে গেলে চলবে না!'

নেভ্‌স্কায়ার মাথা তখন বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। এত জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরল ও যে ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। বাতাসের একটা দমকে এই সময় ওর হাত থেকে দাঁড়খানা ছিটকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে টলমল করে উঠল নৌকো। ক্যাপ্টেন একবার পাড়ের দিকে তাকালেন। দেখলেন, নতুন আর আরও সাংঘাতিক একটা দমকা

আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে গাছগুলো ভয়ে মাথা নিচু করে নুয়ে রয়েছে।

‘এইবার অক্কা পেতে চলেছি দেখছি!’ বিড়বিড় করে বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন।

নদীর জলের ফোয়ারার মতো ঝাপ্‌টায় নেভ্‌স্কায়ার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। তবু প্রাণপণ চেষ্টায় কোনোরকমে দাঁড়খানা উদ্ধার করল সে, তারপর ফের দাঁড় বেয়ে চলল।

মনে হচ্ছিল, সময় যেন আর ফুরোবে না।

বেশ কিছুক্ষণ কাটার পর ফের একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ক্যাপ্টেন দেখলেন নদীর পাড় খুব কাছে এসে গেছে। পাড়ের ওপর খেয়ানৌকোর মাঝিদের চালাঘরখানা চোখে পড়ল তাঁর, আর দেখলেন জনা-দুই জেলে নদীতে হাঁটুজলে নেমে দাঁড়িয়ে আছে। একজন জেলের হাতে নৌকো ধরার লোহার হুকও চোখ এড়াল না তাঁর।

সেই হুক ছুড়ে ওরা যখন নৌকোর একটা পাশ আটকে নিল, তখন—একমাত্র তখনই—ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে নেভ্‌স্কায়াকে বললেন:

‘যাক, এ-যাত্রা বেঁচে গেলাম!’

ইতিমধ্যে হাতখানার কথা সম্পূর্ণ ভুলে বসেছিলেন তিনি। কিন্তু নিরাপদে পাড়ে নেমে আসার পর যন্ত্রণাটা ফের টাটিয়ে উঠল।

জেলে-দু’জনের মধ্যে অল্পবয়সী যে, হাফপ্যান্ট-পরা সেই ছেলেটি ক্যাপ্টেনের দিকে বিদ্রুপের দৃষ্টি হেনে বললে:

‘ব্যাপার কী, দোস্ত? বাতাসের দাপটে খ্যাপাটে মেরে গেছিলেন, নাকি? দেখে তো আপনেরে জাহাজের খালাসি বলে মনে লিচ্চে। তা, এমন আহাম্মকের মতন কাজকম্মো করেন কেনে? আবার সাথে মেয়েছেলেও আচে দেখচি।’

ভালো হাতখানা দিয়ে জেলেটির কাঁধে একটা চাপড় মেরে ক্যাপ্টেন বললেন, 'আরে, ওসব কথা চেপে যাও ইয়ার! বরং জাহাজঘাটায় এলে আমার সাথে দেখা কোরো। শিককাবাব আর নতুন মদ খেতে দেব'খন। আমাদের যে প্রাণে বাঁচালে তার জন্যে জোর খানাপিনা করা যাবে।'

শুনে জেলেরা হেসে উঠল।

'বাতাস পড়লে পর ওই ছোঁড়াটাকে এপারে পেঁছে দিও দেখি,' বলে ক্যাপ্টেন আঙুল দিয়ে ওপারে লাপ্‌শিনকে দেখিয়ে দিলেন। লাপ্‌শিন তখন ঝুঁকে পড়ে গাড়ি মেরামত করতে ব্যস্ত।

'আচ্ছা! ঠিক আছে!'

সমুদ্রের ধার-বরাবর পায়ে হেঁটে শহরের দিকে রওনা দিলেন দু'জনে। সমুদ্রের ধারে পাঁশুটেরঙের বালির স্তূপ পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে থাকায় তার আড়ালে-আড়ালে বাতাসের দাপট এড়িয়ে চলার সুবিধে হচ্ছিল।

কিছুক্ষণ নেভ্‌স্কায়া কোনো কথা না-বলে চুপচাপ রইল। তারপর হঠাৎ মুখখানা ফিরিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। দেখে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন চোপ। পাহাড়ি আঁধির কবলে পড়লে অনেক সময় মৃগীরোগ দেখা দেয় ভেবে আঁধিকেই শাপান্ত করতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, একটুও না-কমে আঁধি তখনও প্রবল বেগে বয়ে চলেছিল।

ফের চোখের সামনে এক অভিনব নিসর্গদৃশ্য দেখতে পেলেন ওঁরা। মাটি খটখটে শুকনো আর ঝলসানো, যেন আগুনে-পোড়া। ক্যাপ্টেনের মনে পড়ল আকাশের ঠিক এমনি ছাইরঙ আর এমনি বিষণ্ণ আলো তিনি দেখেছিলেন একবার এক সূর্যগ্রহণের আগে।

এক সময় পোতির ফলবাগানগুলো দেখা গেল—দূরে।

আশ্চর্য, পাহাড়ি আঁধিতে ওদের কোনো ক্ষতি হয় নি। লম্বা-লম্বা প্লেইনগাছের বেষ্টনী বাঁচিয়েছে ওদের।

'শুনুন,' হঠাৎ বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন। 'ওকে ওরা ঠিক এপারে নিয়ে আসবে'খন। তা, ছোঁড়া যদি একদিন না-খেয়ে থাকে তো কী এসে-যায়?'

'কি-যে বোকার মতো কথা বলেন না আপনি, তার ঠিক নেই! ও ওখানে দিন-তিনেক থাকুক না, তাতে আমার কী এসে-যায়?'

'তাহলে? তাহলে আপনি কাঁদছেন কেন?'

'কাঁদছি—তখন ভয় পেয়েছিলাম বলে।'

নাঃ, এসব হেঁয়ালি বোঝা চোপের বুদ্ধির বাইরে। তিনি ঠিক করলেন, অযথা আর কথা বাড়াবেন না। আর সত্যি, শহরের হাসপাতালে পেঁছিনো পর্যন্ত মুখ বুজিয়েই রইলেন তিনি। তারপর, ওখানকার নিরাপদ আশ্রয়ে পেঁছিনোর পর ফের তিনি গালিগালাজ শুরু করলেন, চীনে বার্নিশ-গাছের বাপান্ত করে আর আস্ত রাখলেন না।

ফুটবল-ম্যাচ

শহরের পরীক্ষামূলক বাগানে বাঁশগাছে ফুল ফুটতে শুরু করল। গাছগুলোয় প্রথম কুঁড়ি ধরতে দেখেই নেভ্‌স্কায়ার মনের শান্তি গেল ঘুচে। কারণ বাঁশগাছ জীবনে একবারই মাত্র ফুল দেয়, তারপর যায় মরে।

লাপ্‌শিনের কিন্তু এতে মনে কোনো বিকার ঘটল না। কাপার্‌চা নদীর ধারে সেদিনের সেই ঘটনার পর ও খুব কমই কথা বলেছে নেভ্‌স্কায়ার সঙ্গে। আর অন্য কারো

সঙ্গে কথায়-কথায় নেভ্‌স্কায়ার নাম উঠলে খালি হেসেছে তাচ্ছিল্যভরে। আর এখন ওর মনে হয়েছে নেভ্‌স্কায়ার পক্ষে এত বিচলিত হওয়াটা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। গাছের ফুলফোটা তো আর বন্ধ করা যায় না। কী আর করা যাবে, বাঁশগাছের মরণদশা ঘনিয়ে এসেছে। কাজেই এ নিয়ে অত দুশ্চিন্তিত হওয়াটা বোকামি ছাড়া আর কী!

ক্যাপ্টেনও একদিন বাগানে বেড়াতে এলেন ফুলধরা বাঁশগাছগুলো দেখতে। তাঁর হাতে যদিও এখনও ব্যান্ডেজ বাঁধা, তবু হাতটা ক্রমশ ভালো হয়ে উঠছে। সঙ্গে করে ইয়োলচ্‌কা আর ক্রিস্তফোরিদিকে নিয়ে এসেছেন ক্যাপ্টেন।

বাগানের মধ্যে ছোট্ট কাঠের বাড়িটায় নেভ্‌স্কায়ার আলো-ঝলমলে কাজের ঘরখানায় ঢুকে ক্যাপ্টেন দেখলেন আরও একজন অতিথি সেখানে উপস্থিত। সে হল সিওমা। সে শহরে এসেছে তার মাটিকাটা-যন্ত্রটার জন্যে কিছু খুচরো কলকব্জা যোগাড় করতে। সঙ্গে সে আবার গাবুনিয়ার একখানা চিঠিও নিয়ে এসেছে, আর তাতে গাবুনিয়া নেভ্‌স্কায়া আর চোপকে নতুন-কাটা খাল দেখতে আসার জন্যে নেমন্তন্ন করেছে চালাদিদিতে।

ঘরখানায় সবক'টা জানলা হাট করে খোলা ছিল। বাইরে ভোরবেলাকার ঝলমলে আলোয় তাজা, স্বচ্ছ বাতাস গাছের পাতার ফাঁকে খেলা করে ফিরছিল। শাদা ফুলধরা আঙুরলতা তার ঠান্ডা ঝলক ছড়িয়ে রেখেছিল জানলার একটা তাকের ওপর।

ভিজে সোঁদা মাটি, গাছগাছালির গন্ধ আর লজ্জাবতী ফুলের মিষ্টি সৌরভে চোপের মনে পড়ে গেল রজেস্তভেন্‌স্কির নৌবহরের সঙ্গে মাদাগাস্কারে কাটানো

তাঁর দিনগুলোর কথা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল প্রাচ্যদেশের বাজারগুলোয় ফলফুলুরির পাগল-করা সেই ম-ম গন্ধের কথা।

ইয়োলচ্‌কা আর ক্রিস্তফোরিদি বাগানে গাছের নিচে খেলবার জন্যে দৌড়ে বাইরে চলে গেল। পরীক্ষামূলক এই বাগান আসলে বহুরকম তাজ্জব ব্যাপারস্যাপারে-ভরা প্রকাণ্ড একটা ফলবাগান ছাড়া কিছু নয়। হাতের পাতায় কচি-কচি লেবুর পাতা চটকে তার গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে বিভোর হয়ে যেতে লাগল ক্রিস্তফোরিদি।

ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছের গত বছরের পুরনো পাতা এক জায়গায় জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল। থামের মতো মোটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে-পাকিয়ে আকাশে উঠছিল অগ্নিকুণ্ড থেকে।

ক্রিস্তফোরিদি মাথা খাটিয়ে একটা মজার খেলা বের করে ফেলল। ও সাজল বাঘ আর ইয়োলচ্‌কা মেয়ে-শিকারি। নিচু ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে ও বাঘের মতোই রাগে গরগর করতে আর পাতার গায়ে কামড় বসাতে লাগল, যেন মস্ত-মস্ত লম্ফ দেবার জন্যে তৈরি হয়ে গুঁড়ি মেরে রয়েছে। এই খেলা নিয়ে এত মত্ত হয়ে রইল যে এর ফলে কত-যে ঝামেলা পোহাতে হবে ওকে তা যেন ভুলেই গেল। দিনের বেলা কম রোজগার করার জন্যে মা ওকে নিশ্চয়ই বিষম বকবেন। তার মানে, বাড়ি ফেরার আগে চোপের কাছ থেকে ফের পঞ্চাশ কোপেক চাইতে হবে, নইলে বুড়ি মা-বিটি একেবারে রেহাই দেবে না ওকে।

বাঘের মতো গরগর করতে-করতে আর পাতার গায়ে ঝাপট মেরে কামড় বসাতে-বসাতে অনেকক্ষণ খেলল ক্রিস্তফোরিদি। শেষে একসময় চোখে জল এসে গেল ওর।

কারণ পাতায় কামড় দিতে-দিতে ও ভুলে কর্পূরগাছের পাতা কামড়েছিল, আর কর্পূরের তীব্র ঝাঁঝালো স্বাদে একেবারে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠেছিল ওর।

গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো নিচে ঝরে পড়ছে সবুজের ফিনিক ছড়িয়ে, স্ল্যুস-গেটের ফাঁক দিয়ে যেমন করে ঝরে পড়ে জলের স্রোত, তেমনিভাবে। মাটি থেকে শেকড়বাকড়ের ওষুধ-ওষুধ গন্ধ উঠছে। চীনেমাটির পাত্রের মতো দেখতে রোডোডেনড্রন গাছের পাতাগুলো ছড়িয়ে আছে ঘাসের ওপর সামুদ্রিক তারামাছের মতো। বাঁশঝাড়ের চিকণ-চিকণ পাতা হাওয়ায় সর্‌সর আওয়াজ তুলছে, আওয়াজটা ঠেকছে যেন খুদে-খুদে পাখির মিষ্টি কিচিরমিচিরের মতো। কলাগাছের কাণ্ডে রস ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছেঁড়া-ছেঁড়া পাতায় আর থোড়ে মৃদু মচমচ আওয়াজ হচ্ছে। জাপানি ক্রিপ্টোমেরিয়ার ছুঁচ-পাতাগুলো গন্ধ ছাড়ছে হলদে রজনমাখানো পাইনকাঠের তৈরি শ-খানেক জাহাজের মতো।

ইউক্যালিপ্টস গাছগুলো তাদের ভারি-ভারি রসে-ভেজা পাতাগুলো কাত করে উঁচুতে সূর্যের দিকে তুলে রেখেছে। ক্রিস্তফোরিদি ইউক্যালিপ্টস গাছ এড়িয়ে চলে ওরা ছায়া দেয় না বলে।

কাজান্‌লিক গোলাপের বাগানে ক্রিস্তফোরিদি একসময় একটা রোঁয়াওয়ালা গুবরেপোকা ধরে ফেলল। ওর হাতের মুঠোয় আটকা পড়ে গুবরেপোকাটা রেগে গেল ভীষণ। ওঃ, কী জোরেই-যে ভনভন আওয়াজ করতে লাগল সেটা! ইয়োলচ্‌কাকে পোকাটা দেখাল ক্রিস্তফোরিদি। এরপর আশেপাশে বড়রা কেউ আছে কিনা ভালো করে দেখে নিয়ে ওরা দু'জন ক্যার্কগাছ থেকে বাকলের একটা ছোট্ট টুকরো

ভেঙে নিল। মাছধরা ছিপের জন্যে এ দিয়ে কয়েকটা ফাত্না বানাবে ক্রিস্তফোরিদি।

বাগানে আলোছায়ার খেলা, গাছের পাতার মর্মরধ্বনি, ওর রোদে-পোড়া হাতের চামড়ায় ফোঁটায়-ফোঁটায় পড়া শিশির, সমুদ্রের খুশিভরা ডাক, হীরে-ঝলমলে বাষ্পের মতো সোজা মাথার ওপর উঠে-আসা মেঘ, এসবই গভীর আনন্দে ভরে তোলে ক্রিস্তফোরিদির মন। বাগানের প্রধান পথ ধরে আগাগোড়া পাশে-পাশে ডিগবাজি খেতে-খেতে সে পাগলের মতো চেঁচিয়ে ছড়া কাটতে লাগল: 'ঠিকমতো দাও শান! ঝকঝকে খরশান!' ইত্যাদি। আর তারপরে ডিগবাজি খেতে-খেতেই সে হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ল জেরেনিয়ম ফুলের চারার একটা কেয়ারিতে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রিস্তফোরিদির উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গেল। জেরেনিয়মের চারা থেঁতলে যাওয়ায় গুরুতর ঝামেলা দেখা দিতে পারে। তাই সে ইয়োলচ্কার হাত ধরে গুটিগুটি অফিসবাড়ির দিকে চলল। অফিসের কাছাকাছি আসতে জানলা দিয়ে অনেক লোকের গলা শুনতে পেল ওরা।

অফিসে তখন কী নিয়ে যেন একটা তর্ক চলছিল। প্রথমেই যার গলার স্বর চিনতে পারল ক্রিস্তফোরিদি সে হল লাপ্শিন। লাপ্শিনকে একেবারে দেখতে পারে না ও। লাপ্শিনের প্রকাণ্ড লালচে-বাদামিরঙের জুতোজোড়া পালিশ করা একটা যন্ত্রণাবিশেষ। ক্রিস্তফোরিদি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না সে-জুতোজোড়ায় ঠিক কোন রঙের পালিশ খাপ খাবে।

'কলখিদার সঙ্গে আধা-গ্রীষ্মমণ্ডলের কোনো মিলই নেই,' লাপ্শিন বলছিল তখন। 'বহু রকমের গ্রীষ্মমণ্ডলের ফল

পাকার পক্ষে এখানকার বাৎসরিক উত্তাপের পরিমাণ খুবই কম।'

'একেবারে বাজে কথা!' নেভ্স্কায়া ঝামরে উঠল। 'আধা-গ্রীষ্মমণ্ডলে উত্তাপের মোট বাৎসরিক পরিমাণ তিন হাজার ডিগ্রির মতো। অথচ কলখিদায় এর পরিমাণ পঁয়তাল্লিশ শো ডিগ্রি। কাজেই এ-ধরনের শস্তা সন্দেহ জানিয়ে লাভ কী?'

'আপনার সঙ্গে কোনোকিছু নিয়ে আলোচনা করা অসম্ভব। সকলের সঙ্গেই আপনি বড্ড রূঢ় আচরণ করেন।'

'কাপার্চা নদীর ধারে সেদিনের সেই ঘটনার পর আমি কিন্তু আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি, যদিও আমি জানতাম যে আমার কোনো দোষ নেই, আমার আচরণই সেদিন সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। কাজেই সে-প্রশ্ন ফের তুলবেন না।'

'বুঝলেন, আপনাদের এই উদ্ভিদবিদ্যে কিন্তু আমার কাছে চীনে ধাঁধার সামিল,' কথা ঘোরানোর জন্যে চোপ এবার কথা বললেন।

শুনে নেভ্স্কায়া হাসল।

বলল, 'গাছপালার জগতে কিন্তু সবকিছুই খুব সরল। গ্রীষ্মমণ্ডলের ফল পাকবার জন্যে তাদের দরকার হয় বছরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সূর্যের উত্তাপ। আর তা হল কমপক্ষে তিন হাজার ডিগ্রি। মাঝেমধ্যে আবহাওয়ায় উত্তাপের হেরফেরে তেমন কিছু এসে যায় না। কারণ গাছে ধোঁয়া দিয়ে এই হেরফেরের কুফল ঠেকানো সম্ভব, ধোঁয়ায় সবসময় উত্তাপ বেড়ে যায়। কিংবা যেগুলো বেশি ক্ষীণজীবী গাছ তাদের গা গরম জলের ব্যাগ দিয়ে মুড়ে রাখলেও চলে। শীতের সময় গাছগুলোকে বস্তা দিয়ে মুড়ে রাখাও সম্ভব।

তবে গোটা বছরের উত্তাপের মোট পরিমাণটাই হল আসল ব্যাপার। আমি তাই বুঝতে পারছি না লাপ্‌শিন ঠিক কী নিয়ে তর্ক করছেন। উনি খুব ভালো করেই জানেন যে এখানে আমরা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উত্তাপই পেয়ে থাকি।'

'কই, আমি তো তর্ক করছি না। আমি সন্দেহ পোষণ করছি মাত্র।'

'হ্যাঁ, অধ্যাপক সন্দেহ পোষণ করছেন মাত্র, আর কিছু না!' ঠাট্টা করে হাসতে-হাসতে বলল নেভ্‌স্কায়া। তারপর মাথায় হঠাৎ দুষ্টুবুদ্ধি চাপায় ফের বলল, 'আচ্ছা, একটু তুলনা করে দেখা যাক। যেমন ধরা যাক, কুয়াশা আর বৃষ্টি সত্ত্বেও দক্ষিণ ইংলন্ড জায়গাটা মোটেই ঠাণ্ডা নয়। সেখানকার বাৎসরিক উত্তাপের মোট পরিমাণ তিন হাজার ডিগ্রির কাছাকাছি। তা, আপনার কী মনে হয়, সেখানে কি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উদ্ভিদ জন্মায়?'

'মোটেই না, জন্মাতেই পারে না তা,' বলল লাপ্‌শিন।

'আচ্ছা, এখানে তো একজন ইংরেজ নাবিক সশরীরে হাজির আছেন,' বলে ইঙ্গিতে সিওমাকে দেখাল নেভ্‌স্কায়া। 'উনি নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলবেন না। আমরা কী নিয়ে তর্ক করছি তা-ও উনি বুঝতে পারছেন না। তা, ওঁকে একবার বাগানে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করাই যাক-না যে ইংলণ্ডে জন্মায় এমন কোনো গাছগাছালি উনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিনা।'

নেভ্‌স্কায়ার এই বক্তব্য ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিলেন ক্যাপ্টেন। শুনে সিওমা তার বড়-বড় হল্‌দে দাঁত বের করে একগাল হাসল, হ্যাঁ, দক্ষিণ ইংলন্ড অবশ্যই গেছে বৈকি ও, ওয়াইট দ্বীপে ও গেছে, আর এখন 'মাই লেডি'র এই সামান্য অনুরোধ ও খুশি হয়েই রাখতে রাজি। মনে-মনে

সিওমা তখন ভাবছে, না জানি 'মাই লেডি' লাপ্‌শিনের সঙ্গে কত টাকার বাজি ধরেছেন?

সবাই মিলে এবার বাগানে বেরিয়ে এল। পথে চোপ কড়াভাবে সিওমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে কোনো মেয়েকে 'মাই লেডি' বলা একেবারেই বেখাপ্পা ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে কথাটা মেনে নিল সিওমা। এর পর থেকে সে নেভ্‌স্কায়াকে 'কমরেড' বলে ডাকতে শুরু করল।

বাগানে ঢুকে অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন ক্যাপ্টেন। কী আশ্চর্য ব্যাপার! বিশ্বাসই করা যায় না যে সাম্প্রতিক পাহাড়ি আঁধিতে এখানকার এই সতেজ সমৃদ্ধ গাছপালার গায়ে এতটুকু আঁচড় পর্যন্ত লাগে নি। তবে নেভ্‌স্কায়া বাগানের চারিদিকে ঘেরা ইউক্যালিপ্টস আর প্লেইনগাছের সারি দেখিয়ে দিয়ে জানাল যে ওগুলোই আগুনে-বাতাসের হাত থেকে বাগানগুলোকে রক্ষা করেছে। ইউক্যালিপ্টস গাছ পাহাড়ি আঁধিকে থোড়াই পরোয়া করে।

দুই হাত পকেটে পুরে হালকা চালে শিস দিতে-দিতে হেঁটে যাচ্ছিল সিওমা। যেন বোঝাতে চাইছিল, দুনিয়ায় এমন কী বস্তু আছে যা জাহাজের নাবিককে অবাক করে দিতে পারে!

হ্যাঁ, গ্রীষ্মমণ্ডল! গ্রীষ্মমণ্ডলের কথা ভালোই জানা আছে সিওমার। ত্রিনিদাদ দ্বীপে একবার গোটা-গোটা পাতিলেবু ছুড়ে সিওমা একটা কাফের জানলা ভেঙে চুর-চুর করে দিয়েছিল, কারণ কাফেটায় ওরা একজন নিগ্রো নাবিককে কিছুতেই ঢুকতে দিচ্ছিল না। ওসব গ্রীষ্মমণ্ডল-ফণ্ডল ভালো করেই জানে সিওমা। সবকিছু জানে ও: সাবমেরিন থেকে উঁচিয়ে-থাকা জঘন্য যতসব পেরিস্কোপ, ভুট্টাদানার

রুটির আস্বাদ, পুলিশের সঙ্গে রক্তারক্তি লড়াই, জান বাজি রেখে এস্পার-ওস্পার করার মতো ফুটবল খেলা, জাল-করা ছাড়পত্র, ধর্মঘট আর সেই 'লম্বা-লম্বা প্রার্থনা'। 'লম্বা-লম্বা প্রার্থনা' হল বেলে পাথরের মস্তবড় একটা টুকরো, যার ওজন হবে আধা-টনখানেক। সমুদ্রগামী জাহাজের ডেক ঘষে সাফসুতরো করার জন্যে ওই পাথর ব্যবহার করা হোত।

সত্যি বলতে কী, কলখিদায় আসার আগে পর্যন্ত জীবনে কোনোদিন সত্যিকার তাজ্জব বনে যাওয়া যাকে বলে তা হয় নি সিওমার। এখানে এই ক্যাপ্টেনসায়েব, যিনি নাকি বন্দর-ইন্স্পেক্টর হিসেবে কাজ করছেন, সমুদ্রজীবনের আন্তর্জাতিক ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁর তো সিওমাকে গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবার কথা, অথচ সেই ক্যাপ্টেনই কিনা সিওমাকে নিজের বাড়িতে ঠাঁই দিলেন আর এক সপ্তাহের ওপর খাইয়ে-পরিয়ে রাখলেন তাকে। পোতির বন্দরে যেসব সোভিয়েত জাহাজ ভিড়তে দেখেছে সিওমা, তাদের মাল্লাদের ক্যাবিনে একমাত্র তাজা ফুলের তোড়া ছাড়া আর কিছুরই অভাব চোখে পড়ে নি। আর তারপর কী হল? না, দিন-সাতেক পরেই ওকে চাকরি দেয়া হল আর ছোকরা এঞ্জিনিয়র গাবুনিয়া ওর করমর্দন করে সমকক্ষ লোকের মতো ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সিওমার কাছে এই দেশটার যে-ব্যাপারটা সবচেয়ে আশ্চর্য ঠেকেছে তা হল — সবাই, এমন কি লেখাপড়া-জানা মহিলারা পর্যন্ত, ওর সঙ্গে আলাপ করেছে একেবারে সমকক্ষ লোকের মতোই।

শিস দিতে-দিতে বাগানের পথ ধরে হাঁটছিল সিওমা। এমন সময় ওর চোখে পড়ল পেঁয়াজজাতীয় লীক-কন্দের একটা খেত। দেখে ও আপনমনে হাসল। আরে, এই

সব্‌জিটা তো ওর চেনা জিনিস! এরপর যখন ফুলধরা বাঁশঝাড়ের কাছে এসে পেঁছিল তখন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে শব্দ করে সজোরে থুতু ফেলল আর চাবুক হাঁকড়ানোর আওয়াজের মতো অদ্ভুত একটা আওয়াজ করল জিভ দিয়ে।

বলল, 'আরে মাইরি! এমন গাছ তো ওয়াইট দ্বীপে জম্মাতে দেখিচি!'

'হাস্যকর ব্যাপারস্যাপার সমস্ত!' চটে উঠে এবার প্রতিবাদ জানাল লাপ্‌শিন। 'আপনাদের এই খালাসিটাকে নিয়ে আচ্ছা মজার রসিকতা জুড়ে দিয়েছেন দেখছি। আবার আমাকেও জড়াচ্ছেন এই ভাঁড়ামির সঙ্গে! একেই আপনি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বলেন নাকি?'

'কিন্তু উনি তো ঠিক কথাই বলছেন,' জবাব দিল নেভ্‌স্কায়া। 'দক্ষিণ ইংলন্ডে বাঁশঝাড় আছে বৈকি।'

লাপ্‌শিন কিন্তু রীতিমতো খেপে উঠেছিল। প্রথমে ভানো তাকে বোকা বানিয়েছে আর এখন এই মেয়েটাও বোকা বানাতে চাইছে তাকে। হয় ন্যুট্রিয়া নয় বাঁশঝাড় যাহোক একটা কিছু ছুতো মিললেই হল।

'না-না, রাগ করার কিছু নেই লাপ্‌শিন,' আপসের সুরে বলল নেভ্‌স্কায়া। 'মুখ্যু বলে যাদের মনে করা হয় তেমন সব লোকের কাছ থেকেও যে-কোনো ভালো বিজ্ঞানীর অনেক কিছু শেখার থাকে। কাজেই আপনার আরেকটু সমঝে কথা বলা উচিত।'

জবাবে শুধু কাঁধঝাঁকানি দিয়ে পেছন ফিরে লাপ্‌শিন এবার হাঁটা দিল তার অণু-আবহাওয়া নিয়ে পরীক্ষার ল্যাবরেটরির দিকে। নেভ্‌স্কায়াও ফিরে এল তার কাজের ঘরে। সিওমা চলে গেল। চালাদিদির ট্রেন ধরতে হবে তাকে।

একমাত্র চোপ বাচ্চাদের সঙ্গে বাগানে রয়ে গেলেন। অসুস্থ

হয়ে দু'সপ্তাহের ছুটিতে থাকায় ইচ্ছেমতো কাটানোর মতো অঢেল সময় হাতে ছিল তাঁর। প্রায় প্রত্যেকদিন তিনি পরীক্ষামূলক বাগানে আসছিলেন।

বাঁশঝাড়ের পাশটাতে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন চোপ। বাঁশঝাড়টার মরণ-যে ঘনিয়ে এসেছে এতে কোনো ভুল নেই। জাপানের স্মৃতি মনের মধ্যে ভেসে উঠল তাঁর। চালের একটা চালান নেয়ার জন্যে একবার তাঁর স্টিমার ছোট্ট একটা জাপানি বন্দরে ভেড়ে। সেই সময়কার একটা ঘটনার কথা বাচ্চাদের বলতে লাগলেন চোপ।

একদিন খুব ভোরে জাহাজের পাহারা তাঁকে ডেকে তুলল। বলল, শহরে কিছু-একটা ঝামেলা ঘটেছে। জাহাজ থেকেই তিনি অবশ্য চিৎকার-চ্যাঁচামেচি আর মেয়েদের কান্নাকাটির হৈচৈ শুনতে পাচ্ছিলেন। কী ঘটেছে দেখার জন্যে পাড়ে নামলেন চোপ। মনে হল কোথাও বোধহয় আগুন লেগেছে। লোকজন সবাই শহরের একটা প্রান্তের দিকে ছুটছিল। ছুটতে-ছুটতে পুরুষেরা চিৎকার করে কাকে যেন শাপ-শাপান্ত করছিল আর মেয়েরা ছুটছিল কচি বাচ্চাদের বুকে আঁকড়ে ধরে। অথচ চোপ কোথাও কোনো আগুন বা ধোঁয়ার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিলেন না।

লোকের পিছুপিছু ছুটে শিগগিরই চোপ এসে হাজির হলেন একটা বাঁশবনে। আর তখনই ওঁর চোখে পড়ল যে বাঁশঝাড়ে ফুল ধরেছে। রাত্রের মধ্যেই কুঁড়ি থেকে ফুল এসেছে গাছগুলোয়।

ওইদিনই চোপ প্রথম জানলেন যে এক‌েকটা আস্ত বাঁশঝাড় মাত্র একটা শেকড় থেকে গজিয়ে ওঠে। আর তাই বাঁশঝাড়ে ফুল আসার পর একেকটা গোটা তল্লাট জুড়ে আস্ত একটা বাঁশঝাড়ই একসঙ্গে যায় মরে। এদিকে সেদেশে বাঁশ-যে

শুধু শহরের লোক আর কাছাকাছি গ্রামগুলোর চাষীদের বাড়িতৈরির মালমশলা হিসেবে কাজে লাগে তা-ই নয়, বাঁশ সেদেশে মানুষের খাদ্যও। জাপানিরা বাঁশের কচি ডগা খেয়ে থাকে। তাই জাপানে বাঁশগাছে ফুল ফোটা সাংঘাতিক একটা বিপর্যয়ের সামিল।

'কাজেই বুঝলে তো বাচ্চারা, প্রত্যেক গাছেরই একটা করে গপ্পো আছে,' বলে গল্প শেষ করলেন চোপ।

অবশেষে ক্যাপ্টেন তাঁর তত্ত্বাবধানের অধীন বাচ্চা দুটোকে নিয়ে একসময় বাড়ির পথে রওনা দিলেন। বাগান থেকে বেরোবার আগে উনি নেভ্স্কায়ার অফিসঘরে গেলেন বিদায় জানাতে। দেখা গেল টেবিলের ওপর ছোট-ছোট স্তূপ-করে-সাজানো একগাদা বীজ নিয়ে বসে আছে সে।

'আচ্ছা, একটা কথা,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'আপনি বলছেন যে ওই ছোঁড়া...' (লাপ্শিন সম্বন্ধে উনি এইভাবেই উল্লেখ করে থাকেন) 'ওই ছোঁড়া নাকি অণু-আবহাওয়া নিয়ে গবেষণা করছে। তাহলে আপনার কাজটা কী?'

'কলখিদার জন্যে গাছ বাছাই করা আমার কাজ। মানুষের মতো গাছেরও কিন্তু নানা রকমফের আছে। যেমন আছে খামখেয়ালি গাছ, তেমনি আছে ক্ষীণজীবী দুর্বল গাছ, সতেজ জোরালো গাছ, আবার ঠাণ্ডা একদম পছন্দ করে না এমন গাছও। গোড়ায় যথেষ্ট জল দিতে হয় এমন গাছ যেমন আছে, তেমনই স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটিতে ক্ষতি হয় এমন গাছও বড় কম নেই। উত্তরাঞ্চলের গাছ, দক্ষিণাঞ্চলের গাছ, সার আর জল খেয়ে খালি পেটমোটা করে এমন লোভী গাছ, দেদার হাতে ফল বিলোয় এমন দাতা গাছ, সরু মরকুটে গাছ, মোটাসোটা গাঁট্টাগোট্টা গাছ — কত রকমের-যে গাছ আছে তার ইয়ত্তা নেই। আপনি যখন জাহাজে করে

লম্বা-লম্বা পাড়ি দিতেন তখন মাল্লা বাছাইয়ের ব্যাপারে আপনি-যে খুবই হুঁশিয়ার থাকতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। যে-কোনো দুঃসাহসিক অভিযানে দলের সদস্য নির্বাচনের মতো উপযোগী গাছও নির্বাচন করার দরকার পড়ে। বাছাই-করা দলে একটিও মাথামোটা কিংবা নাকিকান্না কাঁদার লোক থাকলে সমস্ত আয়োজনটাই পণ্ড হবার যোগাড় হয়। এই ধরুন-না কেন, যেমন এখানে — আমি খুঁজছি সবচেয়ে সেরা জাতের ইউক্যালিপ্টসের বীজ।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই করতাম...' ক্যাপ্টেন বলতে শুরু করলেন, কিন্তু কথা শেষ করা আর হয়ে উঠল না। রাস্তা থেকে হঠাৎ প্রচণ্ড সোরগোলের শব্দ কানে আসায় তিনি সেদিকে মন দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ক্রিস্তফোরিদি। ক্যাপ্টেনও কান খাড়া করে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন সোরগোলটা কিসের। ওদিকে চ্যাঁচামেচি সমানে চলতে থাকল। এটা কি কোনো রাগারাগি, ঝগড়াঝাঁটির ব্যাপার, না উৎসাহের বাড়াবাড়ির ফল? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেনও ছুটে বাইরে বেরোলেন।

দেখা গেল, বাগানের ঠিক বাইরেটাতেই একটা পোড়ো মাঠে ফুটবল খেলা চলেছে। পোতির পুরনো একটা রেওয়াজ হচ্ছে এইরকম যে ফুটবল খেলায় একদিকে থাকে অবিবাহিত ছেলেদের দল আর অপরদিকে বিবাহিতদের টিম। আর এ-ধরনের খেলায় যেমন হয় আর-কি, উত্তেজনার পারা সবসময়েই একেবারে চরমে চড়ে থাকে। অবিবাহিতরা তাদের বিরুদ্ধপক্ষ বিবাহিতদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে নাকাল করে তোলে, আর বিবাহিতের দল এমনিতে খেলতে

থাকে চুপচাপ করে, গোমড়া মুখে। তবে যখনই তারা কোনোরকম একটু মওকা পায় তখনই ওসব নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না-রেখে চোরাগোপ্তা মার চালায়, বিবাহিতের বুটের ডগা ফাঁক পেলেই সজোরে খোঁচা মারে আইবড়দের হাঁটুর পেছনে।

দেখা গেল, খেলোয়াড়রা খেলা ছেড়ে মাঠের মধ্যে একটা জায়গায় জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ভিড়ের মধ্যে চোপের হঠাৎ নজরে পড়ে গেল—সিওমাকে। বিবাহিতের দল ঘিরে ধরেছে ওকে, আর মাল্লাটি ইংরেজি ভাষায় গাল পাড়ছে। আইবড়রা অবশ্য সমর্থন করছে ওকে।

মিলিশিয়ার লোক গ্রিশা এসে তাড়াতাড়ি গোলমাল থামিয়ে দিল। এরপর তর্কবিতর্ক চলতে লাগল কিছুটা শান্তভাবে।

জানা গেল, গোলমালটা একটা নেহাতই সামান্য ব্যাপার থেকে শুরু হয়েছে। বাগান থেকে বেরোবার পর খেলা দেখার জন্যে দাঁড়িয়েছিল সিওমা। তারপর আইবড়-দলের ফরোয়ার্ডদের একজন গোড়ালি মচকে যাওয়ায় খেলা ছেড়ে বেরিয়ে আসায় উৎসাহের ঝোঁকে ও গিয়ে যোগ দেয় আইবড়দের দলে। তারপর গোল দেয় গুনে-গুনে তিনটি। আর তখনই বিবাহিতের দল সোরগোল তোলে। তারা বলে, খেলাটা ফের গোড়া থেকে ফিরেফিরতি খেলতে হবে। ব্যস, এই নিয়ে কথা-কাটাকাটি, একজন আরেকজনকে মেরে বসল একটা ঘুষি, অপর একজন কাকে যেন বলল ইতর, আর লেগে গেল ধুমধড়াক্কা।

ভিড় ঠেলে সিওমার কাছে পেঁছে হাত চেপে ধরে তাকে বাইরে টেনে নিয়ে এলেন চোপ। সিওমার শরীর তখন গরম

হয়ে উঠেছে, দরদর করে ঘামছে সে। আর হাঁপাচ্ছে যেন দমফেলা ঘোড়ার মতো।

সাংঘাতিক খেপে গেলে লোকে যেমন আনুষ্ঠানিক ভদ্রতা দেখিয়ে কথা বলে সেইভাবে ক্যাপ্টেন বললেন, 'মিস্টর বার্লিং, আপনার কি খেয়াল আছে যে চালাদিদিতে যাবার একখানা মাত্তর ট্রেন আপনি ফেল করেছেন? সোভিয়েত রাশিয়ায় লোকে কিন্তু কাজের সময় আর ফুটবল খেলার সময়ের মধ্যে ফারাক মেনে চলে। আপনাকে কাজ দেয়ার জন্যে গাবুনিয়ার কাছে সুপারিশ করেছিলাম ভেবে লজ্জা পাচ্ছি।'

শুনে সিওমার ঘাড়মুড়ো লাল হয়ে উঠল। অস্পষ্টভাবে কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বিড়বিড় করে কী-একটা যেন বলল সে, তারপর চলার পথে প্রথম যে পাশের রাস্তা পেল তাতে ঢুকে পড়ল। প্রথমবার মোড় ঘোরার পর অবশ্য থামল সে, পাইপ ধরিয়ে নিল, তারপর ভাবতে শুরু করল। ঠিক করল পায়ে হেঁটেই সে রওনা দেবে, তাহলে ভোর-ভোর নাগাদ চালাদিদিতে পৌঁছতে পারবে আশা করা যায়।

এদিকে নেভ্স্কায়া তখনও ইউক্যালিপ্টসের বীজ বাছাইয়ের কাজে ব্যস্ত। ওর টেবিলে ছড়িয়ে আছে কলখিদার ভবিষ্যৎ। সাত সমুদ্রের ওপার থেকে আনা বীজের খুদে-খুদে শাঁস — বিস্ময়কর, প্রায় অলৌকিক নানা গুণের যতসব মণিমঞ্জুষা। ছড়িয়ে আছে ভবিষ্যৎ সৌগন্ধ্য, রোগহর বৃক্ষরস, কঠিন ও অবিনাশী দারু, মনোরম পুষ্পবিন্যাস, আর শুষ্কপ্রায় কুসুমের তীব্র মর্মজ্বালা।

পোতিতে আসার পর নেভ্স্কায়া উদ্ভিদ-সংক্রান্ত নানা সমস্যা নিয়ে লেখা লাপ্শিনের বেশ কয়েকটা প্রবন্ধ পড়েছে। প্রবন্ধগুলো পড়তে গিয়ে, বলতে কী, মাথা ধরে গেছে ওর।

দেখেছে, মূল ব্যাপারগুলো সম্পর্কে লেখকের বোধ বড় কম। ওষুধবানানো কম্পাউন্ডারের বিরক্তিকর নিষ্ঠা নিয়ে তুচ্ছ খুঁটিনাটি ব্যাপারে বড্ড বেশি মাথা ঘামিয়েছে লেখক। তার না-আছে ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোনো দিব্যদৃষ্টি, না উদ্ভিদ-জীবন সম্বন্ধে কোনো বোধ, অথচ নেভ্স্কায়ার মনে হয় মানুষের মতো গাছেরাও চায় ভালোবাসা, চায় অন্তর্দৃষ্টি।

স্বাধীন চিন্তা, মুক্তমন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, এসব সযত্নে এড়িয়ে গেছে লাপ্‌শিন। সে শুধু বাড়াবাড়িরকম যথাযথ থাকার প্রয়াস পেয়েছে। কল্পনাশক্তির ঘাটতি আছে তার। সে হচ্ছে সেই অপদার্থ, অকেজো জাতের লোক যারা শুধু পেশায় বিজ্ঞানী, মানসিক প্রবণতার বশে নয়। তবে, সুখের বিষয়, এই জাতের লোক আজকাল ক্রমশ কম দেখা যাচ্ছে।

লাপ্‌শিনের লেখার ধরনটাও বড্ড অযথা-ফেনানো আর নীরস। কথাবলার ধরন আবার ওর আরও নীরস। কেমন যেন চিবিয়ে-চিবিয়ে, নিষ্প্রাণ ভাষায় কথা বলে ও। এককালে, আগের পুরুষের বিজ্ঞানীদের কাছে অবশ্য এই ধরনটাই উন্নততর সংস্কৃতির লক্ষণ বলে গণ্য হোত। লাপ্‌শিনের চেয়ে কম পড়াশুনো আছে এমন লোকজনকে ও হেয়জ্ঞান করে আর যে-কোনো ছুতোয় তাদের তুচ্ছতা প্রমাণ করাটাই ওর কাজ।

নেভ্স্কায়া ওর প্রবন্ধগুলো পড়ে ফেলার পর লাপ্‌শিন তাকে শুধিয়েছিল প্রবন্ধগুলো সম্পর্কে তার মতামত কী। চট করে নেভ্স্কায়া সেদিন ওর এ-কথার কোনো উত্তর দিতে পারে নি। তবে পরদিন পুশকিনের গ্রন্থাবলীর একটা খণ্ড নিয়ে এসে কবির লেখা চিঠিপত্রের একটা জায়গা থেকে একটা লাইন লাপ্‌শিনকে দেখিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল:

'জ্যামিতিতেও কবিতার চেয়ে প্রেরণা কম অপরিহার্য না।'

এরপর লাপ্‌শিন আর কোনো কথা বলে নি।

ইউক্যালিপ্টসের বীজগুলোর ওপর এইভাবে হুমড়ি খেয়ে মগ্ন থাকার সময় নেভ্‌স্কায়া প্রায়ই ভাবে, এই আশ্চর্য গাছ নিয়ে দারুণ একখানা বই সে ছাড়া আর কেই-বা লিখে ফেলতে পারে? এই 'জীবনদায়ক বৃক্ষ'এর মোট দু'শো প্রজাতি নিয়ে আর কে করতে পারত তার মতো এত কাজ? এ-গাছের অসংখ্য অসামান্য গুণ বর্ণনা করার পক্ষে তার চেয়ে আর যোগ্য কে? কত দীর্ঘদিন ধরেই-না সে স্বপ্ন দেখেছে এমন একখানা বই লেখা নিয়ে খাটাখাটুনি করার।

নেভ্‌স্কায়া মনে করে ইউক্যালিপ্টস হল গ্রীষ্মমণ্ডলের সকল গাছগাছড়ার মধ্যে সবচেয়ে দামি গাছ। লোকে এই গাছকে 'জঙ্গলের রত্ন' নাম দিয়েছে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই!

কলখিদায় ইউক্যালিপ্টসের বীজ পোঁতার দু'বছর পর চমৎকার সাত মিটার লম্বা বড়-বড় গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। অবিশ্বাস্যরকম দ্রুত বেড়ে উঠেছে গাছগুলো। আর আগের আমলে পোঁতা কিছু-কিছু পুরনো ইউক্যালিপ্টস গাছ তো এখন মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো দেড় শো মিটার উঁচু হয়ে উঠেছে।

প্রস্থেও এই গাছ এত দ্রুত বাড়ে যে এর সঙ্গে অন্য কোনো গাছের তুলনাই হয় না। সম্প্রতি নেভ্‌স্কায়া ইউক্যালিপ্টসের গুঁড়ির বর্ষ-বলয়গুলো মাপজোখ করে দেখেছে। একটাও তার মধ্যে তিন সেন্টিমিটারের কম চওড়া নয়।

এ-গাছের অসম্ভব জোরালো প্রাণশক্তি, এর ঐশ্বর্য এবং মানুষের কাছে যা একে মূল্যবান করে তুলেছে এর সেই বহুতর গুণের বহর দেখেশুনে প্রায় স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়।

পাঁচ-বছুরে একটা ইউক্যালিপ্টস গাছ থেকে যে-পরিমাণ কাঠ পাওয়া যায় তার চেয়ে দু'শো বছরের পুরনো উত্তরাঞ্চলীয় দেওদার আর স্প্রুস-দেওদারের কাঠের পরিমাণ কম।

ইউক্যালিপ্টসের কাঠকে চিরস্থায়ী বলে মনে করা হয়। এ-কাঠের পচন বা ক্ষয় নেই। কাঠ-ফুটো-করা পোকামাকড় এ-কাঠের ধারে-কাছে ঘেঁষে না। সমুদ্রের জলে চুবিয়ে-রাখা ইউক্যালিপ্টসের গুঁড়ি তিরিশ বছর পরেও গাছকাটার দিনটির মতোই তাজা থেকে যায়। ইউক্যালিপ্টসের কাঠ-দিয়ে-বানানো রেলওয়ের স্লিপার সাধারণ কাঠে-বানানো স্লিপারের চেয়ে দুই থেকে তিনগুণ বেশি সময় টেঁকে। ওক কিংবা আখরোট কাঠের চেয়েও ইউক্যালিপ্টস কাঠ বেশি শক্ত।

ইউক্যালিপ্টস কাঠের মাস্তুলওয়ালা সমুদ্রগামী জাহাজের যেসব গল্প বলেছেন চোপ তা মনে আছে নেভ্স্কায়ার। চল্লিশ আর পঞ্চাশ ডিগ্রি সমাক্ষরেখার মাঝের এলাকায় যে-ভয়ঙ্কর ঝড় ওঠে সমুদ্রে — মাল্লারা যার নাম দিয়েছে ‘গর্জন-তোলা’ ঝড় — সেই ঝড়ের মুখে পড়েও ইউক্যালিপ্টস মাস্তুলে একটা ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ কেউ শোনে নি কোনোদিন। বাতাসের ঝাপটায় এই মাস্তুলে গুনগুন আওয়াজ ওঠে শুধু, আর তা সিধে খাড়া হয়ে থাকে একেবারে শান্ত সমুদ্রে থাকার মতোই। সবচেয়ে সূক্ষ্ম মাপনযন্ত্রেও বোধহয় সেই খাড়া অবস্থা থেকে এতটুকু হেলনদোলন ধরা পড়বে না। অথচ পাইনকাঠে-তৈরি মাস্তুল এমন ঝড়ে প্রায়ই একেবারে দেশলাই কাঠির মতো মচ করে ভেঙে যায়।

‘আহ্, মস্কোর ফুটপাথগুলো সব ইউক্যালিপ্টস কাঠের

তক্তায় বাঁধানো হলে কেমন হয়! কী মজাই-না হয় তাহলে!' ভাবল নেভ্স্কায়া।

ইউক্যালিপ্টসের পাতাগুলো কাত হয়ে ধারগুলো ওপরদিকে, সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। ফলে ইউক্যালিপ্টসের কুঞ্জে ছায়ার নামগন্ধ থাকে না। বাদা-এলাকার জল শুকনোর পক্ষে এই-ই হল গিয়ে সবচেয়ে উপযুক্ত গাছ। এ-গাছের ভারি-ভারি, খাড়া শক্ত পাতা প্রচুর পরিমাণে স্যাঁতসেঁতে ভিজে হাওয়া ছাড়ে। বৃষ্টিতে বা পাহাড়ি আঁধিতে কোনো ক্ষতি হয় না এর, তাছাড়া যেকোনো মাটিতে এই গাছ জন্মাতে পারে।

ম্যালেরিয়াবাহী মশারা ইউক্যালিপ্টস পাতার গন্ধ সইতে পারে না। সত্যি বলতে কী, ইউক্যালিপ্টস ম্যালেরিয়াকে তল্লাটছাড়া করে। হয়তো এই কারণেই গ্রীষ্মমণ্ডলে লোকে এ-গাছকে 'জীবনদায়ক বৃক্ষ' বলে থাকে। কে জানে!

ঘরের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে এল ক্রমশ। ঘড়িতে সময় দেখার জন্যে চোখ তুলে তাকাল নেভ্স্কায়া। গাছপালার স্তূপে চাপা-পড়া ছোট্ট বাড়িখানার নিস্তব্ধতায় একমাত্র দেয়ালঘড়িটাই দ্রুত টিকটিক করে চলেছে। মাত্র বিকেল পাঁচটা বাজছে এখন। এরিমধ্যে তাহলে এত অন্ধকার ঠেকছে কেন? জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল নেভ্স্কায়া। দেখল, সমুদ্রের অনেক উঁচুতে স্থির হয়ে আছে পাঁশুটে-নীল রঙের একখানা মেঘ। আর তারপরই গুমোট বাতাস চিরে হঠাৎ মেঘের গুরুগুরু একটা গর্জন ছড়িয়ে পড়ল মন্দাক্রান্তা চালে। হালকা ফুরফুরে একটা বাতাস ছাড়ল এরপর। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গাছপালার চকচকে মোমের পাতলা প্রলেপ-দেয়া গাঢ় সবুজ পাতাগুলোয় কেমন একটা অস্বস্তিকর শিহরণ জাগল।

জানলার বাইরে কে যেন বলে উঠল, 'বিষ্টি লামবে মনে লিচ্চে।'

আর ঠিক তখনই মেঘের বুক চিরে বিদ্যুতের চেরা-জিভের প্রচণ্ড একটা ঝলকানি চমকে উঠল, মনে হল প্রকাণ্ড একটা সোনালি কাচের পাত্র যেন খানখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল হাজার টুকরোয়। আর বাগানের পাতিলেবু গাছগুলোর ঝাঁকড়া মাথার মধ্যে অসংখ্য আলোর বিন্দু একবার ঝিকিয়ে উঠেই মিলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। নেভ্‌স্কায়ার কেমন মনে হল, ওগুলো আলোর বিন্দু নয়, থোকা-থোকা উজ্জ্বল হলদেরঙের লেবু, এমন মনোহর লেবু দুনিয়া কোনোদিন চোখে দেখে নি।

এরপর বাতাসের ঝাপটা হানা দিল জানলা দিয়ে। পর্দাগুলোকে আলুথালু-এলোমেলো করে উড়িয়ে ফের ঘর ছেড়ে দৌড়ল বাগানগুলোর মধ্যে দিয়ে। ফের একবার বিদ্যুৎ চমকাল। তারপর শোনা গেল মেঘের গর্জন, আগের চেয়ে এবার আরও জোরে, আরও ভয়ঙ্কর শব্দে।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার, নেভ্‌স্কায়া ভাবল। কে জানে, বৃষ্টি হয়তো সারা রাত ধরে চলবে।

বাতাসে উথালপাথাল শহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ফিরে-ফিরে ওর মনে পড়তে লাগল বিদ্যুতের সেই প্রথমবারের ঝলকানিটার কথা। মনে হল, সর্বনাশের সেই আলোয় ও যেন ভবিষ্যৎ কলখিদার মুখ দেখতে পেয়েছে— সোনালি লেবুর সৌন্দর্যে ঝলমল-করা কলখিদার।

বাড়িতে পেঁাছনোর পর চোপ বললেন বৃষ্টি আসছে। ব্যারোমিটরে পারা নামছে, তার মানে হাওয়ার চাপ কমে যাচ্ছে।

তবু কিন্তু সেদিন রাত্রে বৃষ্টি নামল না। পরদিন সকালবেলায় নেভ্‌স্কায়া চালাদিদির পথে রওনা হল। আশা করতে লাগল বৃষ্টি নামবার আগেই হয়তো ফিরে আসতে পারবে।

লেনিনের আবক্ষমূর্তি

হিপোক্রেটিসের একখানা বইয়ে মশগুল হয়ে নিজের ঘরে বসে ছিল গাবুনিয়া। কলখিদা সম্বন্ধে বিজ্ঞানের গবেষণামূলক একখানা বই লিখতে ব্যস্ত আছে সে এখন, তাই এই বিষয়টা নিয়ে প্রচুর পড়াশুনো করে চলেছে। যেমন আধুনিক কালের ভূগোল-রচয়িতাদের বই তেমনি প্রাচীন কালের স্ট্রাবোঁ, হিপোক্রেটিস আর হোমরের বইপত্রও পড়ছে।

গাবুনিয়ার মতে, 'ইলিয়াদ' কাব্যে ট্রয়ের যুদ্ধের সময়কার আবহাওয়ার আদর্শ একখানা মানচিত্র দেয়া আছে। একেবারে নির্ভুল যথাযথতায়, বিশেষ যত্ন নিয়ে হোমর সেখানে প্রতিদিনকার বাতাস আর মেঘের চলাচলের গতিপথ নির্দেশ করেছেন। বস্তুত, একজন আধুনিক বিজ্ঞানী হোমরের বর্ণনার ওপর ভিত্তি করেই ওই পৌরাণিক আমলের আবহাওয়ার চাপের একটা সারণী ছকে ফেলেছেন। আর তা থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা গেছে যে আকিয়ান বা গ্রীক নৌবহর ঈজিয়ান সাগরের ওপর দিয়ে বয়ে-যাওয়া একটা ঘূর্ণিঝড়ে পড়েই ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।

গাবুনিয়া পড়তে লাগল, 'ফাসিস (অর্থাৎ, রিওন) নদীর তীরে যে-জাতির বাস তাহাদের অবস্থান উষ্ণ, জলময় অঞ্চলে, অরণ্যাকীর্ণ স্থানে ও অত্যন্ত আর্দ্র আবহাওয়ায়। বৎসরের

সকল ঋতুতেই সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটে। মনুষ্যসমূহ জলময় নিম্ন ভূমিতেই তাহাদের জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে। জলের উপরেই তাহারা বৃক্ষাদির শাখা-প্রশাখা দিয়া বসতি নির্মাণ করে। কর্তিত বৃক্ষকাণ্ডসমূহে অবতল কোটর ক্ষোদিত করিয়া বহিত্র নির্মাণ করতঃ সেই বহিত্রযোগে বহুতর নদী ও খাতপথে তাহারা দেশমধ্যে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। সূর্যতাপের ফলে পচনশীল এবং বৃষ্টিপাতের ফলে পুনরায় পরিপুষ্ট সেই বদ্ধ, স্রোতোহীন, ঈষদুষ্ণ জল তাহাদের পানীয়। সেই দেশে বায়ু সাধারণত দক্ষিণ দিক হইতে প্রবাহিত হয়, তবে কখনও-কখনও পূর্বদিক হইতেও উষ্ণ, প্রবল, অপ্রীতিকর বাতাস বহিয়া থাকে।'

'...সূর্যতাপের ফলে পচনশীল... বদ্ধ, স্রোতোহীন... তাহাদের পানীয়,' কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করে গাবুনিয়া গাল পাড়ল একটা। শালা! ওই জলের কষা-নোন্তা আস্বাদ জানতে বাকি আছে নাকি তার! ওর দৃঢ় ধারণা, ওই জল থেকেই ম্যালেরিয়া ধরেছে ওর।

টেবিল ছেড়ে উঠে হাট করে জানলা খুলে দিল গাবুনিয়া। ঘরের ভেতরটা যা গরম! জানলা খুলতেই ভ্যানিলার মৃদু-মিষ্টি গন্ধ নাকে এল। প্রচণ্ড বৃষ্টির আগে সবসময়েই বাতাসে ভ্যানিলার এইরকম গন্ধ পাওয়া যায়।

'কোথাও একটা ঝড় পাকিয়ে উঠছে আর-কি,' ভাবল গাবুনিয়া। তারপর বইয়ের পাতা ওল্টাল।

ফোরম্যান মিখা ঘরে ঢুকল। দুশ্চিন্তায় ওর চোখদুটো এদিক-ওদিক ঘুরছিল, পরনের ছেঁড়াখোঁড়া সির্ক্যাশীয় কোটের ভাঁজগুলোয় ও ঝাড়া দিচ্ছিল থেকে-থেকে। নিঃশব্দে পা টিপে-টিপে হেঁটে এসে ব্যারোমিটরের কাছে পৌঁছে

আঙুলের হলদেটে নখ দিয়ে কাচের ঢাকাটার গায়ে টোকা দিল ও। ক্ষোভে-দুঃখে চোখদুটো সরু-সরু হয়ে এল। ব্যারোমিটরের পারা নেমে চলেছে একইরকম ভাবে, অপ্রতিরোধ্য একগুঁয়েমির বশে।

'বিষ্টি লামতে যাচ্চে। বাস পাচ্চেন না?' মুখে বাঁকা হাসি টেনে মিখা বলল। সবসময়ে মুখ মচকে হাসা মিখার অভ্যেস, এমন কি সবচেয়ে ঝুটঝামেলার সময়েও। আর এই অভ্যেসের জন্যেই বেপরোয়া দুঃসাহসী বলে ওর নামডাক। 'পাহাড় থেকে যখন তোড়ে ঢল লামবে, আমরা সব্বাই তখন জলে ভেসে ধুয়েপুঁছে সাফ হয়ে যাব-নে।'

গাবুনিয়া একথার কোনো উত্তর দিল না।

'লালচুলো ইংরেজের পো এখনও ফেরল না দেখি,' ফের বলল মিখা। ব্যারোমিটরের কাচের ঢাকায় নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'এই ম্যালোরি-জ্বর আমারে সাবাড় করলে। ক্যান্যারি পাখির মতন হলুদবন্ন হয়ে গেচি একবারে!'

এবার গাবুনিয়া চোখ তুলে তাকাল। শুনল, খালের পঞ্চম খন্ডাংশে দু'পাড়ের বাঁধগুলো মিটারখানেক করে বসে গেছে। অবিলম্বে সেগুলো মেরামত করে ফেলা দরকার। কর্মীদের পক্ষে হাত লাগিয়ে এটা করা একেবারেই সম্ভব নয়। খালের ওই অংশে একটামাত্র যে মাটিকাটা-যন্ত্র কাজ করছে তার একটা দরকারি যন্ত্রাংশ ভেঙে গেছে। সিওমা সেই যন্ত্রাংশটা আনতে গেছে শহর থেকে, কিন্তু এখনও ফিরল না।

'নোকজন কতটা কী করতে পারে বলেন? ওদের সব্বাইরে ম্যালোরি ধরেচে,' কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে ফোরম্যান বিড়বিড় করে তার বক্তব্য শেষ করল।

বাতাস এত ভারি আর দম-আটকানো ঠেকছে যে মনে হচ্ছে

গোটা তল্লাটটাই যেন একটা প্রকাণ্ড বাষ্প-স্নানের ঘর। ধুত্তোরি, এ-দেশটার ধরনই এমনি! নিদারুণ বিরক্তিতে একদলা থুতু ফেলল মিখা।

'জানি, জানি,' গাবুনিয়া উত্তর দিল।

গভীর ভাবনায় ডুবে ছিল ও। জানলার বাইরে দেখা যাচ্ছিল অসহ্য গরমে আর জলার পচা গন্ধে জঙ্গলের গাছপালা অবসন্ন ম্রিয়মাণ হয়ে এলিয়ে আছে। আকাশটা দেখতে লাগছে যেন বাতাসহীন সিসের চাঁদোয়া।

এমন সময় দীর্ঘনিশ্বাসের মতো দূর থেকে ভেসে এল অস্পষ্ট বজ্রধ্বনি।

'আচ্ছা, তাহলে হিসেব করে দেখা যাক,' হিপোক্রেটিসের বইয়ের একটা পাতায় পেন্সিল চালিয়ে হিসেব কষতে বসল গাবুনিয়া। 'ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে বৃষ্টি শুরু হওয়ার কথা। আর তাহলে ঘণ্টা-তিনেকের মধ্যে পাহাড় থেকে ঢল নামবে। এই ঘণ্টা-তিনেক কাবার হবার আগেই মাটিকাটা-যন্ত্রের ওই খুচরো অংশটা আমাদের শিবিরের ওয়র্কশপে বানিয়ে নিতে হবে। এখন সমস্যা হল, যন্ত্রটা বানাই কী দিয়ে? অ্যাঁ? শালা মাথায় কিছু আসছে না! খানিকটা ব্রোঞ্জ আমাদের দরকার-যে।'

গাবুনিয়া বুঝতে পারছিল, ম্যালেরিয়ার পালাজ্বর আসব-আসব করছে। শিরায়-শিরায় রক্তের গুনগুনুনি শুনছে ভনভন-করা মশার ডাকের মতো। এই মুহূর্তে ওর ইচ্ছে করছে সবকিছু ভুলে গিয়ে বিছানায় সটান শুয়ে পড়তে আর কম্বল টেনে মাথামুড় ঢেকে নিতে।

ঝোড়ো বাতাসের প্রথম দমকটা জঙ্গলের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। তারপর আবার কবরের স্তব্ধতা নেমে এল পৃথিবীর ওপর।

'সবাইকে খালের পাঁচ নম্বর অংশে যেতে বলো, দোস্ত্,' ধরাগলায় গাবুনিয়া বলল। 'যে যেখানে আছে সব্বাই, এমন কি মেয়েরাও! আর যেখান থেকে হোক একটুকরো ব্রোঞ্জ আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। শিগগির, শিগগির!'

'বটে!' মাথা নেড়ে মিখা বলল। 'চালাদিদি এস্টেশন এখেন থেকে সাত ভের্স্তা দূর। এস্টেশনে এট্টা ব্রোঞ্জের ঘণ্টা আচে। বোলো তো, আমিই সেখেনে যেতে পারি। ঘণ্টাটারে মাংসর পিঠার মতন দিব্যি হাতসাফাই করে লিয়ে আসতে পারি।'

'বাজে কথা বোলো না,' ধমক দিল গাবুনিয়া। 'যা বলছি তাই। জল্দি! সবাইকে পাঁচ নম্বরে যেতে বোলো। জল্দি যাও!'

মিখা চলে গেল। মুহূর্তপরেই গাবুনিয়া শুনল জোর চিৎকার আর ধাতব কোনো পদার্থের ওপর কোনোকিছু দিয়ে ঘনঘন আঘাত করার আওয়াজ। ঘণ্টার অভাবে ধাতুর একটা খুঁটি সজোরে পিটিয়ে মিখা গলা ছেড়ে সবাইকে হেঁকে বলছে:

'পাঁচ লম্বরে চল! পাঁচ লম্বরে!'

মিনিটখানেকের মধ্যে মিন্‌গ্রেলীয় মজুররা ব্যারাক থেকে ছুটে বেরিয়ে সোজা খালের দিকে ছুটল। বস্তার কাপড়ে মাথা ঢেকে নিয়েছে ওরা সবাই। ছুটতে গিয়ে লিয়ানালতায় পা বেধে যাচ্ছে ওদের, আর দাড়ি কামানোর ব্লেডে কাটার মতো করে বুটজুতোর চামড়া চিরে-চিরে যাচ্ছে। হাতের কোদালগুলো ওদের জঙ্গলের গাছের গুঁড়িতে লেগে বাজছে ঠনঠন করে।

আঁশওয়ালা কুইনিনের দানা একমুঠো জিভের ওপর ঢেলে গাবুনিয়া জল দিয়ে সেগুলো নামাল। তারপর আস্তে-

আস্তে শক্ত খরখরে তেরপলের ওভারঅলটা চড়িয়ে নিল গায়ে। ওর মুখখানা জ্বরের তাড়সে টকটকে রাঙা হয়ে উঠেছে।

জানলা দিয়ে একবার বাইরে তাকাল সে। পশ্চিম থেকে এগিয়ে-আসা একখানা মেঘ প্রকাণ্ড কালো একটা দেয়ালের মতো সূর্যকে আড়াল করে ফেলেছে। মেঘখানার ধার থেকে ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে-পাকিয়ে। নোংরা তুলোর আঁশের মতো দেখতে লাগছে ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলোকে। জঙ্গলটা স্তব্ধ হয়ে আছে। কবরের এই ভয়ংকর স্তব্ধতা গাবুনিয়ার কানে বাজছে মন্দগতি, ভারি রক্তস্রোতের ঢিপঢিপ শব্দের মতো। রগদুটো টিপটিপ করছে ওর।

'এমনটা হচ্ছে নিশ্চয়ই কুইনিনের জন্যে,' ভাবল ও। জ্বরের আবোল-তাবোল ভাবনাগুলোকে মাথা থেকে তাড়াবার জন্যে কপালটা ভালো করে ডলে নিল একবার।

'কীই-বা করার আছে আমাদের? মজুররা হাত লাগিয়ে অর্ধেকটা কাজও করে উঠতে পারবে কিনা সন্দেহ। মিথা ছাড়া অন্য লোকও নেই। আবাশিদ্‌জে গেছে গুলিয়া আর কিছু মজুরকে সঙ্গে নিয়ে নেদোয়ার্দ খাল-বরাবর জলা জায়গাগুলো দেখেশুনে আসতে। মাঝপথে বৃষ্টিতে যদি আটকা পড়ে ওরা, তাহলে ওদেরই দফা নিকেশ হয়ে যাবে।'

পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে রয়ে গেছে মাত্র দু'জন লোক: ও আর মিথা। কিন্তু মিথাটা একনম্বরের কাপুরুষ। যুদ্ধের সময়কার একটা ঘটনার পর থেকে লোকে ওকে বীর বলে মনে করে। 'স্মিথ ও ওয়েসন' মার্কার মরচে-ধরা একটা রিভলবার নিয়ে ও তখন জার্মান যুদ্ধজাহাজ 'গোয়েবেন'এর ওপর গুলি চালিয়েছিল। 'গোয়েবেন' জাহাজখানা এখানকার

বন্দর-এলাকায় ঢুকে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কামান থেকে শহরের ওপর গোলা দাগছিল। ফলে বাজার-এলাকায় হুলুস্থূল পড়ে গিয়েছিল। ওখানেই তখন তামাক বেচছিল মিখা। তাড়াতাড়ি নিজের পকেট থেকে রিভলবারটা টেনে বের করে সাঁজোয়া ক্রুজারটার দিকে সাতবার গুলি ছোঁড়ে তখন মিখা। ওর রিভলবারের বুলেটের পক্ষে অবিশ্যি জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছনো সম্ভব ছিল না, কেননা জাহাজখানা পাড় থেকে একরশি দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। আসলে ভয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিল মিখা। ভেবেছিল, ওইভাবে বুঝি ও আত্মরক্ষা করতে পারবে।

আর নেহাতই দৈবাৎ, কী যেন একটা কারণে, মিখা সাতবার গুলি ছোড়ার পরই ক্রুজারখানা সেদিন কামানদাগা বন্ধ করে বার-সমুদ্রের দিকে চলে যায়। সেদিনের পর থেকেই গোটা পোতি-শহরের লোক মিখাকে মস্ত বীর বলে ধরে নিয়েছে। কিন্তু গাবুনিয়া জানে, মিখা একেবারে ডাহা ভিতুর ডিম, মোটেই নির্ভর করা চলে না ওর ওপর। ও-যে স্টেশন থেকে ঘণ্টাটা চুরি করে আনার প্রস্তাব দিয়েছিল, সেটাও আসলে এই জঙ্গল থেকে পালিয়ে উঁচু জমিতে আশ্রয় নেবার একটা অজুহাত ছাড়া কিছু নয়। ও জানে যে স্টেশন পর্যন্ত নদীর বানের জল উঠবে না।

আর সেই লালচুলো ইংরেজবাচ্চা — সে-ও নির্ঘাত মদ খেয়ে বেহেড হয়েছে শহরে গিয়ে, আর মাটিকাটা-যন্ত্রের খুচরো অংশটা নিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে সেখানে কোথাও।

'আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছি!' হঠাৎ চমকে উঠে ভাবল গাবুনিয়া। ওর মনে হল, নিশ্চয়ই ঘণ্টাখানেক ও কাটিয়ে দিয়েছে নিষ্ক্রিয়ভাবে, ভাবনার জাবর কেটে।

আসলে কিন্তু মিনিটখানেক কি মিনিট-দুয়েকের বেশি সময় ও ভাবনা নিয়ে কাটায় নি।

'প্রথমেই যেতে হবে ওয়র্কশপে। কিন্তু... কিন্তু একটুকরো ব্রোঞ্জ পাই কোথায়?'

দু'পায়ের হাড়ের মধ্যে দিয়ে তীব্র যন্ত্রণার একটা স্রোত বয়ে গেল গাবুনিয়ার, শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে গা-সিরসিরে একটা ভাব ঢেউ খেলিয়ে উঠে এল ওপর দিকে। টলতে-টলতে ও বারান্দাটায় বেরিয়ে এল।

তারপর পশ্চিম দিকে তাকাল। জঙ্গলের ওপরকার আকাশ মাখামাখি হয়ে আছে দুর্ভেদ্য কালোরঙে। গাছগুলো ভয়ে সিটিয়ে ফ্যাকাশে মেরে আছে। অ্যাল্ডার-গাছের পাতাগুলোও বিবর্ণ দেখাচ্ছে কেমন। দূরে — বহুদূরে কোথাও উথালপাথাল জুড়েছে পৃথিবী, আর্ত চিৎকারে ফেটে পড়ছে। অমঙ্গলসূচক একটা গুরুগুরু আওয়াজ ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে কাছে, মনে হচ্ছে যেন সাতটা সমুদ্র ছুটে আসছে কলখিদা এলাকাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। বিদ্যুতের একটা বেপরোয়া তীব্র ঝলক ছুটে এসে বিঁধে গেল জলাগুলোর জলে।

গাবুনিয়ার দাঁতে দাঁত লেগে কিটকিট আওয়াজ উঠতে লাগল। মাথা ঘুরতে শুরু করল ওর। একটা হিমেল ঠাণ্ডা আস্তে, খুব আস্তে মস্তিষ্কে ঢুকতে লাগল। কাঁপুনি ধরছে ওর! এই কাঁপুনিকেই ওর সবচেয়ে বেশি ভয়।

দ্রুত চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসছে অথচ ব্যারাক-বাড়িগুলোয় একটাও বাতি জ্বলছে না। তার মানে, মজুররা সবাই খালপাড়ে চলে গেছে।

ওয়র্কশপের দিকে রওনা দিল গাবুনিয়া। এমন সময় কে যেন ওর নাম ধরে ডাকল। শুনে চারপাশে ঠাহর করে তাকাল

ও। অন্ধকার ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। ফের বাতাস ছেড়েছে জোরে, গাদা-গাদা ধোঁয়াটে মেঘ আর শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে চলেছে তা।

দু'হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরল গাবুনিয়া, জোর করে মাথার কাঁপুনি থামাল। অন্ধকারের মধ্যে ভালো করে এক-নজর তাকিয়ে অবশেষে ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। দেখল, সামনে দাঁড়িয়ে আছে নেভ্স্কায়া। ওর বুটজোড়া লিয়ানালতায় চেরা, বর্ষাতি গেছে ছিঁড়ে। জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছে ও।

'ভয় হচ্ছিল স্টেশন থেকে বুঝি আর এসে পেঁছতে পারব না,' নেভ্স্কায়া বলল। তারপর ছুটে-আসা মেঘের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করে ফের বলল, 'ওদিকে তাকাতে পারছি না পর্যন্ত। দেখলে দেহের রক্ত যেন হিম হয়ে যায়।'

শুনে ক্ষীণভাবে একটু হাসল গাবুনিয়া।

বলল, 'আপনি বরং আমার ঘরে চলে যান। ওই-যে ব্যারাক-বাড়ি দেখছেন ওদিকে, ঘরের মাথায় এরিয়াল উঁচু হয়ে আছে — ওখানে।'

'আপনার তো জ্বর এসেছে দেখছি,' নেভ্স্কায়া বলল। 'ধারে-কাছে আর-যে কাউকে দেখছি না বড়?'

'আর সবাই খালের পাড়ে গেছে। ভয় হচ্ছে খালের বাঁধগুলো না-ধসে পড়ে। মাটিকাটা-যন্ত্রটা অচল হয়ে আছে। একটা খুচরো যন্ত্রের অংশ কিনতে শহরে গিয়ে বোকা সিওমাটা আটকে গেছে সেখানে, অথচ যন্ত্রটা আমাদের খুবই দরকার। যাই হোক, এক মিনিটের মধ্যে আসছি আমি। আপনি কিন্তু এখানে আসার পক্ষে খারাপ সময় বেছেছেন।'

গাবুনিয়া লক্ষ্য করল ওর এই শেষ কথাটা শুনে

নেভ্‌স্কায়ার ঠোঁটদুটো হঠাৎ কেমন শক্ত হয়ে উঠল। বুঝল, মেয়েটিকে ঘা দিয়েছে ও। সত্যি, কতখানি অসময়ে এসে পড়েছে মেয়েটি, কী বোকার মতোই-না কাজ করেছে সে!

'যান, ঘরের ভেতরে যান,' প্রায় চেঁচিয়েই ও বলল নেভ্‌স্কায়াকে। 'ওখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করুন গিয়ে। আমি এখুনি আসছি।'

নেভ্‌স্কায়া ওর কাছ থেকে সরে এল। ভুরুদুটো কুঁচকে উঠেছিল ওর, ঠোঁটদুটো কাঁপছিল। ল্যাকপেকে চেহারার এই ঢ্যাঙা ছোকরা মনে করে কী? আর পাঁচজনের মতো বিপদের সময় নেভ্‌স্কায়াও কাজ করতে পারে না, নাকি? ককেশীয়দের রমণীরঞ্জক এই বীরব্রত কী-যে হাস্যকর কী বলি!

ব্যারাক-বাড়ির কাছটাতে এসে একবার থেমে ও খালটার দিকে তাকাল। চওড়া একটা ফিতের মতো এই খালটা আদ্যিকালের জঙ্গলটার বুক চিরে পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছে। খালের জলে ছায়া পড়েছে পাহাড়প্রমাণ ঘন মেঘস্তূপে-ঢাকা আকাশের।

করুণ বিলাপের সুরে ডাকতে-ডাকতে একটা পাখি মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। এত নিচু দিয়ে উড়ে গেল পাখিটা যে তার ডানা নেভ্‌স্কায়ার কাঁধ ছুঁয়ে গেল প্রায়। পাখিটা উড়ে চলেছে পাহাড়ে, ঝড়ের হাত থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে।

ঘরের ভেতর ঢুকল নেভ্‌স্কায়া। ঘরে নীল আলোর আভা ছড়িয়ে একটা স্পিরিট-ল্যাম্প জ্বলছে। গাবুনিয়ার এই ঘরখানা ভালো করে তাকিয়ে দেখল নেভ্‌স্কায়া। চারিদিকে খালি বই আর বই, একাধিক ব্যারোমিটর, জলায় হাঁটাচলা করার জন্যে একজোড়া ভারি বুট, বেশ কয়েকটা ম্যাপ।

অমসৃণ কাঠের শেল্‌ফের ওপর লেনিনের একটা ব্রোঞ্জের ছোট্ট আবক্ষমূর্তি।

হঠাৎ জানলার একটা পাল্লা হাওয়ার ধাক্কায় সজোরে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল, তারপর ফের খুলে গেল সপাটে। গোটা বন ফিস্‌ফিস আওয়াজ তুলে দুলতে লাগল হাওয়ায়। গাছের মাথাগুলো হাওয়ার ঝাপটায় হেলে পড়ল।

গাবুনিয়া এসে ঘরে ঢুকল এই সময়। স্নায়বিক আক্ষেপে ওর মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠেছে। পাংশু হয়ে উঠেছে গালদুটো। চোখদুটো ধ্বকধ্বক করে জ্বলছে যেন।

'শুনুন,' ঘরে ঢুকেই বলতে শুরু করল ও। কেমন দ্রুত আর অস্পষ্টভাবে জড়িয়ে-জড়িয়ে বলে চলল, 'মাত্র এক শো জন মিন্‌গ্রেলীয় মজুর... বুঝলেন, মাত্র এক শো জন মজুর আর আপনি-আমি — এই ক'জন মাত্র আছি কলখিদার এই গোটা তল্লাটটাকে বানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। আর-একটিও জনপ্রাণী নেই... দশ-বিশ কিলোমিটারের... এমন কি তারও বেশি এলাকার মধ্যে... মাটিকাটা-যন্ত্রটা বিকল হয়ে আছে... আমাদের সম্বল হচ্ছে একমাত্র আমাদের কয়েক-জোড়া হাত। একটুকরো ব্রোঞ্জ পর্যন্ত নেই এ-তল্লাটে। ইংরেজ মাল্লার পক্ষে এখন এখানে এসে পেঁছনো সম্ভব নয়। এদিকে মিনিট-দশেকের মধ্যে বৃষ্টি নামতে চলেছে। তা, আপনি পেরে উঠবেন তো?'

'জ্বরের ঘোরে না-থাকলে এমন প্রশ্ন আপনি আমায় করতেনই না,' নরম সুরে জবাব দিল নেভ্‌স্কায়া। 'ভয় পাবার কী আছে এত? সব ঠিক হয়ে যাবে দেখবেন।'

শুনে গাবুনিয়া তেতো হাসি হাসল।

বলল, 'ভয় পাবার কিছু নেই? বলতেই হয়, আপনার আত্ম-বিশ্বাস ঈর্ষণীয়! ঠিক আছে, চলুন তাহলে যাওয়া যাক!'

হঠাৎ একবার বিদ্যুৎ চমকাল এই সময়। আর সেই ক্ষণিক আলোয় ঝিকিয়ে উঠল কাঠের শেল্‌ফের ওপর রাখা লেনিনের আবক্ষমূর্তি। প্রায়-অদৃশ্য একটুখানি হাসির আভাসে লেনিনের চোখদুটি কুঁচকে উঠেছে। গাব্রুনিয়ার দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন পরিহাসের ছলে।

টেবিলের কানাদুটো চেপে ধরে নিজেকে সামলে নিল গাব্রুনিয়া। ওর মাথাটা ঘুরে উঠেছিল, জ্ঞান হারাবার উপক্রম হয়েছিল প্রায়।

'ওই তো ব্রোঞ্জ!' এত আস্তে, এমন ফ্যাঁসফেঁসে গলায় কথাটা বলল ও যে নেভ্‌স্কায়ার কানে তা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনাল। গাব্রুনিয়া ফের বলল, 'ওই তো ব্রোঞ্জ! ইস, কী বোকাই-না আমি!'

আবক্ষমূর্তিটি তাক থেকে ছিনিয়ে নিল সে, তারপর হেসে উঠল হো-হো করে। নেভ্‌স্কায়া ওর রকমসকম উদ্বিগ্নভাবে লক্ষ্য করছিল। গাব্রুনিয়া পাগল হয়ে গেছে বলেই মনে হচ্ছিল তার।

বাইরে তখন অন্ধকার। জোর হাওয়া দিচ্ছে। টিপটিপ করে হালকা বৃষ্টি নেমেছে। মুষলধারে বৃষ্টির দেখা নেই তখনও।

আবক্ষমূর্তির গায়ে আস্তে আঙুল বোলাতে-বোলাতে গাব্রুনিয়া ধীরে-ধীরে বলল, 'এটাকে গলাতে হবে, ছাঁচে ঢালাই করতে হবে, তারপর মেশিনে যন্ত্রটা বানাতে হবে। তার মানে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় লাগবে। কিন্তু এছাড়া আর কীই-বা করতে পারি আমরা?.. আমার জায়গায় থাকলে উনিও ঠিক এই কাজটিই করতেন।'

'কে ঠিক এই কাজটিই করতেন বলছেন?' কথাটা ধরতে না-পেরে নেভ্‌স্কায়া শুধোল।

কথার উত্তর না-দিয়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল গাবুনিয়া। সোজা ওয়র্কশপে চলে গেল সে। তারপর জ্বলন্ত ফার্নেসের মধ্যে সাবধানে আবক্ষমূর্তিটি ফেলে দিল।

কর্মরত দুই মিন্‌গ্রেলীয় মেকানিক গাবুনিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে অন্যদিকে ফিরে দাঁড়াল। সবকিছু দেখেও চুপ করে রইল তারা। ওদের চিন্তাক্লিষ্ট কপালে ফার্নেসের আগুনের কাঁপা-কাঁপা আলোর আভা এসে পড়ল।

সংক্ষিপ্তভাবে ওদের ওপর নির্দেশ জারি করল গাবুনিয়া। যাই ঘটুক-না কেন, যন্ত্রাংশটি বানিয়ে ফেলতে হবে এবং মাটিকাটা-যন্ত্রে তা লাগাতে হবে।

'আচ্ছা!' জ্যেষ্ঠ মেকানিকটি মাথা নেড়ে বলল। 'আমরা এয়ার ভার লিয়ে লিলাম, কমরেড। আপনে চিন্তা করবেন না!'

আর যেন মেকানিকটির এই কথার কলটেপায় ছাড়া পেয়ে মুষলধারে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। জলপ্রপাতের চাপা গর্জনে মুখর, আকাশ থেকে ঝুলিয়ে-দেয়া মস্ত একখানা চাদরের মতো একটানা অবিরল বৃষ্টি। দশ-পা দূরেও কিছু দেখা যায় না এমন প্রবল বর্ষণ।

নেভ্‌স্কায়াকে সঙ্গে নিতে হবে বলে গাবুনিয়া এবার ফিরে নিজের ব্যারাকের দিকে চলল, ঈষদুষ্ণ, সজোর বৃষ্টির জলে প্রবলভাবে ভিজতে-ভিজতে, প্রায় হাবুডুবু খেতে-খেতে। পায়ের নিচে ভিজে এঁটেল মাটি পেছল হয়ে উঠেছে তখন। আক্রোশে গাবুনিয়া শাপ-শাপান্ত করতে লাগল। ওর মনে হল, গোটা কৃষ্ণসাগরটাই যেন আকাশে উঠে গেছে, আর এখন পৃথিবীর ওপর তা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়বে চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাত ধরে।

গাব্রিনিয়ার জন্যে অপেক্ষা করে বসে ছিল নেভ্স্কায়া। ব্যারাকের ছাদে বৃষ্টির ঝমঝম আওয়াজ চলছিল একটানা, জানলার কাচের গা বেয়ে বাইরে কালিগোলা জলের প্রচণ্ড স্রোত নামছিল।

নেভ্স্কায়া তেলের কুপিটা জ্বালল। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল হঠাৎ। টেলিফোন ধরতে রিসিভরে কার যেন উত্তেজিত গলা শোনা গেল:

'কুয়ালোনি থেকে বলচি। পাহাড় থেকে ঢল নাবতে শুরু করেচে। জলের তোড় সাংঘাতিক। পাঁচ লম্বর খালপাড়ে আপনেদের নোকজন গ্যাচে কী?'

'হ্যাঁ, গ্যাছে!' চিৎকার করে জবাব দিল নেভ্স্কায়া।

কিন্তু ওদিক থেকে আর কোনো সাড়া এল না।

রিসিভর যথাস্থানে ঝুলিয়ে রাখল ও। ওই মুহূর্তে নেভ্স্কায়া পরিষ্কার বুঝতে পারল যে ওরা — গাব্রিনিয়া, তার কর্মীর দল আর ও নিজে — বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মুষ্টিমেয় জনাকয়েক ওরা হারিয়ে গেছে বাদা আর জঙ্গলে পরিবৃত অবস্থায়। আর-কোনো সাহায্যই এসে পেঁছনোর সম্ভাবনা নেই।

ঝড়ের প্রকোপ ক্রমশ বাড়তে লাগল, ক্রমশ উদ্দাম হয়ে উঠতে লাগল ঝড়। আর তার আওয়াজ ক্রমে গাঢ় গভীর হয়ে এল। থেকে-থেকে খালি মেঘের স্তূপ চমকে-চমকে উঠতে লাগল বিদ্যুতের করালদর্শন আলোয়, তারপর মেঘের গুরুগুর ডাক গড়িয়ে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়তে লাগল পাহাড়গুলোর চুড়োয়।

খালের পঞ্চম অংশে গিয়ে পেঁছতে গাব্রিনিয়া আর নেভ্স্কায়ার আধঘণ্টা সময় লাগল।

কালিঢালা অন্ধকার সেখানে। ঝড়ের তর্জন আর কর্মীদের

প্রবল চিৎকারে জায়গাটা গমগম করছে। একটিও লণ্ঠন নেই কারও কাছে। মাটিকাটা-যন্ত্রটায় অবশ্য একটা সার্চলাইট বসানো আছে, কিন্তু যন্ত্রটা বিকল হয়ে পড়ে আছে।

স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কাজ করছে সবাই। ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে-ফেলতে আর নাকে-মুখে ঢোকা জল কুলকুচো করে ফেলতে-ফেলতে সবাই কোদাল-কুড়ুল নিয়ে কাজ করে চলেছে এমনভাবে যেন শত্রুর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মুখে একদল সৈন্য পরিখা খুঁড়ে চলেছে। জায়গাটায় যেন আর কিছু নেই, মাটি নেই, বাতাস নেই, আকাশ নেই, জঙ্গল নেই — আছে শুধু পিচ্ছিল, জগৎসৃষ্টির আগেকার আদিম সেই পিণ্ডাবস্থা।

খালের জল প্রচণ্ড গর্জনে ছুটে চলেছে। হাতের ফ্ল্যাশলাইটটা জেবলে গাবুনিয়া খালের মাটিতে-পোঁতা জলের উচ্চতা মাপার কাঠিটার ওপর আলো ফেলল। দেখা গেল, ঘোলা জলের প্রচণ্ড বড়-বড় ঢেউ তুলে ছুটে চলেছে স্রোত। আর তার সঙ্গে ছুটে চলেছে গাছের ভাঙা ডালপালা, ওপড়ানো কাণ্ড।

'মিখা!' চেঁচিয়ে বলল গাবুনিয়া, 'কী হারে জল বাড়ছে?'

'মিনিটে দুই সেন্টিমিটার, দোস্ত্,' অন্ধকারে কোথা থেকে যেন সাড়া দিল মিখা। তারপর খালের পাড়-বরাবর ফ্ল্যাশলাইটের ক্ষীণ আলো ফেলল।

দেখা গেল, জল বেড়ে বাঁধের মাথা থেকে মাত্র দু'মিটার নিচে পৌঁছেছে।

মনে-মনে ব্যাপারটা হিসেব করে ফেলল গাবুনিয়া। তার মানে আর ঘণ্টা-দেড়েক। তার পরই পাঁচ নম্বর খালপাড়ে জল বাঁধের মাথা ছাপিয়ে উপছে পড়বে, বাঁধ ভেঙে ভাসিয়ে নেবে, তারপর ছড়িয়ে পড়বে আশপাশের জঙ্গলে। কলাখিদার

যে-অঞ্চল হর্‌গা নামে পরিচিত সেই গোটা তল্লাটটাই ময়লা জলে প্লাবিত একটা হ্রদে পরিণত করবে তারপর।

অবিশ্যি বৃষ্টি যদি আরও জোরে না-নামে তবেই এই দেড় ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে!

ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছিল গাব্‌নিয়া। ওর তেরপলের কোটের গা বেয়ে বৃষ্টির জলের স্রোত হুড়হুড় করে নেমে কলকল করে ঢুকে যাচ্ছিল বুটজোড়ার মধ্যে। মাথার ক্যাপটা টেনে খুলে ফেলে ও কাদার মধ্যে ছুড়ে ফেলল। ভিজে জবজবে হয়ে ক্যাপটা ওর মাথায় ভারি ইটের মতো চেপে বসেছিল।

সময়ের কোনো হুঁশ ছিল না নেভ্‌স্কায়ার। একমাত্র খালের জলে অদ্ভুত একটা গুমগুম আর হিসহিস আওয়াজ কানে যেতে ও সংবিত ফিরে পেল। একইরকম অদম্য উত্তেজনার বশে চারপাশের কর্মরত মজুরদের মতো ও-ও সমানে কোদালে করে মাটি তুলে বাঁধের মাথায় ছুড়ে-ছুড়ে ফেলছিল। চুলের গোছাটা খুলে গিয়ে বারবার মুখের ওপর চুলগুলো ছড়িয়ে পড়ায় নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল ওর। কাদামাখা হাত দিয়েই তাই ও চুলগুলো পেছনদিকে তুলে দিল। আঠালো কাদায় চুলগুলো সেঁটে রইল এরপর, ফলে অন্তত কিছুক্ষণ কাজের সুবিধে হল।

এবার ওর কানে এল মজুরদের ফোঁসফোঁস নিশ্বাসের শব্দ, কোদালের ঝনঝন আওয়াজ আর ধপধপ করে ভিজে মাটির চাঙড় আছড়ে পড়ার শব্দ। মিখার চিৎকার আর গাবুনিয়ার গম্ভীর গলার নির্দেশগুলোও শুনতে লাগল ও। কখনও-কখনও জোর বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপটা সোজা এসে নেভ্‌স্কায়ার গায়ে বাড়ি মারতে লাগল, আর হঠাৎ একসময় পা পিছলে তরল কাদার মধ্যে ও ধুপ করে পড়ে গেল।

জল এসে বাঁধের গা কুরে-কুরে খেতে লাগল। একসময় মনে হল, সবই বুঝি বৃথা গেল, বাঁধ আর রক্ষা করা গেল না।

আর হঠাৎ এই সময় খালের জলে সেই অশুভ মুখে-ফেনা-তোলা হিস্‌হিস শব্দ শোনা গেল। জলমাপার ডাণ্ডাটার ওপর ফের আলো ফেলল গাবুনিয়া। দেখা গেল, ফেনিয়ে-ওঠা জল দারুণভাবে ফেঁপে-ফুলে উঠছে।

'গাছের জাঙালে জল বেধে গ্যাছে!' চিৎকার করে বলল গাবুনিয়া।

বলেই নিচে যেখানে নৌকোটা বাঁধা সেইদিকে বাঁধের কাদামাখা ঢাল বেয়ে পায়ে ভর দিয়ে সোজা পিছলে নেমে গেল সে। উত্তরাঞ্চলের বাচ্চা ছেলেরা যেমন করে তুষারস্তূপের গা বেয়ে গড়িয়ে নামে ঠিক সেইভাবে। ওর পিছুপিছু ওইভাবে নেমে গেল মিখা আর জনাকয়েক মজুরও।

'কুড়ুল চাই, কুড়ুল!' চেঁচিয়ে বলল গাবুনিয়া।

এদিকে মিন্‌গ্রেলীয়রা কাজ করে চলেছে সমানে, না থেমে। দেখতে-দেখতে নৌকোর বাঁধন কেটে দেয়া হল। অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল নৌকোখানা।

আর উন্মত্তের মতো কোদালে করে মাটির চাপড়া ফেলতে-ফেলতে নেভ্‌স্কায়া বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আহ্‌, যদি সময়ে কাজটা করতে পারে ওরা! যদি পারে!'

তবু জল সমানে বাড়তে লাগল। অস্পষ্টভাবে একবার বিদ্যুৎ চমকানোয় অন্ধকার দূর হল মুহূর্তের জন্যে।

আর সেই আলোয় নেভ্‌স্কায়ার চোখে পড়ল আকাশ থেকে ঝরে-পড়া পাঁশুটেরঙের প্রলয়ঙ্কর জলের ধারা, কাদামাখা, গোড়ালি পর্যন্ত জলে পা ডুবিয়ে কর্মরত মজুররা, আর বাঁধের গা-খোবলানো হিংস্র জলের সহস্র ফণা। ওর মনে

হল, বাঁধের মাথা উপচে কয়েক জায়গায় ও যেন জল গড়িয়ে পড়তেও দেখল।

সমুদ্র থেকে পাহাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল মেঘের একটানা গুরুগুরু শব্দ। গোটা আকাশ কাঁপিয়ে দিল সেই শব্দ। এবার আরও জোরে বৃষ্টি নামল। অনেক দূরে কোথায় যেন মজুররা হঠাৎ একসঙ্গে হল্লা তুলল। আঠালো কাদায় সজোরে পা ছপছপ করতে-করতে কালোমতো একটা ছায়া দৌড়ে গেল ওর পাশ দিয়ে। নেভ্‌স্কায়ার ঠিক পাশেই কাজ করছিল অল্পবয়সী একটি ছেলে, সে হঠাৎ হাতের কোদালখানা ফেলে দিয়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

'নোকটা ভেসে গেল গো! চেষ্টা করে কোনও নাভ নাই!' কে যেন ভোঁতাগলায় হেঁকে বলল।

বাঁধের নিচে খালের মধ্যে কুড়ুলের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। গাবুনিয়া আর তার লোকজন গাছের গুঁড়ির জাঙাল কেটে ফেঁপে-ওঠা জল ছেড়ে দেবার চেষ্টা করছে।

'কী হয়েছে, ভাই?' চেঁচিয়ে শুধোল নেভ্‌স্কায়া।

'কে একজনা জলে পড়ে গ্যাচে,' ভাঙা-ভাঙা রুশভাষায় কে একজন জবাব দিল। 'নোকটা ভেসে গেল, কী আর করা! তা, তুমি কাজ করে যাও, মেয়ে। কথাবলার সময় লাই. এখন!'

মরার সময়কার খাবি খাওয়ার মতো করে জোরে-জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে লোকজন। ওদের কোদালে এঁটেল মাটি আটকে থাকছে আঠার মতো। নেভ্‌স্কায়ার মাথা ঘুরতে শুরু করল।

এমন সময় গাবুনিয়ার গলা শুনতে পেল ও। যাক, গাবুনিয়া তাহলে ফিরে এসেছে। খুশি-খুশি গলায় মজুরদের সঙ্গে কথা বলছে সে, এমন কি ঠাট্টা-তামাশা পর্যন্ত

করছে! আটকে-যাওয়া খালের জল ছেড়ে দেয়া গেছে, কিন্তু খালের জল বাড়া তাবলে বন্ধ হয় নি।

বাঁধের মাথায় উঠে গেল গাবুনিয়া। বাঁধের কানা থেকে মাত্র কুড়ি সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে জল ছুটেছে। কান পেতে বৃষ্টির শব্দ শুনল সে, বৃষ্টি হালকা হয়ে আসছে কিনা তা বোঝার আশায়। কিন্তু দেখা গেল, বৃষ্টি যে-জোরে পড়ছিল এখনও তাই পড়ছে।

আস্তে-আস্তে বাঁধের মাথা ধরে হাঁটতে লাগল গাবুনিয়া। হঠাৎ টের পেল ওর পায়ের নিচে ছোট্ট একটা খোঁদল রয়েছে। ওই খোঁদলের মধ্যে দিয়ে জল ঢুকছে। সঙ্গে সঙ্গে এই একটামাত্র চিন্তা গাবুনিয়ার মনকে অধিকার করে বসল: এই, এই হল গিয়ে সেই জায়গা যেখানে বাঁধটা ধসে পড়বে!

'খবরদার!' চিৎকার করে উঠল ও। 'মিখা! সবাইকে এখানে ডাকো! শিগগির, শিগগির!'

মিখা ছুটে এল। তারপর রিভলবারের মুখ ওপরদিকে করে গুলি ছুড়ল একটা। এটা হল জরুরি অবস্থায় তলবের সংকেত। সঙ্গে সঙ্গে মজুররা যে-যেখানে ছিল ছুটে গাবুনিয়ার কাছে আসতে লাগল। পথ-আটকে-দাঁড়ানো পায়ে-পায়ে জড়িয়ে-যাওয়া লিয়ানালতাগুলোকে হাতের কোদাল দিয়ে সজোরে কাটতে-কাটতে এল তারা।

অদৃশ্য সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গাবুনিয়া। ঝড়টা উঠেছিল ওইদিক থেকেই। দাঁতে-দাঁত চেপে অন্ধকারের মধ্যেই ঘুষি বাগিয়ে সে সমুদ্রকে শাসাতে লাগল।

বলল, 'তোকে আমি রুখবই, শয়তান কাঁহাকা! এখনও সময় যায় নি।' বলে হো-হো করে হেসে উঠল। ম্যালেরিয়া-জ্বরের প্রকোপে ওর মাথাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল।

প্রায় প্রলাপ বকার মতো অবস্থায় পৌঁছেছিল ও।

মজুররা দ্রুত খোঁদলটা মাটি দিয়ে ভরে তুলল। কয়েক পা দূর থেকে মিখা আগের মতো ফের গুলি ছুড়ল একটা। দ্বিতীয় আরেকটা ফাটল চোখে পড়েছে ওর। এটা আগেরটার চেয়েও বেশি গভীর।

'নাঃ, কিস্‌সু লাভ নেই!' চটচটে কাদা থেকে পা-দুটো টেনে তোলার চেষ্টা করতে-করতে গাবুনিয়া বিড়বিড়িয়ে বলল। ও আর হাঁটতে পারছিল না। একবার টলমল করে উঠে তরল কাদার মধ্যে এবার সজোরে আছড়ে পড়ল। দু'হাতে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল একবার। কিন্তু হাতদুটো পিছলে গেল, উঠতে পারল না। শেষ শক্তিটুকু নিয়োগ করে প্রাণপণ চেষ্টায় তবু একবার কাদার শয্যা ছেড়ে টেনে তুলল নিজেকে। কিন্তু পাদুটো আর বশ মানছিল না। ফের মাটির ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে গাল দিল একটা। খালের মধ্যে জল যেমন করে ভাসন্ত ডালপালাগুলোকে এদিক-ওদিক নাচিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল, তেমনি করে জ্বরের তাড়স ওর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। ছটফট করছিল গাবুনিয়া।

'ওদের সবাইকে ম্যালেরিয়ায় ধরেছে... ওরা হল গিয়ে বীর,' চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করছিল ও। 'মিখাও আমাকে ঠকায় নি...।'

তৃতীয় একটা গুলির আওয়াজ কানে এল ওর। কে যেন যেতে গিয়ে ওর গায়ে পা বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল। ওর মনে হল, বোধহয় নেভ্‌স্কায়া। ঘড়ঘড় শব্দে খাবি খাওয়ার মতো করে নিশ্বাস নিচ্ছিল ও। মুখের ভেতরটা ভরে উঠেছিল কাদায় আর ময়লা জলে। এমন সময় কে যেন ওকে ধরে তুলে বসিয়ে দিল। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড সোরগোল

কানে এল। বহু লোক ভসভস শব্দে কাদা মাড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে শুনতে পেল। বাঁধটা বোধহয় ধসে গেল, নির্বিকারচিত্তে ও ভাবল। আর কী, এখন আঠালো কাদা ওকে মাটির মধ্যে টেনে নেবে, ওর ওপর দিয়ে বয়ে যাবে জল।

হঠাৎ একবার চোখ খুলেই ভয়ঙ্কর চমকে উঠল ও। দেখল, জঙ্গলের দিক থেকে চোখ-ধাঁধানো ঝলমলে শাদা একটা তারা ওর দিকে এগিয়ে আসছে, আর শোনা যাচ্ছে লোহার ভারি কোনো বস্তুর ঝনঝন-ঝমঝম শব্দ।

আরে, এ-যে সার্চলাইটের আলো!

টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল গাবুনিয়া। যে-কোমল দুটি হাত উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল তাকে তার দিকেও হুঁশ ছিল না। ঝলমলে তারাটার দিকে তাকিয়ে থেকে চোখে জল এসে গেল তার। কিন্তু সেজন্যে লজ্জা পেল না। ম্যালেরিয়ার জ্বর আর এই খ্যাপাটে রাতটা গাবুনিয়ার দেহমনের সবটুকু শক্তি শুষে নিয়েছিল। তাছাড়া মুখখানা কাদায় মাখামাখি হয়ে থাকায় কেই-বা তার চোখের জল লক্ষ্য করবে, ভাবল ও!..

মাটিকাটা-যন্ত্রটা দ্রুত গুঁড়ি মেরে খালের পঞ্চম অংশের দিকে চলল। ক্যাটারপিলার-চাকায় বড়-বড় তাল-তাল মাটি ঠেলে নিয়ে চলল তা। চেইনের ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে আর একসার ভারি কামান টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো মাটি-কাঁপানো গুমগুম শব্দে যন্ত্রটা এগিয়ে চলল। চোখধাঁধানো ঝলমলে সার্চলাইটের আলো আকাশকে বিঁধে ছড়িয়ে পড়ল বহুদূর। স্টিম ছাড়ার হিস্‌হিস শব্দ আর যন্ত্রের শক্তিপ্রয়োগের প্রচণ্ড আওয়াজ মুখর করে তুলল জায়গাটাকে।

পথ ছেড়ে মজুররা সরে দাঁড়াল। খোদাইয়ের প্রকাণ্ড শুঁড়টা দ্রুত মাথার ওপর উঠে মস্ত ভারি একবোঝা মাটি ঢেলে দিল যথাস্থানে। বাঁধের ফাটলও গেল বন্ধ হয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে মজুরদের আনন্দের চিৎকারে ঝড়ের গর্জনও যেন চাপা পড়ে গেল।

গাবুনিয়া দেখতে পেল উঁচু-করা হাতের অরণ্য, ফুলের মতো ফ্যাকাশে মুখের শোভা আর অজস্র জলঝরা তেরপলের ছেঁড়াখোঁড়া যতসব কোট। বুড়ো এক মিন্‌গ্রেলীয়কে কাঁপা-কাঁপা হাত দুখানা বাড়িয়ে দিতে দেখল যন্ত্রটার দিকে। এমন সময় তার নজরে পড়ল সিওমা বসে আছে মাটিকাটা-যন্ত্রটার ওপর — কোমর পর্যন্ত উদ্‌লা গা, দাঁতে-দাঁত চাপা, বুকের ওপরকার ঘননীল তিনটে জড়ুলের দাগকে আড়াআড়ি কেটে রেখেছে একটা রক্তাক্ত ক্ষত। যন্ত্রের লিভারগুলো ধরে টানাটানি করার সময় এত গায়ের জোর লাগছে যে সিওমার মাংসপেশীগুলো ফুলে-ফুলে উঠছে। মুখখানাও এর এত বদলে গেছে যে চেনা যায় না: গালদুটো ফ্যাকাশে মেরে গেছে, উঁচু হনুর ওপরকার চামড়া টানটান হয়ে উঠেছে, সরু-সরু হয়ে চোখদুটো পরিণত হয়েছে চেরা দুটো রেখায়।

এক মুহূর্তের জন্যে লিভার থেকে হাত সরিয়ে জনতার দিকে হাত নাড়ল সিওমা। একটুও না-হেসে ইংরেজিতে চেঁচিয়ে বলল সে:

'হ্যাল্লো! ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, খেলা জমে উঠেচে!'

মজুররা আবার কোদাল চালাতে শুরু করল। নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হয়ে গেল আবার।

মিন্‌গ্রেলীয় মেকানিকটি মাটিকাটা-যন্ত্রের ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে গাবুনিয়ার কাছে এল।

বলল, 'ইংরেজের পো আমাদের তাক নাগিয়ে দেচে। খ্যাপা

শেয়ালের মতন জঙ্গল থেকে ছুটে বেইরে যন্তরটা চালু করে তোলল। মাইরি, দোস্ত্, কেমন করে যে ও এসে পৌঁছুল এখেনে তা ভগাই জানে! আদ্ধেক ন্যাংটো হয়ে, সারা গা রক্তে-মাখামাখি করে এয়েচে ও!'

শুনে গাবুনিয়া পরম সুখে হাসল। আর তখনই, একেবারে হঠাৎ — ও শুনল চারিদিক সুম্‌সাম। কারণটা বোঝার আগে নৈঃশব্দ্যটাই কানে বাজল ওর।

আসলে, ইতিমধ্যে বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। ভৌতিক একটা স্তব্ধতা ঝুলে ছিল জঙ্গলটার ওপর।

ফের টলে পড়ল গাবুনিয়া, তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

শেষ প্লাবন

বন্দরের বেতার-কেন্দ্রে শাদা ঘষাকাচের আলোর বাল্‌বগুলো জ্বলছে। বেতার-যন্ত্রটায় ঝিঁঝিঁপোকার ডাকের মতো আওয়াজ উঠছে একটা। রেডিও-অপারেটর ভুরু কোঁচকাল, বিরক্তিতে কাঁধদুটো কুঁচকে উঠল একটু। বাতুমি শহরের বন্দর-প্রধানের কাছে একটা জরুরি খবর বেতারযোগে পাঠাচ্ছে ও। খবরটাতে বলা হয়েছে:

'রিওন আর কাপার্‌চা নদী কূল ছাপিয়ে উঠেছে। দুই নদীর জল মিলেমিশে একাকার হয়ে শহর ভাসিয়ে দিয়েছে। বন্দর-অঞ্চলেই কেবল জল ওঠে নি। ক্রমশ বেড়ে চলেছে জল। শহরের রাস্তায় জল এখন প্রায় এক-মিটার উঁচু হয়ে উঠেছে। জনসাধারণকে উদ্ধারের জন্যে ত্রাণকার্য চালাতে অবিলম্বে জাহাজ আর গাদাবোট পাঠান।'

আপনমনে কাঁধ-ঝাঁকানি দিলেন চোপ। বাইরে প্রচণ্ড

ঝড় বইছে। সমুদ্রের কালো-কালো ঢেউ সজোরে আছড়ে পড়ছে জেটির ওপর, বন্দরে নোঙর-করা গ্রীক স্টিমারখানাকে আছাড় মেরে নাচাচ্ছে যেন। গুদামঘরগুলোর ঢেউখেলানো টিনের ছাদে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি মেশিনগানের গুলির মতো আওয়াজ তুলছে।

চোপ ভাবছেন, এমন দুর্যোগে কোন স্টিমার বাতুমি থেকে পোতিতে পাড়ি জমাতে সাহস করবে? বন্দর-প্রধান কী ধরনের গাদাবোট এখানে পাঠানোর কথা ভাবতে পারেন? এমন ঝড়ে সমুদ্রগামী জাহাজ পর্যন্ত সমুদ্রে পাড়ি দিতে ভরসা পায় না।

চোপের মেজাজ বিগড়ে গেছে একেবারে। দিনটা তাঁর মাথাখারাপ করে দেয়ার মতো ঝামেলায় কেটেছে। সকাল থেকে ক্রিস্তফোরিদির টিকিটি দেখা যায় নি, এদিকে ইয়োলচ্কা একা রয়েছে বাড়িতে। বাচ্চাকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে চোপ ওর হাতে একখানা গল্পের বই ধরিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু ভালো করেই বুঝেছেন যে ও মোটেই বই পড়ছে না। প্রথমে ভয় পেয়েছে মেয়েটি, আর তারপর থেকে মাঝে-মাঝেই কাঁদছে। ওর কথা ভেবে ক্যাপ্টেন নিজেই ভয়ে শিউরে উঠেছেন। বাচ্চা তো ভয় পাবেই, ওর আর দোষ কী! জানলার ঠিক বাইরেই প্রকৃতি যা তাণ্ডব শুরু করেছে! আর সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ আরেকটু নাগাল বাড়ালেই তো পেয়ে যাবে ওঁর ওই বাড়ি।

ক্রিস্তফোরিদির কথা মনে হওয়ায় ক্যাপ্টেন ভাবলেন, 'দাঁড়া, খুদে শয়তান! তোকে একবার হাতে পেয়ে নি! মজাখানা যা টের পাওয়াব না!' ফের দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন ক্যাপ্টেন। খোদ শয়তানের লীলাখেলার দিন আজ! বেতার-কেন্দ্রে আসার পথে ওঁর চোখে গোটা দুই সাপ পড়েছে।

বন্যার তাড়া খেয়ে সাপদুটো পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে জাহাজঘাটায়। আকরিক ম্যাঙ্গানিজের গাদার মধ্যে লুকিয়ে আছে ওদু'টো।

বুকে-হাঁটা আর হামাগুড়ি-দেয়া সব প্রাণীর প্রতিই চোপের কেমন একটা গা-ঘিনঘিন-করা ভাব আছে। বিশেষ করে সাপ আর ব্যাঙ হলে তো কথাই নেই। বান-জাতীয় মিনোগা-মাছের আচার এমন কি চোখে দেখলেও সইতে পারেন না। চোপ ভাবলেন, বানের ঠেলায় বাদা থেকে এবার না বুনো শুয়োরের পাল বন্দরে এসে হানা দেয়!

খবর পাঠানো হয়ে গেলে অপারেটর শুধোল, 'কত্তার ভাবসাব কেমন দেখলেন? ঘাবড়ে গ্যাচেন নাকি খুব?'

'না, তিনি ঠিকই আছেন,' জবাব দিলেন চোপ। 'মনের জোর বেশ বজায় আছে।'

আরও একটা ঝামেলা পোহাতে হয়েছে এদিন চোপকে। বিকেলবেলা কমলালেবু-বোঝাই একখানা বজরা বন্দরের পাড়ের কাছে ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বজরায় ছিল মাত্র একজন মাঝি — এক বুড়ো তুর্কি। তাকে সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু তুর্কি বুড়ো ছিল মহা বদমেজাজী, তার ওপর বিপদে পড়ে তার মাথা গিয়েছিল আরও বিগড়ে। সে এই বলে মহা হৈচৈ বাধিয়ে দিল যে চোপকে নৌকো পাঠিয়ে তখনই কমলালেবুগুলো জল থেকে উদ্ধার করে দিতে হবে। লেবুগুলো তখন গোটা বন্দর-এলাকা জুড়ে ঢেউয়ের তালে-তালে নেচে বেড়াচ্ছে। কিন্তু বুড়ো কোনো কথা শুনতে রাজি হচ্ছিল না, চোপকে সে শাসাচ্ছিল তার এই ক্ষতির জন্যে তাঁকে আদালতে সোপর্দ করবে বলে।

এদিকে গ্রীক স্টিমারটার মাল্লারা লম্বা-লম্বা দড়ির মাথায়

বালতি বেঁধে জলে নামিয়ে কমলালেবুগুলো তোলবার ধান্দায় ছিল। ওদের স্টিমারখানাকে দেখে চোপের মনে পড়ে যাচ্ছিল ভাসন্ত সরাইখানার কথা, এত নোংরা আর ভেড়ার মাংস আর কফির বোটকা গন্ধে এমনই ভরভর করছিল জাহাজখানা। আর ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজখানার নোংরা আর বুটজুতোয় গাদাগাদি-ঠাসা ডেকটা খালি ওপরে-নিচে দুলছিল।

সাধারণভাবেই গ্রীক জাহাজগুলো ভারি অপছন্দ করেন চোপ। এর একটা কারণ জাহাজগুলো ভারি নোংরা হয়, আরেকটা কারণ মাল্লাদের যত রকমের বেখাপ্পা আর বেয়াড়া ধরনের রঙের মিশেল দেয়ার ব্যাপারে অসম্ভব একটা ঝোঁক। যেমন, জাহাজের ধোঁয়া বেরনোর বড় চিম্‌নিটার রঙ যদি হয় আকাশী-নীল, তাহলে তার ওপর প্রকাণ্ড একটা টকটকে লালরঙের গোলাপফুলের ছবি, কিংবা হয়তো পুরো একসারি গোলাপের একটা মালার ছবিই এঁকে রেখে দেবে তারা। যাই হোক-না কেন, গ্রীক জাহাজের চিম্‌নিগুলোর গায়ে কিছু-না-কিছু রঙ-বেরঙের চকরাবকরা নক্‌শা থাকবেই থাকবে। একমাত্র গ্রীক মদনদেবতার ছবিই সেখানে আঁকা থাকে না এই-যা। এসব দেখে-দেখে চোপ মর্মান্তিক খেপে গেছেন! ওরা কি মাল্লা? জাহাজের নাবিক? না লেমনেড বিক্রি ওয়ালা!

টেলিফোন বেজে উঠল। চোপ রিসিভার ধরলেন। ম্যাঙ্গানিজ খালাসের জেটি থেকে রিপোর্ট করছে কেউ। প্রধান বাঁধের প্রান্তে যেখানে সমুদ্রের ঢেউ বাঁধ ছাপিয়ে বাঘের মতো অনায়াসে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে সেখানে বসানো বাতিঘরের চোখ-পিটপিট-করা আলোর সংকেত আর দেখা যাচ্ছে না।

ইউনিফর্মের কালো কোটটা গায়ে চাপিয়ে বাইরে বেরোলেন চোপ। হাজারো ঝামেলার কী আর অন্ত আছে তাঁর? এখন এই রাত্তিরে যদি কোনো অবুঝ জাহাজ ঝড়ের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে বন্দরে ঢোকার চেষ্টা করে, তাহলে? বাতিঘর কাজ না-করলে সে-জাহাজের পথ হারিয়ে পাহাড়ে গিয়ে ধাক্কা খেতে কতক্ষণ!

কিন্তু এখন ওই বাতি মেরামত করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। যে-কোনো নৌকো ওই জেটিতে ভেড়বার চেষ্টা করলে প্রথম ঢেউয়ের ধাক্কাতেই কুপোকাত হয়ে যাবে।

জেটির প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালেন চোপ। দেখলেন, বাতিঘরের আলো জ্বলছে। কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করতে থাকলেন আলোটাকে। হঠাৎ একসময় আলোটা নিবে গেল, তারপর পাঁচ মিনিটেরও বেশি হয়ে গেল তবু দেখা গেল আলোটা ফের জ্বলে উঠছে না। অথচ পরপর দু'বার জ্বলার মধ্যে ফারাকটা দশ সেকেন্ডের বেশি হওয়া উচিত নয়। অতএব বোঝাই যাচ্ছে, যন্ত্রটায় কিছু-একটা গোলমাল হচ্ছে।

এরপর ফের জ্বলে উঠল আলোটা, ঠিক যেমনভাবে জ্বলা উচিত তেমনি। তারপর আবার নিবে গেল, আর বেশ কিছুক্ষণ নিবে রইল। ব্যাপার কী, কোন শয়তানের কারসাজি এটা?

বাইনোকুলর চোখে তুলে চোপ দেখলেন আলোটার ঠিক নিচে রেলিঙওয়ালা প্ল্যাটফর্মের ওপর মানুষের একটা মূর্তি গুড়ি মেরে বসে আছে।

মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল চোপের। গোটা বন্দরটা গোল্লায় যেতে বসেছে! বাতিঘরের ওপর হতভাগা লোকটা উঠে বসে করছে কী? এর একটাই কারণ থাকতে পারে: লোকটা নিশ্চয়ই কোনো একটা মতলবে জেটির ওই প্রান্তে

গিয়েছিল, তারপর কোনো-কিছু ব্যাপারে এতই ব্যস্ত হয়ে ছিল যে ('আশ্চয্য ব্যাপার, এই ঝড়ের মধ্যে মশগুল হয়ে রইবার মতো জেটির ও-মাথায় কী পেল লোকটা?' ভাবলেন চোপ।) সমুদ্র-যে উথালপাথাল জুড়েছে তা তার নজরেই পড়ে নি। আর তারপর যখন সে ফেরার চেষ্টা করেছে তখন দেখেছে জেটির পাটাতনের ওপর দিয়ে জলের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, পাড়ে নামার পথ বন্ধ। তাই শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে লোহার সিঁড়ি বেয়ে সে গিয়ে ঠেলে উঠেছে বাতিঘরের প্ল্যাটফর্মের ওপর। কারণ, অত উঁচুতে ঢেউ পোঁছতে পারে না। প্ল্যাটফর্মের ওপরের মূর্তিটাকে ভারি পুঁচকে দেখাচ্ছে, একেবারে বামনের মতো খুদ্দুর।

'শয়তানটা কে হতে পারে?' বিড়বিড় করে বললেন চোপ। 'গাধাটা কী জাহাজডুবি না-করিয়ে ছাড়বে না মনে ভেবেছে নাকি? বন্দরের পক্ষে এ তো লজ্জার কথা!'

যাই হোক-না কেন, লোকটাকে ওখান থেকে নামিয়ে আনতেই হয়!

বন্দরে তখন মাত্র দু'খানা হালকা দাঁড়টানা নৌকো রয়ে গেছে। বাকি সব নৌকো পাঠানো হয়েছে শহরে লোকজনকে উদ্ধারের জন্যে। ওই দু'খানার মধ্যে একখানা নৌকো নিয়ে বাতিঘরের দিকে রওনা দিলেন চোপ। দু'জন মাল্লাকেও সঙ্গে নিলেন, দাঁড় বাইতে লাগল তারা। আর যাওয়ার পথে আগাগোড়া 'সব্বোনেশে, মুখে-আগুন ককেশাস'কে বাপান্ত করতে-করতে চললেন। এদেশে বৃষ্টিরও শেষ নেই যেমন, তেমনি কাজের ঝামেলারও অন্ত নেই।

প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাট পুইয়ে তবে নৌকোখানাকে বাতিঘরের ধারে ভেড়ানো সম্ভব হল। আর ক্যাপ্টেন নেমে গিয়ে খ্যাপার মতো শাপ-শাপান্ত করতে-করতে প্ল্যাটফর্মের ওপর থেকে

ক্রিস্তফোরিদিকে টেনে নামালেন। ও তখন ঠাণ্ডায় হি-হি করে কাঁপছে আর কাঁদছে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

'খুদে শয়তান কাঁহাকা! তোকে খুন করে ফেললে যদি আমার রাগ যায়! ফের মাছ ধরছিলি?'

জবাবে ক্রিস্তফোরিদি কেবল কাঁপতে-কাঁপতে কাঁদতে লাগল। বাড়ি নিয়ে এসে ক্যাপ্টেন ওকে শুকনো জামাকাপড় পরতে দিলেন, তারপর বেশ খানিকটা কড়া ভোদ্‌কা ঢেলে দিলেন ওর গলায়। ছেলেটাকে চায়ের জলের কেটলি উনুনে চাপাতে বলে এরপর উনি বেরিয়ে গেলেন।

ক্রিস্তফোরিদি তখনও নাকিসুরে কেঁদে চলেছে। পুরো আটটি ঘণ্টা ওকে কাটাতে হয়েছে বাতিঘরের মাচায় বসে, ওর জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর স্মৃতি হয়ে থাকার মতো আট ঘণ্টা।

সেদিন ভোরবেলায় ও গিয়েছিল মাছ ধরতে। আর ওর চারে সেদিন যেরকম স্ক্যাড্‌মাছ ধরা পড়ছিল এমন আর আগে কোনোদিন পড়ে নি। বন্দর-এলাকা তখন চুপচাপ, কিন্তু ওর পেছনদিকে সমুদ্র তড়পাচ্ছিল প্রচণ্ড হাঁকডাক তুলে। কিছুক্ষণ পরে ও দ্যাখে, মাথার ওপর দিয়ে ফোয়ারার মতো সমুদ্রের জল ছিটিয়ে পড়ছে। দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছে ও। আর তারপর দেখেছে, জেটিটা যেখানে পাড়ের দিকে তীব্রভাবে মোড় নিয়ে বেঁকে গেছে সেই জায়গাটায় সমুদ্রের ঢেউ একেবারে জলপ্রপাতের মতো ভেঙে পড়ছে। পালাবার পথ নেই আর কোনো। সারা জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ক্রিস্তফোরিদি।

সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গিয়েছিল ও। প্রকাণ্ড বড়-বড় ঢেউ আর মুখে-ফেনা-তোলা আক্রোশ দেখে সমুদ্রের ও ঘাবড়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল জেটিখানা ভেঙে টুকরো-টুকরো

করে ফেলতে আর ক্রিস্তফোরিদিকে আস্ত গিলে ফেলতে যেন কোমর বেঁধেছে ঢেউগ্‌লো।

এরপর সে বাতিঘরের প্ল্যাটফর্মের ওপর উঠে গেছে। সেখানে বাতিটা তাকে জলের ফোয়ারায় স্নানের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সম্‌দ্রের গর্জনে কানে তালা লেগে যাচ্ছিল ওর। সম্‌দ্র-যে এমন সাংঘাতিক আওয়াজ করতে পারে এর আগে তা ওর জানা ছিল না।

ইয়োলচ্‌কার কাছে ক্রিস্তফোরিদিকে পাহারায় রেখে চোপ ফের জাহাজঘাটায় তাঁর কাজে ফিরে এলেন। এর অল্প পরেই একখানা মোটরলঞ্চে চেপে শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তিনি।

তখনও জল বেড়ে চলেছে। বিদ্‌্যৎকেন্দ্রে সরবরাহ বন্ধ, অন্ধকারে ডুবে আছে গোটা শহর। কেবলমাত্র বন্দরের সব্‌জ আলোগ্‌লো জব্‌লছে। ঘাস-গজানো আর মাঝে-মাঝে জমা নোনা-জলের গর্ত সহ নির্জন জেটিগ্‌লোর ওপর ঝুলে আছে আলোগ্‌লো।

রিওন নদীর কেন্দ্রীয় খালের উঁচু-হয়ে-ওঠা জল পেরিয়ে আড়াআড়িভাবে যাচ্ছিল লঞ্চখানা। যেন একটা প্রকাণ্ড সাপের উঁচু পিঠটা টপ্‌কে যাচ্ছে এমনভাবে প্রাণপণে হাঁসফাঁস করতে-করতে ছ্‌টছিল তা। ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে জল ছিটিয়ে মোড় নিয়ে লঞ্চখানা একসময় ঢুকে পড়ল শহরের জলজমা রাস্তাগ্‌লোয়।

বান আসা সত্ত্বেও গোটা শহর স্তব্ধ হয়ে আছে। শহরের অধিকাংশ বাড়িই উঁচু খোঁটার মাথায় বসানো, তাই অল্প কয়েকটি পরিবারকে মাত্র তাদের বাড়ি থেকে সরিয়ে বড় গির্জায় নিয়ে যাওয়ার দরকার পড়েছে।

আসলে যতসব পোষা জীবজন্তুকে সরানো নিয়েই সবচেয়ে

বেশি ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। গোরু আর ঘোড়াগুলোকে গলায় দড়ি বেঁধে টানতে-টানতে তুলতে হয়েছে বাড়িগুলোর ওপরতলায়। এটা এমন একটা ঝঞ্ঝাটের কাজ যার জন্যে বাড়ির গিন্নিদের কম নাকের-জলে-চোখের-জলে এক হতে হয় নি আর তাঁদের সাহায্য করার জন্যে পাঠানো মাল্লারাও কম গাল পাড়তে ছাড়ে নি।

বৃষ্টির বেগ কমে এল ইতিমধ্যে। উঁচু চাকার মাথায় বসানো ঠেলাগাড়িগুলো রাস্তা দিয়ে ভেসে-ভেসে যাচ্ছিল। পথেঘাটে জল দাঁড়িয়ে ছিল স্থির হয়ে, পাতা আর ফুলের পাপড়ি ভাসছিল জলের ওপর। বাড়ির জানলার তাকে আর বেড়ার খুঁটির মাথায় বসে ব্যাঙ ডাকছিল। মোটরলঞ্চখানা জলে-ভরা রাস্তা দিয়ে ছুটে আসার সময় জলের মধ্যে মটরদানার মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে পড়ছিল ব্যাঙগুলো।

'জলযোগ' নামের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে পেল্লাই আকারের একটা মাছ জল থেকে লাফিয়ে উঠল। ক্রিস্তফোরিদিকে সঙ্গে নিয়ে আসেন নি বলে দুঃখ হল ক্যাপ্টেনের। আহ্, ছেলেটার সময় কতই-না স্ফূর্তিতে কাটত শোবার ঘরের জানলা দিয়ে এখানে মাছ ধরতে পেলে!

শহরের এমন একখানা ছবি চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না। লঞ্চের হেডলাইটের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠছে শুধু জল আর জল, চারিদিকে খেলে বেড়াচ্ছে জলরাশি। জলের ঠিক নিচেই দেখা যাচ্ছে মাছ খেলে বেড়াচ্ছে, জলের ওপর মাথা দোলাচ্ছে গোলাপ ফুল। হালকা ঢেউগুলো বাড়ির অন্ধকার জানলার শার্সিতে ধাক্কা দিয়ে ছলাৎছল শব্দ তুলছে।

এমনই একটা জানলা থেকে কাখিয়ানি চোপকে ডাকলেন। বললেন, পাখোমভকে খুঁজে নিয়ে আসতে। বন্যা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি বুড়ো মানুষটা ছুটে চলে গেছেন কল্‌মাটাজ সেচ-ব্যবস্থার কাছে।

কল্‌মাটাজের মহল্লায় লঞ্চখানা যখন গিয়ে পৌঁছল তখন ভোর হচ্ছে। চারিদিকে জলে পরিবৃত হয়ে দুর্গের মতো অক্ষত দেহে দাঁড়িয়ে আছে সেচ-ব্যবস্থার সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি। স্ল্যুস-গেটগুলো খুলে রাখা হয়েছে। বন্যার জলের মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার ওপরে মাথা জাগিয়ে আছে বাঁধগুলো, তবে তাদের কোনো ক্ষতি হয় নি।

এক নম্বর স্ল্যুস-গেটের কাছে একদল মজুর নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন পাখোমভ। একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ঘোলাজলের অন্তহীন হ্রদটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি আর বানে-ভাসা সেই জমির দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন।

'তা, এত হাসির কী পেলেন মশাই?' শুধোলেন চোপ। মনে-মনে ভাবলেন, 'অদ্ভুত মানুষ তো! এমন সময়ে কারও হাসি পায়?'

'আরে, বাঁধগুলো টিকে গেছে,' জবাব দিলেন পাখোমভ। 'সেচ-ব্যবস্থার ক্ষতি হয় নি। তবে আমার ভয় ধরেছে, না-জানি চালাদিদিতে গাবুনিয়ার এলাকায় কী তাণ্ডব কাণ্ডই না চলেছে! ওখেনে জলের তোড় সাংঘাতিক হয়েছে বলে শুনছি।'

'হুঁ, নিশ্চয় খুবই খারাপ অবস্থা হয়েছে,' বিড়বিড় করে বললেন ক্যাপ্টেন। বাচ্চাদুটো ওঁর বাড়িতে একেবারে একা আছে মনে পড়ায় কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি।

পাখোমভ শহরে ফিরে যেতে রাজি হলেন না। কুয়াশার কম্বলমুড়ি ছেড়ে আস্তে-আস্তে উঠে-আসা সূর্যের দিকে আঙুল দেখালেন তিনি। সূর্যের আলোয় শাদা চাদরের মতো জমি, মস্ত বড় এক অগভীর হ্রদে পরিণত জমি ঝলমলিয়ে উঠল।

'আহা, কী একখানা দৃশ্য!' বললেন পাখোমভ। 'সত্যি, ভারি দুঃখের বিষয়! আর মাসখানেক পরেই আমরা বালিয়াড়ির মধ্যে দিয়েও খাল কাটা শেষ করব, আর তখন এ-তল্লাট থেকে বন্যার পালা চুকেবুকে যাবে চিরতরে। আপনারা কিন্তু এ-অঞ্চলের শেষ প্লাবন চোখে দেখছেন। আমার কথাটা খেয়াল রাখবেন কিন্তু!'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আর কী বলতে পারি বলুন?' চোপ জবাবে বললেন। 'নোঙর তোল, ভাইসব!'

সেরাত্রে একটানা বেশিক্ষণ ঘুমোয় নি ইয়োলচ্‌কা। একসময় জেগে উঠে বিছানায় বসে চোপের দেয়া গল্পের বইখানা পড়তে লাগল সে। ক্রিস্তফোরিদি তখন রান্নাঘরে শুয়ে ঘুমে অচেতন। একখানা কম্বল আর ক্যাপ্টেনের একটা পুরনো কোট গায়ে চাপিয়ে তোফা আরামে ওমের মধ্যে ঘুমোচ্ছিল সে। এমন কি সাংঘাতিক জোরে নাক ডাকাচ্ছিল পর্যন্ত।

বুড়ো এক খেলনাওলার ঘরে ছোট্ট মিষ্টি একটি মেয়ের দেখা করতে যাওয়ার একটা কাহিনী পড়ছিল ইয়োলচ্‌কা। খেলনাওলার ঘরখানা আবার এত ছোট্ট ছিল যে মেয়েটির উৎসবের পোশাকের মাটিতে-লুটনো অংশটি ঘরের মধ্যে ধরছিল না।

খেলনাওলা ছিল অন্ধ। মেয়েটিকে সে বলল:

'আমি ঠিক বলতে পারি, আপনি হাসচেন, মিষ্টি মেয়ে।

আমি জানি আপনের ভাগ্যে আচে অথৈ আনন্দ। আহা, আমি যদি অন্ধ না-হতাম! তাইলে আপনের ওই সুখের আবেশে-ভরা চোখের দিকে তাইকে আমিও খুশি হয়ে ওঠতাম।'

বন্দরে নোঙর-করা গ্রীক স্টিমারটা থেকে এই সময় কুয়াশার সংকেত জানিয়ে খ্যাপার মতো সজোর হুইস্‌ল বাজতে শুরু করল। আর তা শুনে ভয়ে লাফিয়ে উঠে কাঁদতে লাগল ইয়োলচ্‌কা। গতকাল থেকেই মা-মনি বাড়ি নেই, কোথায় যেন গেছে। চোপও বাড়ি নেই এখন। তাছাড়া বেচারা খেলনাওলার জন্যে ভারি দুঃখু হচ্ছে ওর। কেন-যে সে অন্ধ হল, কে জানে!

বালিশে মুখ গুঁজে অঝোরনয়নে কাঁদতে লাগল ইয়োলচ্‌কা। অবশেষে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল সে, সুয্যিঠাকুর সোজা ওর ঘরে এসে ঢুকেছেন। তারপর ভালো করে দ্যাখে — কই না তো, মোটেই সুয্যিঠাকুর নয়, এ-যে সেই ঝকমকে পোশাক-পরা ছোট্ট মেয়েটি! আর তার পোশাকের মাটিতে-লুটনো অংশটি কিছুতেই সবটুকু ঘরের মধ্যে আঁটছে না, খোলা দরজার বাইরে থেকে তা যেন মিহি রেশমি সুরে উশ্‌খুশ করে কী সব বলছে। আর মেয়েটি নিজে মা-মনির মতো গলা করে বলছে:

'ইয়োলচ্‌কার দেখাশোনা করার জন্যে আপনার কাছে আমি ভারি কৃতজ্ঞ, চোপ! আপনার মতো এমন মানুষ আমি দেখি নি!'

আর খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যেতে লাগল গুন্‌গুন সুর তুলে সমুদ্র ময়ূরের পেখমের মতো নীল আর সবুজের রঙ ফিরিয়ে বাহার দেখাচ্ছে অনবরত।

চোখের বদ্‌লা চোখ

পশুলোম-সম্পর্কিত গবেষণা ইন্‌স্টিটিউটের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র ভানো আহ্‌মেতোলিকে কেউ কাপুরুষতা কিংবা অস্থিরমতিত্বের দায়ে অভিযুক্ত করতে পারে না। যখন ভানো জানল যে-ভূ-সংস্থানবিৎ আবাশিদ্‌জে ও তার দলবল নেদোয়ার্দ খালের গতিপথের নকশা তৈরির জন্যে যাত্রা করেছে, তখন সে-ও ঠিক করল ওই দলের সঙ্গে যোগ দেবে।

নেদোয়ার্দ খালেরই আশপাশে জঙ্গলের সবচেয়ে বিপজ্জনক আর দুর্গম অংশটাই নুত্রিয়ার বংশবৃদ্ধির পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত জায়গা। ওখানেই আছে ঘন শর আর বেতবন, শাদা শাপলা ফুল আর হলদে আইরিস ফুলের ঝোপ। আর এগুলোই হল নুত্রিয়ার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য।

এর আগে ভানো কখনও ওই খাল-অঞ্চলে যায় নি। ওর মনে হল এটা না-করা নিছক কর্তব্যে অবহেলা ছাড়া কিছু নয়। কেননা, ওর লেখা কোনো রিপোর্টেই নুত্রিয়া-চাষের পক্ষে সবচেয়ে চমৎকার এই অঞ্চলটি সম্পর্কে একটিও কথা নেই!

রেললাইনের দিকে খালমুখো এগোবে বলে ঠিক করল ও। ভাবল, ওই পথ ধরে নিশ্চয়ই যাওয়া যাবে, কেননা সাম্প্রতিক পাহাড়ি আঁধির ফলে পথের জলা জমিগুলো নিশ্চয়ই শুকিয়ে গেছে।

শহর থেকে পায়ে হেঁটেই রওনা দিল ভানো। সঙ্গে নিল একখানা কম্পাস, একটা বন্দুক আর নিজের তৈরি একখানা ম্যাপ। পিঠের ঝোলায় চারদিনের মতো খাবারদাবারও নিয়ে নিল।

শহর ছাড়াতেই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল লালচুলো ইংরেজ মাল্লা সিওমার। তারপর কয়েক কিলোমিটার পথ একসঙ্গে গেল ওরা আর পরস্পরের মধ্যে আলাপ চলল প্রধানত হাত-পা নেড়েই। এরপর মাল্লাটি ওর সঙ্গ ছেড়ে চালাদিদির পথ ধরল।

একসঙ্গে পথ হাঁটার সময় সিওমা ভানোকে এঞ্জিনের তামার-তৈরি কয়েকটা টুকরো অংশ দেখিয়েছে। প্রাণপণে শিস দিয়ে আর জিভে নানারকম আওয়াজ করে মাটিকাটা-যন্ত্রের নড়াচড়া নকল করার চেষ্টা করেছে সে। ভানো ব্যাপারটা বুঝেছে। মাল্লাটি নিশ্চয়ই গাবুনিয়ার ওখানে মাটিকাটা-যন্ত্র চালানোর কাজ করছে।

'আচ্ছা পাগল লোক তো!' ভানো ভাবল। 'এই পয়ঁত্রিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবে ও পায়ে হেঁটেই? অথচ কাল সকালেই তো ট্রেন ধরতে পারত।'

যাই হোক, বন্ধুভাবেই ওরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল।

খেয়ানৌকো ধরে রিওন নদী পার হল ভানো। তারপর ডুব দিল গহিন জঙ্গলে।

জঙ্গলে গাছের ডালে-ডালে জড়িয়ে কেমন-যেন ঘন আর গুমোট বেঁধে আছে বাতাস। জলা থেকে টকটক, গা-গুলনো গন্ধ উঠছে একটা। পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে। ভানোর পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পথের পাশের লম্বা-লম্বা হর্নবীম গাছগুলো মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে-কেঁপে উঠছে। ওদের কাঁপুনি দেখে ভয় ধরে গেল ভানোর। মনে হল গাছগুলো বুঝি ওরই মাথায় আছড়ে ভেঙে পড়বে।

'এই সমস্ত গাছপালাই নির্মূল করে তুমি পুড়িয়ে ফেলতে চলেচ,' অদৃশ্য গাবুনিয়াকে উদ্দেশ করে ভানো বলল।

মানুষ যখন বিজন বনে একা পড়ে যায় তখন প্রায়ই নিজের মনে কথা বলতে থাকে সে, আর নয়তো শিস দেয় বা গান করে। কিংবা এসব কিছু না-করলেও হাতে অন্তত একখানা ছপ্‌টি নিয়ে বাড়ি মেরে-মেরে আশপাশের গাছের শুকনো ডালপালা ভাঙতে-ভাঙতে যায়। এইসব শব্দই মানুষটার চারপাশে যেন আত্মরক্ষার চওড়া একটা গণ্ডি কেটে দেয়।

বাদার মধ্যে পড়ার পর প্রায়-নিশ্চিহ্ন একটা পায়েচলা পথের দাগ দেখতে পেল ভানো। পথটা ধরে সে এগিয়ে চলল। থেকে-থেকেই পা-দুটো তার কাদায় গভীরভাবে ডেবে যেতে লাগল, তবু পুরনো শিকারিদের কাছে শেখা জঙ্গলের একটা কানুন কড়াভাবে মেনে চলল সে। তা হল, পায়েচলা পথের দাগ ছেড়ে এক পা'ও এদিক-ওদিক না-যাওয়া! কেননা পথের দু'ধারে ছড়িয়ে থাকে চোরাকাদার মরীচিকা-সদৃশ বিষাক্ত সবুজের আস্তরণ।

কখনও-কখনও লিয়ানালতার জালে ভানোর পিঠের ঝোলাটা জড়িয়ে যাচ্ছিল। তখন কাঁধ থেকে ঝোলার বাঁধনদুটো খুলে ছুরি চালিয়ে লতা কেটে ঝোলাটাকে ছাড়াতে হচ্ছিল। লিয়ানার বাঁকানো কাঁটার বাঁধন আঙুল দিয়ে খোলা সম্ভব হচ্ছিল না তার পক্ষে।

সন্ধে নাগাদ খালের ধারে গিয়ে পৌঁছল ভানো। খালের দেখা পেয়ে আনন্দে তীব্র একটা শিস দিল ও। ভাবল, মেরে দিয়েছি কেল্লা তাহলে। খালটা যেখানে হ্রদে গিয়ে পড়েছে সেই জায়গাটা এখান থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূর। আর সেই জায়গাটাতেই ন্যুট্রিয়ার বংশবৃদ্ধি হচ্ছে।

এখন তাহলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া যেতে পারে, ভানো ভাবল। কড়া, তাজা চায়ের মতো বাতাস কেমন ভারি হয়ে

উঠেছে। বেশ কষ্ট করেই ফুসফুসে টেনে নিতে হচ্ছে হাওয়াটাকে।

পিঠের বোঝাটা নামিয়ে রাখল ভানো। তারপরই হঠাৎ কেমন শক্ত হয়ে উঠে কান খাড়া করল। পশ্চিম দিক থেকে ঠিক কামান দাগার মতো একটা আওয়াজ গুমগুম করে উঠল। আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকাল ও, কিন্তু কোনো মেঘের চিহ্ন চোখে পড়ল না কোথাও।

ফের সেইরকম আওয়াজ হল, তবে এবার আরও জোরে। ভানোর বুকটা ধুকধুক করতে লাগল। ভিতু বলে নিজেকে গাল দিল সে। তাড়াতাড়ি গিয়ে কাছেই যে অ্যাল্ডার-গাছটা দেখতে পেল, তার মাথায় চড়ল।

গাছের মাথায় উঠে চোখের সামনে যে-দৃশ্য সে দেখল তাতে মোটেই আশ্বস্ত বোধ করল না। দেখল, দূরে সমুদ্রের ওপর স্তরে-স্তরে মেঘ জমে উঠছে আর তা চিরে-চিরে যাচ্ছে বিদ্যুতের ছটায়, কালো মার্বেলপাথরের বুক চিরে যেমন ছড়িয়ে থাকে রুপোলিরঙের শিরা-উপশিরা, তেমনিভাবে। ভানোর নাকে পৌঁছল ঠাণ্ডা, তাজা, বৃষ্টিভেজা একটা সোঁদা গন্ধ।

গাছ থেকে নেমে পড়ল ভানো। এখন কী করা? ফেরার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। হাজার চেষ্টা করলেও বৃষ্টি আসার আগে কিছুতেই সবচেয়ে কাছের গাঁয়ে সে পৌঁছতে পারবে না। হঠাৎ মনে পড়ল, গাবুনিয়া তাকে একবার এই নেদোয়ার্দ খাল-বরাবরই কোন জায়গায় যেন একটা রোমান দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে বলে জানিয়েছিল। সেই ধসে-পড়া দুর্গটা খুঁজে পেলে হয়তো বন্যার হাত থেকে অব্যাহতি পেলেও পাওয়া যেতে পারে।

এই বৃষ্টিতে বন্যা যে হবে সেটা অবধারিত। মুষলধারায়

বৃষ্টি গিয়ে পাহাড়ে পৌঁছলেই গোটা কলখিদা অঞ্চল ভেসে যাবে হাজার-হাজার ঘোলা জলের দুরন্ত স্রোতে।

ভানো ঠিক করল, সামনের দিকে আরও এগিয়ে চলবে। যদিও সেই দুর্গটা যে কোথায় সে-সম্বন্ধে কোনোই ধারণা নেই ওর — তবু। চুপচাপ এখানে বসে থাকা অসম্ভব। বিচিত্র একটা বোধ ওকে কুরে-কুরে খেতে লাগল যেন।

ফের রওনা হল ও। ঘনঘন বিদ্যুতের আলোয় চলার পথটা থেকে-থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মেঘ ক্রমশ এগিয়ে আসছে, আস্তে-আস্তে অথচ ভয়ংকর মূর্তিতে। থেকে-থেকে মেঘ ডাকছে গুমগুম করে, ভোঁতা আর একটানা গড়ানো সুরে, যেন জঙ্গলের কোন গহিন কন্দর থেকে ডেকে চলেছে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বাঘ।

আকাশ তোলপাড় করে যা ঘটছে সেই মহা-মহিমান্বিত ভয়ংকরের মুখোমুখি জীবনে কখনও নিজেকে এতটা অসহায় বোধ করে নি ভানো।

যেতে-যেতে প্রায়ই থেমে ওপরদিকে তাকিয়ে সে মেঘের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল, আশা করছিল মেঘ যদি দৈবাৎ খাল-এলাকাটা বাদ দিয়ে যায়। কিন্তু প্রতিবারই ভয়ে-দুরুদুরু বুক নিয়ে সে দেখছিল মেঘটা যেন সরাসরি তার দিকেই আসছে।

অনুজ্জ্বল, ভারি, কালো সেই মেঘটা থেকে ধোঁয়া, ধুলো আর ফিন্‌ফিনে বৃষ্টির গুঁড়ো মাখামাখি হয়ে ঝরে পড়ছে। দিগন্তের কাছে মেঘটা সৃষ্টি করেছে ঘন, দুর্ভেদ্য, অন্ধকার রাতের।

প্রত্যেকবার নতুন করে বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে ভানোর পিঠের কাছটা শিরশির করে উঠছে। ও এখন চাইছে, বৃষ্টি

নামুক! ঝোপে-ঝাড়ে শোনা যাচ্ছে শেয়ালের হাসি-কান্নার আওয়াজ।

হঠাৎ ভানো দেখল শাদা একটা আগুনের গোলা গাছের মাথা ছুঁয়ে ওপর দিয়ে ছুটে গেল। তার ছোঁয়ায় গাছের পাতাগুলো থেকে অল্প-অল্প ধোঁয়া উঠছে বলেও মনে হল।

অ্যাল্‌ডার-গাছের একটা গুঁড়িতে শরীর ঠেসে ধরে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল ভানো। সঙ্গে সঙ্গে একটা বাজ পড়ার আওয়াজে আকাশটা যেন ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। তবু নিজের গলার আওয়াজ নিজের কানে এল ভানোর, আর ভয়টাও যেন চলে গেল মন থেকে। ও ঠিক করল ফের একবার ওইভাবে হাঁক পাড়বে।

ফের চেঁচাল একবার। আর এবার দূর থেকে মানুষের গলায় যেন ক্ষীণ একটা সাড়া মিলল। ভানো মনে করল, ওটা ওরই ডাকের প্রতিধ্বনি হবে। যাই হোক, আরও একবার হাঁক পাড়ল সে। আর এবারও তেমনি সাড়া মিলল, আর গলাটা কেমন চেনা-চেনা ঠেকল যেন। ভানোর মনে হল সে যেন আবাশিদ্‌জের গলা শুনতে পেল।

এবার দ্রুত পথ ধরে এগোতে লাগল সে আর ঘনঘন হাঁক পাড়তে লাগল। আর প্রত্যেকবারই সাড়াটা যেন কাছে এগিয়ে আসছে বলে মনে হল।

চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বৃষ্টি এখনও তেমনভাবে শুরু হয় নি। কেবল থেকে-থেকে বড়-বড় একেকটা জলের ফোঁটা গাছের পাতার ওপর টুপটাপ করে পড়ছে। শিস দিতে-দিতে আর চেঁচাতে-চেঁচাতে চলল ভানো। ওর ভয়ডর উবে গেছে ততক্ষণে।

হঠাৎ একসময় সাড়াটা মিলল একেবারে কাছ থেকে, মাত্র কয়েক হাত সামনে থেকে একেবারে। আর দেখতে-দেখতে

অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠল একটা মানুষের ছায়া। এই সময় বিদ্যুৎ চমকাল একবার। ভানো দেখল, গুলিয়া আসছে।

‘অ—! তাই বল,’ গম্ভীর গলায় বলল গুলিয়া। ‘তুমি বাপধন! ইঁদুরের পাহারাদার!’

জবাবে ভানো চুপ করে রইল।

আরও কাছে এগিয়ে এল গুলিয়া।

বলল, ‘কী চুপ মেরে আচ-যে বড়? কথা কইচ না কেনে হে? আদালতে তো দেখি নোলাটা তোমার খাঁচায়-আটক পাখির মতন তড়বড় করতেছেল।’

ভানো এবার চেষ্টা করে কথা বলল।

শুধোল, ‘কী চাও তুমি?’

ওর ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল কাঁধ থেকে বন্দুকটা টুক করে নামিয়ে নেয়, কিন্তু এ-ও বুঝেছিল যে ওসব চেষ্টা করলে ওর জানটাই খতম করে দেবে লোকটা।

‘বুড়া মান্ষে কয়, চোখের বদ্‌লা চোখ লিতে হয়,’ ঘড়ঘড়ে গলায় বলল গুলিয়া। ‘বুড়া মান্ষে আমাদেরে জেবনধারণের ঠিকঠিক পথ বাত্‌লে দেয়। তা, এবিষয়ে তোমার কী মনে লেয় ছোকরা?’

ফের একবার বিদ্যুৎ চমকাল। বাজ পড়ল কোথায় যেন। বিদ্যুতের আলোয় ভানোর চোখে পড়ল গুলিয়ার তীক্ষ্ন, কঠোর মুখখানা আর চোখে বিদ্রূপের ঝিলিক।

হাসবার চেষ্টা করে ভানো বলল, ‘ভাই গুলিয়া... কী চাও তুমি, ভাই গুলিয়া? এঞ্জিনিয়ররা এসে গেছে এ-তল্লাটে। তার মানে, তোমার আর আমার দু’জনেরই কপাল মন্দ। ওরা জঙ্গল কেটে উজাড় করে দেবে। তুমি তো শিকারি, তোমার পেট চালানোর পেশার দফারফা হয়ে যাবে। আর আমি —

আমার সব গবেষণা যাবে পণ্ড হয়ে। ওই হতচ্ছাড়া জন্তুগুলো নিয়ে তিন-তিনটে বছর মাথা ঘামিয়েছি আমি। কাজেই দোস্ত, তোমার আর আমার কি ঝগড়া করা সাজে?'

শুনে চুপ করে রইল গুলিয়া। আর এ-কথার ও কী জবাব দেয় তাই শোনার জন্যে ভানোর বুকখানা ঢিপঢিপ করতে লাগল।

'বিচক্ষণ নোকে অর্বাচীনের সাথে খামোকা ঝগড়া করবে কেনে?' অবশেষে গুলিয়া বলল। 'তুমি নোকটা মাথামোটা, বুইলে? এই পচাগলা জঙ্গলের লেগে আমার তো ভারি মাথাব্যথা কিনা! কে বললে আমি শিকারি? আমি এখন গতরখাটা মজুর। বুড়া নোকে আমাদের জেবনধারণের ঠিক পথ বাত্‌লে দেচে। তা, ছোকরা নোকরাও পথ বাতলাচ্চে বৈকি। কেবল তারা তোমার মতন নোক লয়। তা, তুমি অমন কাঁপতে নেগেচ কেনে, বাপু? তুমি আমারে ফাটকে পুরে মেয়াদ খাটাতে চেয়েছেলে, আর গাবুনিয়া আমারে করার মতন কাজের কাজ দেচে। তোমার চিন্তাটা ছেল আহাম্মকের মতন, আর গাবুনিয়ার বিচক্ষণ মানুষের মতন, বুইলে?'

বলে গুলিয়া হাসল।

তারপর ফের বলল, 'তা, তুমি অমন কাঁপতে নেগেচ কেনে, দোস্ত্? ডর নাগচে তোমার, কেমন? তা, আমি তোমারে জানে মারব না। এস দেখি আমার সাথে।'

এই বলে পেছন ফিরে হাঁটা শুরু করল ও। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ভানোকে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল পোড়ো দুর্গটায়। আবাশিদ্‌জে খুশি হয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানালেন।

দুর্গের চওড়া প্রাকারের ওপর ফেলা ছাউনিতে চব্বিশ

ঘণ্টারও বেশি সময় ওরা কাটাল সবাই মিলে। এদিকে বৃষ্টি পড়ে চলল তো চললই। চারিদিক জলে ডুবে একাকার হয়ে বিশাল এক সমুদ্রের চেহারা নিল।

আর সারাটা সময় লজ্জায় মরে যাচ্ছিল ভানো। গুলিয়ার মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছিল না। ও বুঝেছিল, ওই বুনো শিকারি ওর চেয়ে বেশি বুঝদার, বেশি বিচক্ষণ। গুলিয়া বলেছে, 'এই পচাগলা জঙ্গলের লেগে আমার তো ভারি মাথাব্যথা কিনা!' কথাটা একেবারে খাঁটি।

সময়ের দিকে লক্ষ্য ছিল না ভানোর। ভোঁতা একটা নিস্পৃহ ভাব নিয়ে আবাশিদ্জের দলবলের সঙ্গে সে-ও খাল-এলাকা ছেড়ে চলল। ওরা চলল রিওন নদীর দিকে।

রিওনে পেঁাছতে গোটা একটা দিন লাগল ওদের। যাওয়ার পথে প্রতি পদক্ষেপে জলজমা নরম মাটিতে গভীরভাবে পা বসে যাচ্ছিল। তার ওপর মজুরদের ভারি-ভারি মাপজোখের যন্ত্রপাতি বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছিল। একেবারে শূন্য আর স্তব্ধ হয়ে ছিল গোটা জঙ্গল। পাখির এক-আধটা ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল না। তার মানে, জীবন্ত প্রাণীরা জঙ্গল ছেড়ে সবাই পালিয়েছে। .এমন কি শেয়ালের হুক্কাহুয়া পর্যন্ত থেমে গেছে। একমাত্র ব্যাঙগুলোই যা পায়ের নিচ থেকে লাফিয়ে-লাফিয়ে পালাচ্ছিল আর মোটা-মোটা জলের সাপ বানে-ভাসা বাদার জলে হেলেদুলে সাঁতার কেটে চলেছিল।

'উঃ, কী অভিশপ্ত জায়গা রে বাবা!' ভাবল ভানো। ও ভেবেই পেল না কেমন করে এই বাদা, দুর্গন্ধ আর পচাগলা জঙ্গলের জগৎ বাঁচিয়ে রাখতে, এই ম্যালেরিয়া-জ্বর আর বন্যা, বুনো দানাফসল আর কটুস্বাদ পচা অঙ্গারের

জগৎ টিকিয়ে রাখতে লড়াই করার মতো সাহস পেল ও?

চুলোয় যাক সব! এক শো-টা ঘেয়ো শেয়ালের চেয়ে একটা কমলালেবু বেশি দামি!

কাখিয়ানির প্রতিবেদন

কাখিয়ানির পক্ষে রিপোর্ট বা প্রতিবেদন লেখা সব সময়েই অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ। কিন্তু একবার একখানা রিপোর্ট যখন তিনি লিখে পাঠান, তখন দেখা যায় তা একেবারে গাণিতিক যথাযথতার মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাখিয়ানি লিখলেন, 'নৈর্ঋতকোণ থেকে প্রচণ্ড এক ঝড় উঠে সমুদ্র থেকে বালি ঝাঁটিয়ে নিয়ে কাপারুচা নদীর মোহানায় মস্ত বড় এক বালির পাহাড় গড়ে তোলে ও নদীর মুখ বন্ধ করে দেয়। এটা ঘটে পোতি শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে। সেইসঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতও হতে থাকে। ছয় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এই বৃষ্টি চলে।

'রিওন, কাপারুচা, তুসিভা আর হোপি নদী (এছাড়া আরও দশ-বিশটা ছোট নদীর কথা নাই-বা বললাম) প্রচণ্ডভাবে কূল ছাপিয়ে উঠে কলখিদার সমুদ্র-তীরবর্তী গোটা অঞ্চলটিই প্লাবিত করে।

'পোতি শহরের রাস্তায় জমা জল বেড়ে একতলা বাড়ির মাথায়-মাথায় ওঠে। বনের জীবজন্তু বন্যার তাড়া খেয়ে ভয়ে শহরে ঢুকে পড়ে, এমন কি যে-দ্বীপটিতে বন্দর অবস্থিত সেখানেও আশ্রয় নেয় তারা। এই দ্বীপে বন্যা হয় নি। জীবজন্তুর মধ্যে বিশেষ করে বহুজাতের সাপ এসে আশ্রয় নেয় শহরে আর বন্দরে।

'এই বন্যার ফলে আমাদের জলনিকাশী প্রকল্পগুলির

রীতিমতো ক্ষতি হয়েছে। তবে বৃষ্টির প্রাবল্যের ফলে প্রকল্পগুলি যতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মনে করা গিয়েছিল, কার্যত ক্ষতি ততটা হয় নি।

'চালাদিদিতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় খালে জলের তোড়ে বাঁধগুলো ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তিন বছরের একটানা পরিশ্রমের ফল নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল। সেখানে শ্রমিকদের ও ভারপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়র গাবুনিয়ার অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শনের ফলে বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়।

'বাঁধরক্ষার কাজ সেখানে করতে হচ্ছিল রাত্রিবেলা এবং কায়িক পরিশ্রম করে কোদালে করে মাটি ফেলে। সেখানকার একমাত্র মাটিকাটা-যন্ত্রটা বাড়তি যন্ত্রাংশের অভাবে বিকল হয়ে পড়েছিল। এই প্রয়োজনীয় বাড়তি যন্ত্রাংশটি শিবিরের ওয়র্কশপে ঢালাই করে বানিয়ে নেয়ার একটা চেষ্টা চলে, কিন্তু সময়ের অভাবে তা সফল হয় না। এই পরিস্থিতিতে মাটিকাটা-যন্ত্রটির চালক ইংরেজ জিম বার্লিং-এর অসাধ্যসাধনের ফলে সবদিক রক্ষা পায়। রাত্রিবেলা সেই ভয়াবহ বৃষ্টিধারার মধ্যে তিনি পায়ে হেঁটে চালাদিদি স্টেশন থেকে যন্ত্রাংশটি নিয়ে আসেন।

'এজন্যে ইংরেজ যন্ত্রচালকটিকে জঙ্গল ভেঙে যেতে হয়েছিল। লিয়ানালতায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয় তাঁর, প্রচুর রক্তক্ষরণও হয়। কিন্তু সকল বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তিনি একেবারে শেষ মুহূর্তে যন্ত্রটা চালিয়ে নিয়ে খালের সেই বিপদ্‌গ্রস্ত এলাকায় এসে হাজির হয়ে যান, তারপর আশ্চর্য ধীরস্থিরভাবে বাঁধের ফাটলগুলো মেরামত করতে লেগে যান।

'বাঁধ মেরামতের এই পুরো কাজটা পরিচালনা করেন এঞ্জিনিয়র গাবুনিয়া, যদিও তিনি নিজেই তখন

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ম্যালেরিয়া-জ্বরে গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ওই সময়ে তাঁর সাংঘাতিক ঠাণ্ডাও লেগে যায়। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে এখন তিনি পোতির হাসপাতালে আছেন। এছাড়া ওই রাত্রে কাজ করার সময় ইয়েফ্রেম চান্‌তুরিয়া নামে একজন শ্রমিকও প্রাণ হারান।

'কল্‌মাটাজ জলনিকাশী ব্যবস্থাও চমৎকার কাজ করে তখন। সেখানকার স্লুস-গেট বা বাঁধ কিছুরই কোনো ক্ষতি হয় নি। এঞ্জিনিয়র পাখোমভ একটানা চব্বিশ ঘণ্টার মতো সময় সেখানে থেকে যান ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি পরিচালনা করেন।

'আবাশিদ্‌জের পরিচালনাধীন একদল ভূ-সংস্থানবিৎ ওই সময়ে নেদোয়ার্দ খাল অভিমুখে যাত্রা করেন। তারপর পুরো তিনদিন ধরে তাঁদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। ধরে নেয়া হয়েছিল, তাঁরা মারা পড়েছেন। এমন কি সন্ধানী দল পাঠিয়েও তাঁদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি, কেননা অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক ছাড়া ওই খাল-অঞ্চলে পৌঁছনো অসম্ভব হচ্ছিল। এই সমস্ত বাদা-অঞ্চল যার নখদর্পণে একমাত্র লোক সেই গুলিয়া নিজেই আবাশিদ্‌জের দলের সঙ্গে বেরিয়েছিল। যাই হোক, গতকাল সন্ধ্যায় ভূ-সংস্থানবিৎদের সেই দলটি নিরাপদে চালাদিদিতে ফিরে এসেছে। ওঁদের সঙ্গে ফিরে এসেছেন এখানকার পশুলোম-সম্পর্কিত গবেষণা ইন্‌স্টিটিউটের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র ভানো আহ্‌মেতেলি। ভানোকে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করেছেন ওই ভূ-সংস্থানবিৎরাই।

'আমাদের প্রধান উদ্ভিদবিজ্ঞানী লাপ্‌শিন রিপোর্ট দিয়েছেন যে সংরক্ষিত বাগানগুলিতে গাছপালার প্রায় কোনো ক্ষতিই হয় নি বলা চলে।

'নদীগুলোর মোহানা থেকে বালি সরাবার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করছি আমি এখন। এই জমা বালিই এ-অঞ্চলে বন্যা হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ।'

রিপোর্টের এই শেষ কথাগুলো লিখে ভুরু কোঁচকালেন কাখিয়ানি। ওঁর নিজের কাছেই রিপোর্টখানা বড্ড বেশি কাব্যিভাবে-ভরা বলে মনে হল। কিছুক্ষণ ভাবনাচিন্তা করে তিনি 'প্রচণ্ডভাবে কূল ছাপিয়ে উঠে' আর 'প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত' এই বাক্যাংশ-দুটি কেটে দিলেন। এছাড়া আর কোনো সন্দেহজনক বাক্যাংশ অন্তত ওই মুহূর্তে তাঁর নজরে পড়ল না।

'ধুত্তোর, চুলোয় যাক!' বললেন কাখিয়ানি। 'কাব্যিভাবটা দেখছি একটা ছোঁয়াচে রোগ!'

জীবনবীমা কোম্পানি-বিষয়ে

গাবুনিয়া সেরে উঠছিল খুব আস্তে-আস্তে। প্রথম কয়েকদিন তো অচৈতন্য অবস্থাতেই ছিল সে। সেই সময়কার যে-ব্যাপারগুলো মনে পড়ে ওর তা হচ্ছে, ওর বুকের ওপর সুড়সুড়ি-দেয়া ডাক্তারের গোঁফজোড়া আর ওর কপালে একখানা ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া। এছাড়া মনে পড়ে ফিস্‌ফিস করে কথা-বলা ক্যাপ্টেনের কর্কশ গলার আওয়াজ আর অন্তহীন তারার মিছিল। তারাগুলো কেবলই ওর জানলার পাশ দিয়ে ছিটকে-ছিটকে বেরিয়ে যেত পাহাড়গুলোর দিকে।

প্রলাপের ঘোরে গাবুনিয়া ভাববার চেষ্টা করত ব্যাপারটা আসলে ঘটছে কী! ও যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছিল যে

তারাগুলো বৃষ্টির মতো অজস্র ধারায় পাহাড়গুলোর ওপর ঝরে পড়ছে। প্রতি রাত্রেই তারাগুলো ঝরে পড়ত বন্যার মতো গোটা কলখিদার ওপরই। এমন দৃশ্যে এ-দুনিয়ায় কেউ কোনোদিন দ্যাখে নি। আর জলের বদলে গোটা তল্লাট ভেসে যেত তরল শাদা আগুনে। দেখতে-দেখতে সেই আগুন বুকসমান উঁচু হয়ে উঠত আর গাবুনিয়ার হৃৎপিণ্ডটা পুড়ে খাক হয়ে যেত আগুনে, যন্ত্রণায় ছটফট করত ও অসম্ভব।

আর তখন চেঁচাতে থাকত গাবুনিয়া, 'খবরদার! দোস্ত-সব, ছুটে চল সবাই পাঁচ নম্বর অংশে!'

দেখেশুনে ডাক্তার মাথা নাড়তেন। এই প্রলাপ বকাটা ভালো লক্ষণ বলে মনে হোত না তাঁর।

আবার আরেক সময়ে গাবুনিয়া ভাবত যেন সে চোপের সঙ্গে জঙ্গল ভেঙে চলেছে ভোরবেলার নীল আকাশের একটা টুকরোর দিকে। যেতে-যেতে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া ওর গালে এসে লাগছে, চুলের মধ্যে বিলি কাটছে হাওয়া। ও আর চোপ দু'জনে যেন সিওমাকে খুঁজছে, অথচ খুঁজে পাচ্ছে না কোথাও।

এমন সময় চোপ যেন নিজের পকেট হাতড়ে দাড়ি কামানোর একখানা ব্লেড বের করলেন।

বললেন, 'নাঃ, এ-তল্লাটে ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভূ-দৃশ্যটাই আমাদের বদলে ফেলা দরকার।'

তারপর আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যে ঝলমল করছিল ভোরের যে-টুকরোটা তার মধ্যে ব্লেডখানা বসিয়ে দিয়ে তালায় চাবি ঘোরানোর মতো করে সেটাকে ঘোরালেন তিনি। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক শব্দ তুলে আকাশটা ঘুরে গেল আর একটা নতুন দেশ দেখা দিল চারপাশে। ও দেখল, ওরা দু'জন আর সেই জঙ্গলে নেই, দাঁড়িয়ে আছে নেভা নদীর বাঁধের

ওপর। আর নদীর কালো জলে ঝলমল করছে শ্বেতরাত্রির আভা। আর পাখি-চেরি গাছগুলো নুয়ে আছে বাঁধের রেলিঙের ওপর, শিউরে-শিউরে উঠছে তাদের পাতাগুলো।

ফের একবার ক্লিক-শব্দে আকাশটাকে ঘুরিয়ে দিলেন চোপ, আর গাবুনিয়া দেখল ওরা দাঁড়িয়ে আছে একটা চলন্ত স্টিমারের ওপর আর নিচে প্রতিফলিত আলোয় চিকমিক করছে জল। দূরে, পাড়ের ওপর ওর নজরে পড়ল একটা শহর ধাপে-ধাপে উঁচু হয়ে উঠেছে। পুরনো কাচের একটা স্তূপের মতো দেখতে লাগছে শহরটাকে। ঝলমল করছে, আলো ঠিকরোচ্ছে শহরটা থেকে। আর চোপ গাবুনিয়ার কানে ফিস্‌ফিস করে জানাচ্ছেন যে শহরটা হচ্ছে ভেনিস, আর ইচ্ছে করলে ওরা এখানকার চোরাই-চালানীদের কাছ থেকে ফুটির আকারের বড়-সাইজের কমলালেবুর বীজ কিনতে পারে। দেশে ফিরে ওই বীজ তারা উপহার দিতে পারে লাপ্‌শিনকে।

'ধুত্তোর, নিকুচি করেছে লাপ্‌শিনের!' চেঁচিয়ে উঠল গাবুনিয়া। আর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ফিরে এল, গোঙানি শোনা গেল ওর।

ও জানত, রাত কাবার হবার আগে ফিরে-ফিরে বারবার এই একই দুঃস্বপ্ন দেখবে। স্বপ্ন দেখতে-দেখতে ও তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছে। দুঃস্বপ্নের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠত গাবুনিয়া। আর ফের ওকে চেপে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিতে নার্সদের বড় কম বেগ পেতে হোত না।

কুইনিনের প্রতিক্রিয়ায় ঝড়ের গর্জনের মতো প্রচণ্ড শব্দে কান ভোঁ-ভোঁ করতে থাকত ওর। মনে হোত কাছেই সমুদ্রে যেন একটানা একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে। জানলার

বাইরে বেগুনিরঙের আকাশটার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থেকে গাবুনিয়া বোঝবার চেষ্টা করত, সূর্যের প্রখর আলোয় চোখদুটো যখন জ্বালা করছে তখন ঝড় হয় কেমন করে?

সংকট কেটে যাওয়ার পরেও ভোগান্তির অন্ত ছিল না। সে-সময়ে গাবুনিয়ার শরীর-মন শুধু ছেয়ে থাকত অসম্ভব একটা অবসন্নতায়, গভীর অনাস্বাদিতপূর্ব একটা নির্জীব ভাবে। এছাড়া অন্য কোনো বোধই ছিল না। আর তখন এমন কি ফিস্‌ফিস করে কথা বলতে কিংবা হাতখানা তুলতেও প্রাণান্ত প্রয়াস করতে হোত।

এর পরের কয়েকটা দিন ও ঘুমোল প্রায় একটানা, অঘোরে।

হঠাৎ একদিন একটা ভারি পায়ের শব্দে ঘুমের এই চটকাটা ভাঙল গাবুনিয়ার। চোখ খোলার আগেই ও অনুমানে বুঝল যে ঘরে যে-লোকটি ঢুকেছে পা-টিপে চলা তার বিশেষ অভ্যেস নেই। একেকটা পা সাবধানে ফেলছে লোকটি আর ঘরের মেঝের কাঠ ক্যাঁচকোঁচ করে উঠছে। এর পরেই কিছুক্ষণ সব চুপ, নৈঃশব্দ্য ভাঙছে কেবল হাঁপধরা নিশ্বাসের ফোঁসফোঁস আওয়াজে। এরপর সেই একই রকম আনাড়ির মতো সতর্কতায় দ্বিতীয় পা-খানা পড়ছে।

চোখ খুলে গাবুনিয়া দেখল, দরজার কাছে সিওমার চওড়া পিঠখানা দেখা যাচ্ছে। মাল্লাটি চলে যাচ্ছে ততক্ষণে। পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে কষ্ট করে ভারসাম্য বজায় রেখেছে সে, আর এই প্রাণান্ত প্রয়াসে ঘাড়টা রক্তবর্ণ ধারণ করেছে।

গাবুনিয়ার বিছানার পাশে টেবিলে রয়েছে পাইপের তামাকের আধখালি নীল একটা টিনের কৌটো। সিওমার

সবেধন নীলমনি এই তামাকের টিনটা। গাবুনিয়া জানে সিওমার কাছে এর মূল্য কতখানি! নিজেই সে এ-তামাক ব্যবহার করে দিনে মাত্র একবার, বাকি সময়টা ধোঁয়া-টানার সুখ মেটায় সাধারণ মাখোর্কা তামাক ব্যবহার করে।

সিওমাকে আর পিছু ডাকল না গাবুনিয়া। গলার কাছটায় এমন একটা দলা পাকিয়ে উঠেছিল যে ও কথা বলতে পারছিল না।

পরদিন সন্ধেবেলা নেভ্স্কায়া এল ওকে দেখতে। পরীক্ষামূলক বাগানে জন্মানো নতুন ধরনের একগুচ্ছ ফল গাবুনিয়ার জন্যে ও নিয়ে এসেছিল। ফলটার নাম ফেইওয়া।

অনুজ্জ্বল, হালকা-সবুজ, ডিমের আকারের একটা ফল চেখে দেখল গাবুনিয়া। আনারস আর বুনো স্ট্রবেরির মাঝামাঝি একটা স্বাদ পেল ফলটায়।

'কেমন যেন গ্রীষ্মমণ্ডলের গন্ধ পাচ্ছি ফলটায়,' ফিস্ফিস করে ও বলল। 'ভারি চমৎকার খেতে!'

গ্রীষ্মকালে খুব ভোরবেলা সমুদ্রের দিক থেকে যে-হালকা বাতাস দেয়, কিংবা এক-পশলা বৃষ্টির পরে ফলবাগান থেকে যে-গন্ধ ছাড়ে, তারই গন্ধ মাখানো ফেইওয়ায়।

'এটা একটা দুষ্প্রাপ্য ফল,' নেভ্স্কায়া বলল। 'এতে প্রচুর আয়োডিন আছে। ধমনীকাঠিন্যের রোগের চিকিৎসাতেও এ-ফল ব্যবহার করা যেতে পারে।'

আগাগোড়া গাবুনিয়ার দিকে নজর রাখতে-রাখতে অন্যমনস্কভাবে এটা-ওটা গাছগাছড়া নিয়ে কথা বলে চলল নেভ্স্কায়া। হঠাৎ ওপরতলা থেকে একসময় পিয়ানোর বাজনা শোনা গেল, সম্ভবত ডাক্তার-সাহেবের ফ্ল্যাট থেকেই। বাজনাটা শোনার জন্যে নেভ্স্কায়া থামল।

চোখ বন্ধ করে রইল গাবুনিয়া। সুরটা ওর চেনা। এটা 'ইস্কাপনের বিবি' গীতিনাট্যে লিজার গানের অংশ:

'এল এল মেঘ, বজ্রগর্ভ মেঘ...।'

হঠাৎ উঠে পড়ল নেভ্স্কায়া। এক মুহূর্তের জন্যে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে গাবুনিয়ার ঘামে-ভেজা চুলটা হাত বুলিয়ে পরিপাটি করে দিল, তারপর চলে গেল। যাবার সময় দরজার কাছে পেঁাছে ফিরে তাকিয়ে নিঃশব্দে ঘাড়টা ঝোঁকাল একটু।

পরদিন হাসপাতালে প্রায় একটা হট্টগোলই বেধে গেল আর-কি। ওইদিন চোপ আর সিওমা গাবুনিয়াকে দেখতে এসেছেন। কী-একটা ব্যাপারে যেন সিওমা সেদিন ভারি মর্মাহত হয়েছে দেখা গেল। লম্বা-চওড়া চেহারার অতবড় মাল্লার চোখেও জল আসব-আসব করছে। চোখ পিটপিট করতে-করতে জোরে-জোরে ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে সে। মনে হল, সে ভারি বিরক্ত হয়েছে।

যদিও গাবুনিয়া ভালো ইংরেজি বোঝে না, তবু সিওমার একনাগাড়ে বকে-যাওয়া অভিযোগ-অনুযোগ থেকে সে এটুকু বুঝল যে জীবনবীমা কোম্পানির কোনো ব্যাপার নিয়ে কিছু-একটা ঝামেলা বেধেছে। তবে সিওমা যা বকছিল তার বেশির ভাগই নিছক পাগলামি-ভরা আবোলতাবোল বলে মনে হচ্ছিল। মুখে যা আসে তাই বলে মিখার উদ্দেশ্যে সে গালাগাল দিয়ে চলেছিল।

ওর বক্তব্য রুশভাষায় তর্জমা করে দিলেন চোপ। তা থেকে জানা গেল যে বন্যার পরে কয়েকদিন সিওমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হয় নি। কারণ, বন্যার রাত্রে জঙ্গল ঠেলে

খালের দিকে আসার সময়ে ওর বুক আর দুটো হাত লিয়ানালতার ঘা খেয়ে সাংঘাতিক ক্ষতবিক্ষত হয়, আর পরে সেই ছড়ে-যাওয়া ঘাগুলো ফুলে ওঠে আর তা থেকে পুঁজ গড়াতে শুরু করে। ফলে দিন-পাঁচেক সিওমাকে শহরে থেকে যেতে হয়, চিকিৎসা করাতে হয় ক্লিনিকে।

এরপর যখন সে খাল-অঞ্চলে ফিরে যায় তখন মিখা তাকে বলে যে ওই পাঁচদিনের ছুটির মাইনে সে জীবনবীমা-তহবিল থেকে পাবে। ব্যস, এতেই সিওমা খেপে আগুন হয়! মিখাকে সে চোর-ডাকাত, যা নয় তাই বলে তার দিকে ঘুষি বাগিয়ে তেড়ে আসে। চেঁচিয়ে বলতে থাকে, এটা ইংলন্ড পাও নি, বুইলে হে! কেউ যদি পচাগলা এই ব্রিটিশ ব্যবস্থাটা এদেশে চালু করার চেষ্টা করে তাহলে এক ঘুষিতে তার মুখ ফাটিয়ে দেবে সে — এ-কথাও জানিয়ে দিতে ভোলে না।

ব্যাপার দেখে মিখা ল্যাজ গুটিয়ে পালায়। কিন্তু সিওমা তখনও চেঁচিয়ে চলে। বলে, কারও কোনো অধিকার নেই তার বিনা অনুমতিতে জিম বার্লিং-এর জীবনবীমা করানোর। জীবনবীমা ব্যাপারটা জালিয়াতি আর লোক-ঠকানো ছাড়া কিছু নয়।

তর্জমার কাজ শেষ করে চোপ বললেন, 'ও নিশ্চয় তখন নেশার ঘোরে ছিল। কে জানে, হয়তো এক-পাঁট ভোদ্‌কা গিলেই বসেছিল।'

সিওমা কিন্তু কথাটা ধরতে পারল। মুখে রক্ত ছুটে এল ওর। সমুদ্রে জীবন কাটিয়ে 'ভোদ্‌কা' কথাটার তাৎপর্য বুঝতে ওর বাকি ছিল না।

'নো, নো!' অস্বীকারের ভঙ্গিতে ঘনঘন মাথা নাড়তে-নাড়তে ও চেঁচিয়ে বলল।

এরপর পরনের জার্সিটা টেনে নামিয়ে বুকের ওপরকার তিনটে নীল দাগের দিকে আঙুল দেখাল ও।

বলল, 'আপনেদের ওই জেবনবীমা কোম্পানির দৌলতে এই তিনটে পেয়েচি আমি। তিনটেই আমার পক্ষি যথেষ্ট, আর চাই নে। দুনিয়ার আর কোনো জেবনবীমা কোম্পানির সাথে কাজ-কারবার করতে চাই নে।'

এরপর ওই তিনটে দাগ কী করে হয়েছিল তার কাহিনী শোনাল সিওমা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সিওমা 'ক্লন্‌ডাইক' স্টিমারের সুকানির চাকরি নিয়েছিল। স্টিমারখানা যাতায়াত করত লিভারপুল থেকে নিউফাউন্ডল্যান্ড দ্বীপে। আর প্রত্যেক লোকই জানে যে ওই তল্লাটে যেকোনো সময়ে ঝড়, কুয়াশা কিংবা ভাসন্ত বরফের পাহাড়ের মুখোমুখি পড়া সম্ভব।

নিউফাউন্ডল্যান্ড দ্বীপে একটা বাতিঘর আছে, যাকে বলা হয় লাইটওয়েস্ট। দূর থেকে বাতিঘরটাকে দেখলে মনে হবে যেন একখানা পাল তোলা জাহাজই বুঝি সোজাসুজি আসছে। বাতিঘরের ভিতের দিকটা বেশ চওড়া আর তার মিনারটা শাদারঙের, বেঁটে আর মোটা।

'বাতিঘরটা জাহাজডুবি ঘটানোর পক্ষে ভারি চমৎকার এট্রা জায়গা ছেল,' বলল সিওমা। 'জাহাজের ক্যাপ্টেনরা সোজা বাতিঘর-বরাবর জাহাজ চালিয়ে পাহাড়ের গায়ে গে' আছড়ে পড়ত। তারপর লগবইতে এই মিছে কথাগুলা লিখত: 'কুয়াশার জন্যে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। দিকসন্ধানী পাহারাদার লাইটওয়েস্ট বাতিঘররে জাহাজ বলে ভুল করেছেল।'

'কিন্তু এয়া ছেল বিলকুল মিছে কথা। লাইটওয়েস্ট বাতিঘর যে দেখতে কেমন ওরা সবাই খুব ভালো করেই তা জানত।

কিন্তু এই সুযোগটা ওরা লিত তেমন কোনো ঝামেলায় না-পড়ে টুক করে জাহাজগুলা ডুইবে দেয়ার জন্যে। বলতেছেন কেন এমনধারা করত? আরে, এয়া তো সোজা কথা। পচ্ছিমে এমনধারা রেওয়াজ চালু আচে যে একেকখান জাহাজ একবারে শেষ অবস্তায় পেঁছিলে সেখান বীমা করে ফেলা, তারপর তার মধ্যি যত রাজ্যির জঞ্জাল পুরে জাহাজখান লিয়ে গে' মাঝদরিয়ায় ডুবিয়ে দেয়া। বীমার টাকা পাবার জন্যেই এই বেবস্তা।

''ক্লন্‌ডাইক' জাহাজের ক্যাপ্টেনরে আমরা বলতাম 'গুয়ে পোকা', কারণ ভারি নোংরা পোশাক পরত সে। জেবনে কোনোদিন লিজের পেন্টুলুন বুরুশ করত না, কেউ তারে বুরুশ করার কথা বললে জবাব দিত, 'ভাবো কী আমারে, নিগার নাকি আমি যে লিজের পেন্টুলুন লিজে বুরুশ করব?' তা সে যাই হোক, এই 'গুয়ে পোকা'-ও একদিন 'ক্লন্‌ডাইক' জাহাজখান চালিয়ে লিয়ে গে' দুম করে ধাক্কা মারল লাইটওয়েস্টের কাছের পাহাড়ে। ভাবল, ভারি চমৎকারভাবে বুঝি কেল্লা ফতে করল সে।

'ধাক্কা মারার পর জাহাজের বেতার-ঘররে চিচ্‌কার করে বলল একখান এস-ও-এস পেইঠে দিতে। আর তখনই বাধল ঝামেলা। বেতার-কল গেছিল বিগড়ে। অপারেটর মুয়ে রক্ত তুলেও কল মেরামত করতে লারল। 'গুয়ে পোকা' রাগে-দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে নাগল।

'তারপরে আবার বিপদের উপরি বিপদ। সুমুদ্দুরের দিক থেকে এট্টা ঝড় উঠতে নাগল। পরদিন এমন জোর হাওয়া জাহাজের পাশে এসে নাগতে নাগল যে মাস্তুলগুলা ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলল আর রান্নাঘরে বাসনপত্তরের ঝনঝনানি শুরু হয়ে গেল। 'গুয়ে পোকা' দেখল ফাঁদে পড়ে

গ্যাচে সে, তখন তার মূত্তিটে যা ভয়ংকর হয়ে উঠল, কী বলি!

'তিন দিনের দিন অপারেটরের কপাল খুলল। যন্তরপত্তর ঠিকঠাক করে নে' সে এস-ও-এস পাঠাল। আর চারদিন হবার আগেই ডেকের ওপর দে' জল খেলে বেড়াতে নাগল। তারপর শুরু হল বরফ পড়তে।

'সেদিন সাঁঝবেলার মধ্যিই জাহাজখান জমে বরফ হয়ে গেল যেন। ঝড়ও কের্মে ভয়ংকর হয়ে উঠতে নাগল।

'পরদিন সকালে দূরে একখান জাহাজ দেখা গেল। আমরা সবাই ছুটে ডেকের উপর চলে এলাম আর যাতে ঢেউয়ের ঝাপটায় ভেসে না-যাই তার জন্যে দড়ি দে' আচ্ছা করে বেঁধে নেলাম লিজেদের।

'জাহাজখান আমাদের কাছাকাছি ঘুরঘুর করল কিছুক্ষণ। তারপর যখন বুঝল আমাদের জাহাজ উদ্ধার করা তার কম্মো লয়, তখন সরে পড়ল। এরপর 'গুয়ে পোকা'র মনে পাপপুণ্যির ভাবনা ঢুকল। সে স্বীকার পেল যে ইচ্ছে করেই জাহাজখান পাহাড়ে ঠোক্কর নাগিয়েচে। জাহাজের মালিকরে অভিসম্পাত দে' সে আমাদের কাচে ক্ষ্যামা চাইল।

'কিন্তু আমরা তখন এত ভেঙে পড়েচি যে তারে-যে আচ্ছা করে দু'ঘা দেব তারও ক্ষ্যামতা ছেল না।

'পাইলটের ঘরে জাহাজ চালানোর হুইলের সাথে লিজেরে বেঁধে রেখেছেলাম আমি। দিন-দুই পরে 'ক্লন্ডাইক'এর ডেকগুলো যখন সুমুদ্দুরের জলের সমান-সমান হয়ে দাঁড়াল তখন সবাই আমারে সেই ঘর থেকে টেনে বার করল। হুইলের তিনখান অর আমার বুকের পরে জমে গে' চেপে বসেছেল, তাই আমারে ছাইড়ে আনার সময় বুকের তিনটে জায়গায় ছাল ছাইড়ে গেছিল।

‘আপনেদেরে বলব কী, লাইটওয়েস্টে সেই পের্‌থম জাহাজডুবি হল অথচ সেজন্যে মালিক এট্টা পয়সাও পেল না। ‘গুয়ে পোকা’ জাহাজে থাকতে আমাদেরে যা কয়েছেল আদালতে সেই কথাই কবুল করল। সত্যি কথাটা কেন জানি হজম করতে পারল নি সে।

‘এয়ার পর পেশা বদল করল ‘গুয়ে পোকা’। এখন সে লন্ডনের জাহাজঘাটায় ইঁদুর মারার কাজ করে। এট্টা ঝোড়া নে’ ঘুরে বেড়ায় আর ইঁদুরের গত্তে সেঁকোবিষ-মেশানো পচা রুটি ছুড়ে-ছুড়ে দ্যায়।

‘তা, এই হল গে’ ব্যাপার! এখন, আপনেরা কী মনে করেন যে এতসব কান্ডের পর সাচ্চা জেবনবীমা কোম্পানি বলে-যে কিছু আচে তা আমি মরলেও বিশ্বেস করব? জাহাজডুবির পর যখন কিছুদিন হাসপাতালে ছেলাম আমি, তখন লিজেরে এই বলে বুঝ দেলাম: ‘কেমন, জিম বার্লিং, জেবনবীমা করবে নাকি কখনও? এমন কি হাজার পাউন্ডের জন্যেও জেবনটা বীমা করালে শুধুমাত্তর পুরানো দুনিয়ায় লয়, নতুন দুনিয়াতেও সবথেকে হাঁদা বলে তোমারে চিনে লেবে নোকে। বাব্বা, যথেষ্ট হয়েচে, আর লয়!’’

বলে কথাটায় জোর দেবার জন্যে সজোরে টেবিলে ঘুষি মারল সিওমা। আর চোপ ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলেন। এমন কি গাবুনিয়াও হাসল — বন্যার সেই রাত্রের পর এই প্রথম।

অবশেষে চোপ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে সিওমাকে বুঝিয়ে দিলেন ইংলন্ডে আর সোভিয়েত ইউনিয়নে বীমা-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়। শেষ পর্যন্ত সিওমা ব্যাপারটা বুঝল, তবে প্রথমদিকে সে-ও তার জিদ ছাড়তে রাজি

হচ্ছিল না। বিড়বিড় করে খালি বলছিল যে বিভিন্ন ধরনের ব্যাপারের একই নাম দিলে এরকম ঝামেলা তো বাধবেই, এতে তার অপরাধ কী!

ভুলটা ধরতে পেরে কিন্তু ভারি লজ্জিত হয়ে পড়ল সিওমা। তাই সে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। তখন চোপ একলা থেকে গেলেন গাব্রুনিয়ার কাছে।

ওর অসুখটা নিয়ে কথা বলতে-বলতে ম্যালেরিয়া-জ্বরের আলোচনায় চলে এলেন ক্যাপ্টেন। আর তারপর স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে বকে চললেন অনর্গল।

'বুঝলে হে, জারের আমলে পোতিতে থানা-দেয়া ফৌজের প্রত্যেকটি লোক প্রতি তিন বছর অন্তর মরে ফৌত হয়ে যেত। তা, কেমন মনে কর ব্যাপারটা? এ-থেকেই ফৌজের মধ্যে 'যমপুরী ককেশাস' নিয়ে গান বাঁধার চল হয়েছিল। লালচুলো বলে,' (হাসপাতালের ডাক্তার-সাহেবের নাম দিয়েছেন চোপ 'লালচুলো') 'লালচুলো বলে এ-তল্লাটে একটা বিশেষ ধরনের জ্বর হয়ে থাকে। তার নাম দেছে ওরা বাদার ব্যারাম। ও তোমার মিন্‌গ্রেলীয় মজুরদের আদ্ধেক নোকই এ-রোগে ভুগছে। মিথা সব্বদা মজুরদের যে-অসুখের কথা নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করে তা আমার মনে আছে। ওই-যে বলে, 'জ্বর বেশি হচ্চে না, তবু ওরা হেঁটেচলে বেড়াতে লারচে।' এই ব্যারাম ধরলে নোকের গায়ের তাপ স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে নেমে যায়। তবে তোমার এই অসুখটা সেরকম নয়। তোমার — যাকে বলে — খাঁটি পোতির জ্বর, তাই ধরেছে। তা, এতে তোমার দোষ কী! চারিদিকে তোমার যেমন পচাগলা বনবাদাড়, তেমনি স্যাঁতসেঁতে ভাব আর গরমি। এ একবারে পশ্চিম আফ্রিকার মতো।'

'পশ্চিম আফ্রিকায় আপনি কি কখনও গিয়েছেন?' শুধোল গাবুনিয়া।

'গেছি এক-আধবার,' ক্যাপ্টেন জবাব দিলেন। 'হ্যাঁ, ভালো কথা। জানো তো, নিগ্রোদের কখনও ম্যালেরিয়া ধরে না? মালয়ীদের ম্যালেরিয়া হয়, গ্রীষ্মমণ্ডলের আর সব জাতের লোকেরও এ-রোগ হয়। হয় না কেবল নিগ্রোদের। ভারি আশ্চর্য্যি কাণ্ড না? তা, লালচুলোকে এর কারণ আমি শুধিয়েছিলাম। সে বলে, যে-রোগবীজাণু থেকে ম্যালেরিয়া হয় তা মানুষের শরীরের ভেতরই বেড়ে ওঠে, তবে তার বাড়বাড়ন্তের জন্যে সূয্যির অতিবেগনী আলোর দরকার করে। কিন্তু নিগ্রোজাতের চামড়ার রঙ কালো বলে ওই আলো শরীরের ভেতর সেঁধোতে পারে না।'

'আপনি ফের বানিয়ে গপ্পো ফেঁদেছেন, চোপ,' গাবুনিয়া বলল। 'তবে আপনার গপ্পোগুলো কিন্তু শুনতে বেশ লাগে!'

শুনে শেয়ালের মতো চতুর চোখে ওর দিকে তাকালেন চোপ।

বললেন, 'কী বললে, বানিয়ে বলছি? আচ্ছা বেশ, লালচুলোকে শুধোও তাহলে। তা, এতে আমি কিছু মনে করব না, তুমি এখন অসুস্থ কিনা, তাই।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন বলুন দেখি, তারপর কী হয়?'

'মনে হয়, কুইনিন দেহের রক্তবওয়া নালিগুলোর দেয়ালে জমা হয় আর পাতলা একটা পর্দার মতো আবরণ তৈরি করে। এই পর্দা গলতেও বহুত্ সময় নেয়। এই কুইনিনই অতিবেগনী আলোকে আটকে রাখে, একেবারেই পৃথক করে রাখে তা। আর এই আলো মানুষের শরীরে ঢুকতে না-পারলে রোগবীজাণুও যায় মরে। এইজন্যেই এ-রোগে

কুইনিন এত কাজের। আমাকেও একবার পীতজ্বরে ধরেছিল, বুঝলে?'

'কোথায়?'

'প্রশান্ত মহাসাগরের একটা দ্বীপে। বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যি ওইসব দ্বীপের কথা ভাবলে আমার কুইনিনের কথা মনে পড়ে। তখন আমায় কুইনিন গিলতে হোত চায়ের চামচের এক-চামচ করে। কানে তালা ধরে আধপাগলা অবস্থা তখন আমার। ঘুরে বেড়াতাম মাতালের মতো টলতে-টলতে। আর যা খেতাম তাই-ই তেতো লাগত: কলা খাই, কলা তেতো, জল খাই, জলও তেতো। হাত দু'খানা নীলচে মেরে গেছিল। চেয়ার ছেড়ে উঠে ক্যাবিনের ওধারে বাঙ্কে গিয়ে শোয়াটাও তখন আমার পক্ষে মৃত্যুযন্ত্রনার সামিল ছিল। আর মনে হোত, গরমিটাও ফক্কিকারি ছাড়া কিছু নয়। মনে জানতাম বাতাসটা গরম, কিন্তু গায়ে ঠেকত তা ঠাণ্ডা বরফের মতো।

'দুর্গন্ধ, মিষ্টি বাস, ঘন গাছপালা... সব মেশামেশি হয়ে সেসব ভারি সাংঘাতিক জায়গা। সত্যি কথা যদি শুনতে চাও তো বলি। সব্বোনেশে অধঃপতনের জায়গা। কাচের মতো দৃষ্টিহীন চোখে কোঁকাতে-কোঁকাতে আর কাঁপতে-কাঁপতে টাল খেয়ে ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষে। উঃ, কী ভয়ানক!

'তোমরা যে এই ম্যালেরিয়ায় উজাড়-হওয়া নারকী দেশটাকে সাফসুতরো করে নিয়ে নতুন দেশ বানাচ্ছ, এ ভারি ভালো কথা। ভারি ভালো কথা।

'আগের দিনে লোকে যতসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরত। ম্যালেরিয়া চিকিচ্ছে-কেন্দ্রে লোকে বাড়িখানার চারপাশ কাচের শার্সি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে মুড়ত, তারপর

সেই কাচের শার্সির গায়ে আঠা লাগিয়ে রাখত। ক'দিন পর তারা দেখত বাড়ির কোনদিকের শার্সিতে সবচেয়ে বেশি মশা ধরা পড়েচে। যদি বাড়ির উত্তরদিকের শার্সিতে বেশি মশা আটকাত, তাহলে লোকে ধরে নিত উত্তর থেকে মশার পাল আসছে। পূবদিকের শার্সিতে বেশি মশা পড়লে মনে করত মশা আসছে পূবদিক থেকে। তারপর কেরোসিনের ক্যানেস্তারা বগলদাবা করে তারা সেইদিক পানে হাঁটা শুরু করত আর বাদাবনে কেরোসিন ছড়াত। বাচ্চাদের মতো এই এক খেলা ছিল সেকালে...'

হঠাৎ একসময় চমকে উঠে ক্যাপ্টেন বললেন:

'এই রে, এখন আমায় যেতে হয়। নাঃ, বড্ড বেশি বকবক করি আমি, আহাম্মক আর কাকে বলে। তোমার একটু চুপচাপ শুয়ে দু'দণ্ড বিশ্রাম করা দরকার।'

ক্যাপ্টেন চলে যাওয়ায় গাবুনিয়ার খারাপই লাগল। ওঁর কথা ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা শুনে গেলেও বিরক্তি ধরে না গাবুনিয়ার, বরং সে রীতিমতো খুশিই হয়। খুশি হয় ক্যাপ্টেনকে নানা ধরনের প্রশ্ন করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে 'বাইরে', অর্থাৎ হাসপাতালের দেয়ালের বাইরে, কোথায় কী ঘটছে না-ঘটছে তার খবর জেনে নিতে।

বাদার মালিক

শিকারে বেরোবে বলে আবাশিদ্জের কাছে কয়েকটা দিন ছুটি চাইল গুলিয়া। শুনে আবাশিদ্জে সন্দেহভরা চোখে ওর দিকে তাকালেন। নকশা আঁকার বোর্ডের ধারে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে লাগলেন তিনি।

ঠাট্টার সুরে শুধোলেন, 'শেয়াল কখনও বাদাকে ভুলতে পারে না। এটা সেই ব্যাপার বুঝি?'

কথাটা শুনে গুলিয়া লজ্জা পেল বলে মনে হল। হাতে-ধরা ফেল্টের টুপিটা মোচড়াতে লাগল দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে।

শেষে বলল, 'এই শেষবারের লেগে, দোস্ত্। আমি তোমাকে একদম খাঁটি কথা বলচি, মিত্যুশয্যেয় শুয়ে নোকে যেমন খাঁটি কথা বলে তেমনি। এই শেষবার। আমার এট্টা কাজ করার আচে। খুবই জরুরি কাজ, বুইলে, দোস্ত!'

'কী কাজ?'

'সময় হলেই সে তুমি জানতে পারবে।'

'ঠিক আছে, যাও তাহলে,' বললেন আবাশিদ্জে। 'দেখো, দু'দিনের মধ্যে কিন্তু ফিরে আসা চাই। শিগগিরই হোপি নদী-বরাবর বাদাগুলো জরিপ করতে বেরোব আমরা।'

যাওয়ার পথে ছাউনির ওয়র্কশপে ঢুকল গুলিয়া। ওর বন্দুকের ঘোড়াটা মেরামত করানোর দরকার ছিল। মেকানিকের পাশে উবু হয়ে বসে রুপোলি রঙের ধাতুর ঘোড়াটার ওপর র‍্যাঁদার আগুপিছু চলাচল নিবিষ্টমনে লক্ষ্য করতে লাগল সে।

দেয়ালের একটা ফাটল দিয়ে ভেতরে এসে-পড়া একফালি রোদ্দুরে ঝলমলে ইস্পাতের গুঁড়োগুলো ওপরে-নিচে উঠছিল নামছিল। ওই ফাটলের মধ্যে দিয়ে বাইরে তাকাতে গুলিয়ার চোখে পড়ল খালের বাঁধের ওপর ফেলা নতুন মাটির স্তূপ আর রোদ্দুরে-পোড়া ম্রিয়মাণ জঙ্গলটা। গাছের অবসন্ন ডালপালা থেকে পাতলা-পাতলা শুকনো ফেঁকড়া ঝুলে আছে মাটির দিকে মুখ করে।

মেকানিকটি কাজ করতে-করতে বলছিল, 'আহ্ ভাই রে! পাহাড় থেকে সেদিন ঢল নামল যখন তখন কত কান্ডই-

না ঘটতে দেখলাম আমরা। গাবুনিয়া-ইঞ্জিনিয়ার তো গোটা এট্টা আবক্ষমূত্তিই এনে হাপরের মধ্যি ফেললেন। ওটারে গালিয়ে ইঞ্জিনের জন্যে এট্টা যন্তর বানাতে বললেন ওনি আমাদের।'

'এট্টা আবক্ষমূত্তি?' হকচকিয়ে গিয়ে শুধোল গুলিয়া।

'হ্যাঁ, লেনিনের,' গলাটা নামিয়ে রহস্যময় ফিস্‌ফিসানির সুরে কথাটা বলল মেকানিক। 'নোকে বলে ওনি নাকি লেনিনগ্রাদ থেকে মূত্তিটা এনেছিলেন ত্‌বিলিসিতে, তারপর সেখেন থেকে এখেনে। মূত্তিটা লষ্ট করে ফেলতে হল বলে নাকি ভারি কষ্টও পেয়েছিলেন।'

'তা তো বুইলাম, কিন্তু আবক্ষমূত্তি কারে কয়?' ফের একবার শুধোল গুলিয়া।

'খোদাই-করা ছোট্ট এতটুকুন এট্টা মূত্তি গো, বুইলে না? তারেই নোকে আবক্ষমূত্তি কয়।'

এবার গুলিয়া মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, অবশ্যই বুঝেছে সে। অমন কত আবক্ষমূর্তি দেখেছে সে। সেই রোমান স্ত্রীলোকটির মূর্তির কথাও মনে পড়ল ওর। অল্প একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে শুধোল:

'বলচ ওনি ভারি কষ্টও পেয়েছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ রে ভাই।'

আর কিছু না-বলে বন্দুকটা তুলে নিল গুলিয়া। একগোছা শুকনো তামাকপাতায় বন্দুক-মেরামতের দাম মিটিয়ে দিল মেকানিককে। তারপর রওনা দিল জঙ্গলের উদ্দেশ্যে।

পুরো দু'দিন বাদায়-বাদায় ঘুরে বেড়াল গুলিয়া। তারপর তিন দিনের দিন এসে দেখা দিল পোতি শহরের 'জলযোগ' নামের দুখানটিতে। সেখানে দুখানওয়ালার সঙ্গে ফিস্‌ফিস করে কী-সব পরামর্শ করল অনেকক্ষণ সময় নিয়ে। ওর

সঙ্গে ছিল বড় একটা বস্তা, আর তাতে ভারিমতো কিছু-একটা ছিল।

সেদিন সকালটা ছিল রোদ্দুরে ঝলমলে। দুখানের ভেতরটাও ছিল উৎসবের ভাবে ভরা। বেচোর রঙিন ছবিতে সদ্য-লাগানো তেলরঙ জ্বলজ্বল করছিল, আর তা থেকে নীল আর হলুদ রঙের ছোপগুলো প্রতিফলিত হচ্ছিল গুলিয়া আর দুখানওয়ালার চোখের মনিতে। এর ফলে ওদের দু'জনের সলা-পরামর্শেও কেমন একটা শেয়ালসুলভ খুশির ছোঁয়াচ লাগছিল।

দুখানওয়ালা ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছিল আর তর্ক করে যাচ্ছিল। আর থেকে-থেকেই সে হাত বাড়িয়ে গুলিয়ার সঙ্গের বস্তাটা টিপে পরখ করে দেখছিল আর মাথা নাড়ছিল। এরপর সে আর গুলিয়া দু'জনে মিলে টেনে বস্তাটা পেছনের আর-একটা চালাঘরে নিয়ে গেল।

সন্ধেবেলায় গুলিয়াকে দেখা গেল হাসপাতালে। ইতিমধ্যে গাবুনিয়া তার নিজের ঘরের মধ্যে একটু-একটু হেঁটে-চলে বেড়াতে শুরু করেছে। তবে তাকে হাঁটতে হচ্ছে কখনও দেয়াল, কখনও আসবাবপত্র ধরে, তাদের ওপর ভর দিয়ে হাঁটি-হাঁটি পায়ে।

বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে গুলিয়া গাবুনিয়ার ঘরে ঢুকল। ওর মুখে গভীর একটা শ্রদ্ধার ভাব মাখানো। দরজার কাছে একটু থামল ও, তারপর নিচু হয়ে গাবুনিয়াকে কুর্নিশ করল। ওর খোঁচা-খোঁচা মাথা-মুড়িয়ে-ছাঁটা চুলে ঝিলিক দিল কালোর মধ্যে ছড়ানো-ছিটনো রুপোলি।

'সেলাম, কমরেড,' গাবুনিয়াকে বলল ও। তারপর জ্যাকেটের ভেতর থেকে মস্ত বড় একটা পুঁটুলি বের করে

ফের বলল, 'গরিব বেচারার কাছ থেকে এই উপহারটা গ্রহণ করেন। এয়া আস্বাদ করে দ্যাখেন আর ভালো থাকেন।'

ভারি পুঁটুলিটা হাতে নিয়ে খুলে ফেলল গাবুনিয়া। ভেতরে পুরু মোড়কে মোড়া ছিল সোনালি চর্বি-ছিটনো মদ্দা শুয়োরের রাংয়ের মাংস। মৃদু একটা আলকাতরার গন্ধ ছাড়ছিল মাংসটা থেকে।

গুলিয়ার দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে গাবুনিয়া বলল, 'ধন্যবাদ, দোস্ত্। তুমি তাহলে শিকার করা ছাড় নি এখনও?'

শুনে কেমন শক্ত হয়ে উঠল গুলিয়া।

পরে বলল, 'নাঃ, ছেড়ে দিচি। এয়া আমার শেষ শিকার— এই মদ্দা শোর। আপনে যখন আমারে মেয়াদ খাটার হাত থেকে বাঁইচেছেলেন তখন আমি মনে-মনে কয়েছেলাম নিজেরে: 'বাদায় শেষবারের মতন যে-মদ্দা শোরটা মারবি তুই তা সাম্‌ত্রেদির বুড়া ইঞ্জিন-ডেরাইভারের বেটা গাবুনিয়া-ইঞ্জিনিয়াররে ভেট দিতে নাগবে। ওনি তোরে মানুষ করেচেন, ভুলিস নে।' এই আমার শেষ শিকারের ফসল, এই মদ্দা শোর। বাদা-অঞ্চলের মিত্যু ঘনিয়ে এয়েচে, পেরান ফিরে পেয়েচে মানুষজন। আরও এট্টা কথা আপনেরে বলার ছেল। আপনের ঘরে ছোট্ট একখান মূর্ত্তি ছেল বলে জানি। আপনে সেটা আগুনে ফেলে দেছিলেন। তা, তার জন্যে আপনের মন পোড়ে নাকি?'

'পোড়ে বৈকি, দোস্ত্।'

'মেকানিক-মিস্তিরিও সেই কথাই বলতেছেল। তা, আপনে তার জন্যে মনখারাপ করেন না। ফের যখন হাঁটাচলা করতে পারবেন আপনে আর অবসর পাবেন খানিক, তখন আপনে আর আমি দুইজনায় একদিনের তরে বাদায় যাব আর

সেখেনে দারুণ এট্টা জিনিস দেখাব আপনেরে। জিনিসটারে বাদার জল মানুষের চোখের আড়াল করে রেখেচে। আমি ছাড়া আর কেউ জিনিসটার হদিশ রাখে না।'

'কিন্তু কী জিনিস সেটা?'

'ব্যস্ত হয়েন না। সময় হলেই দেখতে পাবেন। হাজার বছর ধরে বাদার জঙ্গলে পড়ে আচে সেটা।'

বলে গুলিয়া হাসল।

ফের বলল, 'এতকাল আমি ছেলাম বাদার মালিক, যেমন এককালে মিন্‌গ্রেলিয়ার মালিক ছেল সামন্তরাজা দাদিয়ানি। বাদার তদারকি করতাম আমি। যা পেতাম বাদায় তা-ই হোত আমার সম্পত্তি। এই জিনিসটাও আমার। তবে আপনে খোদাই-করা মূর্ত্তি পছন্দ করেন বলে আপনেরে এয়া আমি দিতে চাই।'

এরপর হাজার প্রশ্ন করেও গাবুনিয়া গুলিয়ার পেট থেকে কিছুতেই কথাটা বের করতে পারল না যে বাদার জলে লুকনো বস্তুটা কী। গুলিয়া শুধু নিঃশব্দে মাথা নাড়তে লাগল, একটি কথাও বলল না।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দুখানে ফিরে গেল সে। ওইদিন সন্ধেয় আর্তেম কর্‌কিয়া, বেচো আর তাদের আরও কয়েকজন বন্ধু জড় হয়েছিল দুখানে পোতির সবচেয়ে সাহসী লোক ফোর্‌ম্যান মিখাকে অভ্যর্থনা জানাতে। বন্যার সেই রাত্রে মিখার বীরত্বের কথা ইতিমধ্যে লোকের মুখে-মুখে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল।

গুলিয়া যখন দুখানে ঢুকল আর্তেম কর্‌কিয়া তখন তার কাঠের লাঠিগাছখানা উঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'এ কী কথা শুনতে পাচ্ছি, দোস্ত? তুমি নাকি তোমার শিকারি কুকুরটারে বেচে দেছ?'

'হ্যাঁ রে বুড়া বাচাল, আজ আমি আমার বন্দুকটাও বেচব,' কর্কিয়ার পাশে বসতে-বসতে গুলিয়া বলল। 'গতরখাটা নোকের বন্দুকে কী কাম? তার দরকার শক্ত-সমর্থ কাজের দু'খানা হাত।'

পলায়ন

নতুন 'শ্বেতকেশী' চায়ের চারা বোনা হবে কোথায়, পাহাড়ের ঢালুতে না পাহাড়ের নিচে খোয়াইয়ের খোঁদলে, তা নিয়ে মাস-ছয়েক আগে লাপ্শিন আর নেভ্স্কায়ার মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। লাপ্শিন তখন জিদ ধরে যে খোয়াইয়ের খোঁদলেই এই চায়ের চারা বোনা উচিত, কেননা তাহলে ঝোড়ো বাতাসে তাদের ক্ষতি হবে না। অপরদিকে নেভ্স্কায়া বলতে থাকে যে পাহাড়ের উৎরাইতেই চা-টা বোনা দরকার। তার যুক্তি ছিল এই যে খোঁদলের মধ্যে বুনলে ঠাণ্ডায় চায়ের ক্ষতি হবে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের ঢালু আর খোয়াইয়ের খোঁদল দুই জায়গাতেই পরীক্ষামূলক চা-আবাদ গড়ে তোলা হল, আর যথাসম্ভব যত্ন নিয়ে তা লালনও করা হল। দুই জায়গায় চা-গাছের বাড়বাড়ন্তের তুলনা করাটা সাধারণ মানুষেরও আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল তখন।

ইতিমধ্যে অপর একজনের সঙ্গেও আরেকটা ব্যাপারে লাপ্শিনের মতান্তর ঘটল। এবার তা ঘটল এঞ্জিনিয়র গাবুনিয়ার সঙ্গে।

প্রধান খাল-অঞ্চলের নিকাশী জমিতে পাতিলেবুর বাগান করবে বলে ঠিক করেছিল লাপ্শিন। কিন্তু গাবুনিয়া এতে

প্রবল আপত্তি তুলল। তার মনে হল খালের ধারের জমি র‍্যামিগাছের আবাদ করার পক্ষে আরও বেশি উপযুক্ত।

কাখিয়ানি ওদের এই বিবাদে হস্তক্ষেপ করলেন, তারপর সালিশ মানলেন মস্কোকে। মস্কোও র‍্যামিগাছ বোনার পক্ষে রায় দিল।

এতে নেভ্‌স্কায়া মন্তব্য করল যে উদ্ভিদবিদ্যার পাঠ আরও একবার ঝালিয়ে নিলে লাপ্‌শিন ভালো করবে। এ-কথায় বিষম অপমানিত বোধ করল লাপ্‌শিন, নেভ্‌স্কায়ার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিল সে। মেয়েটির সবজান্তা ভাবে সে ভারি বিরক্তি বোধ করতে লাগল। কোনো ছুতোয় নেভ্‌স্কায়াকে কীভাবে পাল্‌টা অপমান করা যায় তারই সুযোগের অপেক্ষায় রইল লাপ্‌শিন। আর শিগগিরই এমন একটা সুযোগ মিলেও গেল।

সঙ্গীত-মহাবিদ্যালয় একখানা চিঠিতে ফ্রান্সের প্রভাঁস-অঞ্চলের খাস বাসিন্দা একধরনের নলখাগড়া সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানতে চেয়েছিল। সঙ্গীত-মহাবিদ্যালয় জানতে চাইল ওই বিশেষ জাতের নলখাগড়া কলখিদায় আপনি-আপনি বুনো অবস্থায় জন্মায় কিনা এবং পোতির কাছে কোথাও ওই নলখাগড়ার চাষ সম্ভব কিনা। চিঠি পড়ে অবজ্ঞায় কাঁধ ঝাঁকিয়েছিল লাপ্‌শিন। নলখাগড়ায় সঙ্গীত-মহাবিদ্যালয়ের প্রয়োজনটা কী, মনে হয়েছিল ওর। চিঠিটার এক কোণে দুর্বোধ্য হাতের লেখায় তাই সে লিখে রেখেছিল:

‘জবাব: কলখিদায় এমন কোনো নলখাগড়া নেই, কস্মিনকালে তা ছিলও না।’

এরপর চিঠিখানা দৈবক্রমে নেভ্‌স্কায়ার হাতে পড়ে। সে একদিন ওই বিশেষ জাতের নলখাগড়ার গোলমতো, শুকনো

একটা ডাঁটা সমেত চিঠিখানা ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে লাপ্‌শিনের টেবিলে রাখল।

বলল, 'আপনি ভুল করছেন। এমন নলখাগড়া বুনো অবস্থায় কলখিদায় জন্মায়। এই দেখুন তার নমুনা।'

'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু এই নলখাগড়ায় সঙ্গীত-মহাবিদ্যালয়ের দরকারটা কী?'

'কী দরকার? কেন, ক্লারিনেট, ব্যাসুন-বাঁশি আর ওবো তৈরি করতে লাগবে।'

'খেলনা-হুইস্‌ল তৈরি করার চেয়ে আরও অনেক গুরুতর কাজ আমাদের করার আছে, বুঝলেন?'

'কেন, গান-বাজনার কী কোনো দাম নেই?'

'গান-বাজনা সম্বন্ধে আমার শুধু এটুকুই বলার আছে যে তা হল অনর্থক, অকারণ হৈ-হল্লা,' বলল লাপ্‌শিন।

শুনে নেভ্‌স্কায়ার মুখখানা লাল হয়ে উঠল। ভাবল, সংস্কৃতি সম্বন্ধে আচ্ছা অজ্ঞ লোক তো! অথচ কলখিদা পুনঃসৃষ্টির এই মহনীয় ব্রত, যা নাকি বীটোফেনেরও মহত্তম সিম্ফনি-সঙ্গীত সৃষ্টির প্রেরণা যোগাবার যোগ্য, তারই একজন অংশীদারের মুখ থেকে এমন কথা শুনতে হল!

ওইদিনই একটু রাত করে লাপ্‌শিন 'জলযোগ' নামের দুখানটাতে ঢুকল। এককালের এই সরাইখানাটি অনেকদিন আগেই যদিও সমবায়-ব্যবস্থার কর্তৃত্বে এসে গিয়েছিল আর রেস্তোরাঁ হিসেবে পরিচালিত হচ্ছিল, পুরনো ওই নামটা রয়ে গিয়েছিল তবু।

বেশ কিছুদিন থেকে অনিদ্রারোগে ভুগছে লাপ্‌শিন। এর জন্যে ও দায়ী করে কলখিদার এই বাষ্পস্নানের ঘরের মতো গরম আবহাওয়া আর নেভ্‌স্কায়ার রূঢ় ব্যবহারকে। ওর

মতে, এই ব্যবহারের কারণেই ওর বর্তমান 'স্নায়বিক উত্তেজনা'-র অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই ও দুখানে ঢুকেছে দু'এক পাত্র মদ্যপান করতে, আশা করছে যে মদ খেলে হয়তো রাত্রে ঘুম আসলেও আসতে পারে।

ততক্ষণে দুখানটা প্রায় খালি হয়ে গেছে। কাউন্টারের পেছনে বসে দুখানওয়ালা কেবল প্যাঁচার মতো ঢুলতে লেগেছে। ঘরের ভেতরকার আবছা আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে বেচোর আঁকা ছবিখানা।

ছবিখানা ভালো করে দেখার জন্যে একটু থামল লাপ্‌শিন। কী-যে এলোমেলো কাণ্ডমাণ্ড করেছে বেচো তার ঠিক নেই! রোডোডেনড্রন গাছের পাতা আবার ওইরকম দেখতে হয় নাকি? শিল্পীরা কেন-যে সবসময় বাস্তবতাকে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী উল্‌টেপাল্‌টে বদলে নেয়, কে জানে! এতে কার কী ভালো হয়, কে বলবে?

এর পরে ওর নজরে পড়ল যে ঘরের উল্‌টোদিকে নেভ্‌স্কায়া আর গাবুনিয়া বসে আছে। গাবুনিয়া দূর থেকে ডাকল লাপ্‌শিনকে, তারপর ওর জন্যে আরও একখানা চেয়ার টেনে আনল। কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও লাপ্‌শিন গিয়ে বসল ওদের কাছে। নেভ্‌স্কায়ার সাহচর্যে আজকাল ও কেমন অস্বস্তি বোধ করে।

ও আসায় যে-নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল তা ভাঙার জন্যে বেচোর ছবির দিকে তাচ্ছিল্যভরে ইঙ্গিত করে লাপ্‌শিন বলল:

'ওই হযবরল-টার দিকে যতই তাকাই, ততই রাগ হয় আমার। ওই-যে ওগুলো, ওগুলোকে কি পাতিলেবু বলেন আপনি? ও তো বিয়ারের বোতল!.. কিংবা ধরুন, ওই পাতাগুলো! ওগুলোকে তো সবুজ চিনেমাটির টুকরো বলে

মনে হচ্ছে... আর রিওন নদীতে কস্মিনকালেও স্টিমার চলে নি, কেননা নদীটা একেবারেই গভীর নয়। আর কলখিদার উদ্ভিদকুল ছবিটাতে যতটা জমকালো আর হরেক রকমের করে এঁকে দেখানো হয়েছে কোনোকালে তার অর্ধেকও হবে কিনা সন্দেহ। আমি বুঝি না কেন-যে শিল্পীদের খামখেয়াল অনুযায়ী চারপাশের জগৎকে এতখানি পাল্‌টে দেবার অনুমতি দেয়া হয়!'

ওর কথা শুনে গাবুনিয়া হাসল। আর রাগে লাপ্‌শিনের শরীর যেন হিম হয়ে এল।

'আচ্ছা, জানতে পারি কি, এটা দেখে আপনি কতদূর কী বুঝেছেন?' এমন একটা সুরে প্রশ্নটা শুধোল ও যে তা ওর নিজের কানেই বিশ্রী শোনাল। 'এই আঁকিবুকির মধ্যে কী এমন খুঁজে পেয়েছেন আপনি?'

'ভবিষ্যৎকে খুঁজে পেয়েছি,' উত্তর দিল গাবুনিয়া। 'আচ্ছা, ভালো কথা, আপনি কি কখনও লেনিনের লেখা পড়েছেন? আর পিসারেভের?'

'পড়েছি সামান্য।'

'তাহলে এই কথাগুলো আপনার হয়তো মনে পড়তে পারে,' আস্তে-আস্তে, প্রায় যেন অনিচ্ছাভরে বলে চলল গাবুনিয়া। 'লেনিন লিখেছেন যে এমন কি সবচেয়ে প্রাথমিক স্তরের যে-সাধারণ ধারণা তাতেও কল্পনার কিছু-না-কিছু টুকরোটাকরা থাকে। তিনি এও বলেছেন, সবচেয়ে যথাযথ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কল্পনার স্থানকে অস্বীকার করা অসম্ভব। তাছাড়া কল্পনার ব্যাপারটা না-থাকলে আমাদের পক্ষে কখনোই কল্‌মাটাজ জলনিকাশী ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হোত না, কলখিদায় কোনোকালে ইউক্যালিপ্টসের ঝাড় জন্মাত না।

'লেনিন পিসারেভ থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পিসারেভ মোটামুটি এই ধরনের কথা বলেছেন: 'মানুষের যদি পূর্বানুমানের ক্ষমতা না-থাকত, যা-কিছু সে সবে সৃষ্টি করতে শুরু করেছে পূর্বাহ্নে তার পূর্ণাঙ্গ একটা চিত্র মনশ্চক্ষে যদি সে প্রত্যক্ষ করতে অসমর্থ হোত — তাহলে শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রাত্যহিক কাজের জীবনে তার বহুব্যাপক ও ক্লান্তিকর, আয়াসসাধ্য পরিশ্রমে রত হতে ও কর্মসম্পাদনে প্রবৃত্ত হতে কোন চালকশক্তি-যে তাকে বাধ্য করত তা ভেবে আমি কূলকিনারা পাই না।' এই দেখুন, গোটা অংশটাই আমি প্রায় অক্ষরে-অক্ষরে মুখস্থ বললাম, অথচ ভয় পাচ্ছিলাম ম্যালেরিয়ায় বুঝি আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—এই হল আপনার প্রশ্নের উত্তর। বেচোর ছবি কলখিদার ভবিষ্যৎকে দেখাচ্ছে। আমি যখন এই ছবিটার দিকে তাকাই তখন বেচোর আঁকা ওই দেশে আমার থাকতে ইচ্ছে করে। আর আমি থাকবও সেদেশে।'

'খুব ভালো কথা!' বলল লাপ্‌শিন। ওকে ভীষণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। 'এটা আমি মানতে রাজি। কিন্তু তাবলে এই দেয়ালে যা আঁকা হয়েছে তার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার গরমিলকে আপনি ব্যাখ্যা করবেন কীভাবে?'

এবার নেভ্‌স্কায়া মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল।

বলল, 'কীভাবে ব্যাখ্যা করব? কেন, ব্যাখ্যা করব এই কথা বলে যে আমাদের চারপাশের জগতের ডাহা মোটাদাগের নীরস অনুকরণ শেষ হয় যখন তখনই ঘটে সত্যিকার সৃষ্টিকর্মের সূচনা। আর বিজ্ঞানও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। প্রকৃতি শুধু উৎপাদন করতে জানে, সৃষ্টি করতে জানে না। একমাত্র মানুষই পারে সৃষ্টি করতে।'

এ-কথার কোনো উত্তর দিল না লাপ্‌শিন। নেভ্‌স্কায়ার বক্তব্য ঠিক ধরতে পারল না ও।

ওদের এই আলোচনা যখন চলছে তার মধ্যে শহরের পার্কের দুই বেহালাবাজিয়ে দুখানে এসে ঢুকেছিল। একটা খালি টেবিলের পাশে চুপটি করে বসে ছিল তারা, আর তাদের বাজনাদুটোর তারে থেকে-থেকে টোকা দিয়ে মৃদু পিড়িঙ্‌-পিড়িঙ্‌ শব্দ তুলছিল।

আর ছোট-ছোট স্ফটিকের পুঁতি মেঝেয় গড়ালে যেমন শব্দ হয় তেমনি ঠুনঠুন বোল তুলে সেই হালকা শব্দ ঘরময় গড়িয়ে-গড়িয়ে যাচ্ছিল।

লাপ্‌শিনের চুপ মেরে যাওয়া আর তার স্পষ্ট নিঃস্পৃহা লক্ষ্য করে নেভ্‌স্কায়া কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। তার ভয় হচ্ছিল, আক্রমণটা বোধহয় একটু বেশি কড়া হয়ে গেছে।

তাই বন্ধুভাবে হেসে এবার সে বললে, 'আচ্ছা শুনুন, আপনি বোধহয় বাজনার তেমন ভক্ত নন, তাই-না? কিন্তু আমি একটা গীতিনাট্যের গানের কথা জানি... সেই-যে সেইটে, মনে পড়ছে আপনার?' শেষের এই বাক্যটা গাবুনিয়াকে উদ্দেশ করে বললে ও। '...আমার মনে হয় আপনি যদি সেই গানের সুরটা বাজনায় শোনেন এখন, তাহলে বুঝবেন এ-ব্যাপারে কতখানি ভুলধারণা ছিল আপনার।'

বাজনদার দু'জনের কাছে গিয়ে নেভ্‌স্কায়া তাদের 'ইস্কাপনের বিবি' গীতিনাট্য থেকে লিজার গানের সুরটা বাজাতে অনুরোধ করল। বলল, 'মনে পড়ছে আপনাদের সেই-যে 'এল এল মেঘ, বজ্রগর্ভ মেঘ...' সেই গানটা...'

সঙ্গে সঙ্গে গাব্রুনিয়াও এক-বোতল মদ বাজনদারদের টেবিলে পৌঁছে দিল।

বাজনদারেরা নিজেদের মধ্যে কী কানাকানি করলে, তারপর সুন্দর সঙ্গীততে-ভরা একটা ভঙ্গিতে বেহালাদুটো কাঁধে তুলে নিলে। মোহময় আবেশে-ভরা সেই সুর দুখানওয়ালাকে এতক্ষণে জাগিয়ে তুলল। হাই তুলে চোখদুটো কচলাল সে, তারপর ঘাড়টা ফিরিয়ে বাজনদারদের দেখতে লাগল। সাধারণ একটা মোটাসোটা বুড়ো লোক যার গোটা জীবন সরাইখানার কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে কেটেছে, তারও থলথলে মুখখানাকে মৃদু একটা হাসি একেবারে বদলে দিল যেন।

এমনভাবে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল বেহালাদুটো যে মনে হল নিজেদের বাজনা শুনেই ওদের বুকদুটো যেন ফেটে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ একসময় থেমে গেল বাজনা। আর দুখানওয়ালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল একটা।

'তাহলে? এখন কী বলার আছে আপনার?' শুধোল নেভ্স্কায়া।

'কিছু না,' জবাব দিল লাপ্‌শিন। তারপর যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বলে গেল, 'আমি মনে করি না একমাত্র প্রেমিক-প্রেমিকা ছাড়া গান-বাজনায় আর কারও আগ্রহ থাকতে পারে। আর একমাত্র যাদের এই গান-বাজনায় আগ্রহ আছে তারাই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যাপারেও উৎসাহ বোধ করে থাকে। যেমন ধরুন, নলখাগড়ায়।'

শুনে নেভ্স্কায়ার গালে রক্ত ছুটে এল।

'তার মানে? কী বলতে চান আপনি?' শুধোল সে।

'বলতে চাই, আপনি ভারি সেন্টিমেন্টাল।'

শ্বনে ম্বখখানা ঘ্বরিয়ে নিতে-নিতে নেভ্স্কায়া বলল, 'কী-যে বোকার মতো কথা বলেন না!'

অস্বস্তিকর একটা স্তব্ধতা নেমে এল ঘরখানায়। লম্বা-লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল লাপ্শিন। অবশেষে প্রতিশোধ নিতে পেরেছে সে। যে-দরজা দিয়ে লাপ্শিন বেরিয়ে গেল সেদিকে তাকিয়ে ছিল দ্বখানওয়ালা।

লোমে-ভরা ব্বকখানা চুলকোতে-চুলকোতে এবার সে ঘড়ঘড় করে বলল, 'ছোঁড়াটা তেমন য্বতের নোক না!'

দেখা গেল 'শ্বেতকেশী' চা যেমন পাহাড়ের উৎরাইয়ে তেমনি খোয়াইয়ের খোঁদলে একই রকম চমৎকার ফলেছে। আর কাখিয়ানি সহ বেশকিছ্ব লোক রায় দিলেন যে খোঁদলের ভেতরে জন্মানো চা-গাছই বরং দ্বয়ের মধ্যে বেশি ভালো হয়েছে। কেননা সেখানকার চায়ের ঝোপগ্বলো বেশি শক্তসমর্থ হয়ে উঠেছে, গাছে পাতার ফলনও হয়েছে বেশি। নেভ্স্কায়া মেনে নিল যে তার ধারণা ভুল ছিল। লাপ্শিনের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল সে।

দ্বটো জায়গার বাগান থেকেই তখনও চটচটে আঠালো রয়েছে এমন কচি-কচি পাতা তোলা হল, তারপর তা শ্বকিয়ে ব্যবহারের উপযোগী করার জন্যে এক চা-কারখানায় পাঠিয়ে দেয়া হল। পাতার স্বাদ-গন্ধ পরীক্ষা বাকি ছিল তখনও।

অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবহারের উপযোগী হয়ে দ্বটো জায়গার চা-পাতার নম্বনা ফেরত এল। প্রত্যেকটা নম্বনার একেক ম্বঠো বাড়িতে নিয়ে এল নেভ্স্কায়া।

সঙ্গে সঙ্গেই চোপ দ্বটো নম্বনা থেকে চা বানাতে লেগে গেলেন। চায়ের নাম শ্বনলেই ওঁর মন পড়ে যায় সেই সেকালের কথা — যখন ও'র চা-বাহী জাহাজের মাল্লারা

জাহাজের খোল থেকে মুঠো-মুঠো ‘শ্বেতকেশী’ চা সরাত আর বানাত সুগন্ধি, সুস্বাদু, সবুজরঙের পানীয়।

নেভ্‌স্কায়া বাড়ি ছিল না তখন। রাত্রে যখন সে বাড়ি ফিরল, দেখল চোপ ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে আছেন। নেভ্‌স্কায়ার মনে হল ক্রিস্তফোরিদি ফের বুঝি কিছু উৎপাত বাধিয়েছে। এবার ও ছেলেটার পক্ষ নেবে ঠিক করল। কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটা তা নয়। চোপ ওকে দেখতে পাওয়ামাত্র হৈ-চৈ শুরু করে দিলেন:

‘ও মেয়ে, সেকেলে জরদ্‌গব ছোঁড়াটাকে আপনি দেখি দারুণ হারা হারিয়েচেন! অভিনন্দন জানাই আপনাকে! ওর চা আমি চেখে দেখিছি। থু-থু, মুখে দেয়া যায় না! পাটকাঠিসেদ্ধ জলের মতো সোয়াদ তার! দেখুন, আপনি নিজেই চেখে দেখুন একবার!’

বলতে-বলতে নেভ্‌স্কায়াকে এককাপ চা ঢেলে দিলেন তিনি। নেভ্‌স্কায়া চেখে দেখল, সত্যি, অদ্ভুত একটা ধাতব স্বাদ চা-টায়।

‘লোকটা সোভিয়েতের আধা-গ্রীষ্মমণ্ডল এলাকার বদনাম গাইতে চেষ্টা পাচ্ছে,’ বললেন চোপ। ‘আচ্ছা, এবার এই কাপের চা-টা চেখে দেখুন দিকি। আপনার বোনা চা।’

বাধ্য মেয়ের মতো এ চা-টাও চেখে দেখল নেভ্‌স্কায়া। এবার সে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটা কড়া সুগন্ধ পেল চায়ে।

‘অথচ দুটো একই জাতের চা, একই ‘শ্বেতকেশী’ চা দুটোই,’ বলে উঠলেন চোপ।

কিন্তু স্বাদে-গন্ধে একই জাতের দুটো চায়ে এত তফাত হল কী করে? নেভ্‌স্কায়া স্থির করল, স্পষ্টতই এর কারণ এই যে পাহাড়ের ঢালু জায়গাটা নিচের খোঁদলের চেয়ে

বেশি গরম আর কম স্যাঁতসেঁতে। খোঁদলের মধ্যে ঠান্ডা হাওয়া জমা হয় আর তা জমেও থাকে অনেকক্ষণ।

এর আগে নেভ্‌স্কায়া অসংখ্যবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখেছে পাহাড়ের উৎরাই আর পাহাড়ের নিচের খদের মধ্যে সর্বদাই উত্তাপের হেরফের ঘটে থাকে, এমন কি তাতে পাঁচ ডিগ্রি পর্যন্তও তফাত ঘটে। শীতের মাসগুলোয় উত্তাপের এই তারতম্য তো বিশেষ করেই নজরে পড়ে। চা নিয়ে এই পরীক্ষা চালানোর ফলে ফের একটা জোরালো প্রমাণ জুটে গেল যে কলখিদায় গ্রীষ্মমন্ডলীয় গাছপালা পোঁতার ব্যাপারে অণু-আবহাওয়ার পরিবেশের এই তীব্র তারতম্যের কথাটা মনে রেখে অত্যন্ত সতর্কভাবে এগনো উচিত।

এর কয়েকদিনের মধ্যেই চাক্‌ভা থেকে সরকারি রিপোর্টও এসে গেল। রিপোর্টে লাপ্‌শিনের চা-কে মাঝারি ধরনের আর নেভ্‌স্কায়ার চা-কে একেবারে উন্নততম মানের বলে গণ্য করা হয়েছে। ওইদিনই লাপ্‌শিন ছুটি চেয়ে দরখাস্ত পেশ করল কাখিয়ানির কাছে। কাখিয়ানি তাকে অনেক বোঝালেন, চটে উঠে তর্ক করলেন, কিন্তু লাপ্‌শিন অটল হয়ে রইল। অবশেষে কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিরস্ত হলেন কাখিয়ানি। লাপ্‌শিনকে তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না।

ওঁর মনে হল, মানুষ জাতটার মস্তিষ্কে বুঝি বুদ্ধি বলে কিছু নেই। কী চায় লোকটা? বিশ্রাম নিতে? তা, ও তো যেখানে আছে সেখানে থেকেই আর গবেষণার কাজ বন্ধ না-করেই বিশ্রাম নিতে পারে। রোদ্দুর পোহাতে চাই? তা, কলখিদাতেই তো রোদ্দুর আছে অঢেল। সমুদ্র এখানে বিশাল, হাওয়াও চমৎকার। নিস্তব্ধতা চায়? কিন্তু নিস্তব্ধতা

পাওয়া তো কোনো সমস্যাই নয়, বিশেষ করে লাপ্‌শিন যে-এলাকায় থাকে পোতির সেই শহরতলিতে। সেখানে এমন কি কুকুরের ডাকও শোনা যায় না। এর বেশি আর কী চায় সে? কিন্তু লাপ্‌শিন জিদ ধরায় কাখিয়ানি ওর দাবি মেনে নিলেন। কী আর করবেন? তবে তাঁর আপত্তিটা ছিল প্রধানত নীতিগত। লাপ্‌শিন চলে যাওয়ার পর কাখিয়ানি নিজের মনে বিড়বিড় করে বলতে থাকলেন:

'কোনো স্ত্রীলোক যদি আমারে হারিয়ে দ্যায়, মাথা নিচু করে আমি তারে ধন্যবাদ দেব। পাকামাথা এঞ্জিনিয়র বটি তো আমি, নাকি? অপমান বোধ হয়েচে যতসব বাজে ওজর! কেন-যে ছোঁড়া কেটে পড়তে চায় আমি যেন তা বুঝি না! ইঃ, একেবারে কুসুমকোমল প্রাণ আর-কি! প্রেত্যেকেরই অহঙ্কার বলে বস্তু আচে, মান-অপমান বোধ আচে। কিন্তু কখন-যে অহঙ্কার হজম করে নিতে হয় আর কখন-যে তা দেখাতে হয় তা মানুষের জানা উচিত বৈকি, নাকি বল দোস্ত্!'

আর্তেম কর্‌কিয়ার বক্তৃতা

ক্রিস্তফোরিদির হাতে জুতো-পালিশের বুরুশগুলো এদিক-ওদিক নড়াচড়া করছে পাগলের মতো। এক বাচ্চা মিন্‌গ্রেলীয় পাইওনিয়রের জুতোজোড়া পালিশ করছে সে। পাইওনিয়র-সদস্যটির নাম হল সোসো।

নিচের দিকে তাকিয়ে সোসো দেখতে পেল জুতোজোড়ার চকমকে চামড়ায় ছায়া পড়েছে তার একগাল হাসির আর তার নতুন লাল টাইয়ের।

সোসোর ঠাকুর্দা আর্তেম কর্কিয়া দাঁড়িয়ে ছিল কাছেই, তার লাঠিগাছটায় ভর দিয়ে। ক্রিস্তফোরিদির কাজের দিকে সে সতর্ক নজর রেখে চলেছিল আর খালি নানারকম ওজর-আপত্তি তুলছিল। ওর মনে হচ্ছিল গ্রীক ছোঁড়া ভারি ধূর্ত, নানা ফন্দিফিকির করে যতটা কম করে পারে পালিশ লাগাচ্ছে জুতোজোড়ায়। কিন্তু ক্রিস্তফোরিদিও কম যায় না, তাচ্ছিল্যভরে পাল্টা গুঁইগাঁই জুড়েছিল সে-ও। বলছিল, যত কম পালিশ লাগাবে জুতো চকচক করবে ততই। সে বুঝে উঠতে পারছিল না, বুড়ো শেয়াল ঘ্যানঘ্যানানি জুড়েছে কী জন্যে?

এর আগে আর্তেম কর্কিয়ার মনে আর কখনও এতখানি গর্বের ভাব জাগে নি। এ কী সোজা কথা! ওর নাতি বাচ্চা সোসো 'তরুণ পাইওনিয়র' হয়েছে! কর্কিয়ার কাছে এর অর্থ, নাতি ওর এঞ্জিনিয়র শাল্ভা গাবুনিয়ার মতো দশজনের একজন হবার পথে পা বাড়িয়েছে।

আর শুধু এই-ই সব নয়। কলখিদায় কাজ করছেন যেসব জ্ঞানীগুণী মানুষ পাইওনিয়রদের পক্ষ থেকে বাচ্চা সোসো জনসমক্ষে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে চলেছে।

'তা, তুই কোথা বক্তিমে দিবি রে, আজবদেশের ছেলে?' ক্রিস্তফোরিদি শুধোল।

সোসোর রাগ হল কথাটা শুনে। মনে হল, কথাটায় যেন একটু ঠাট্টার সুর আছে। কিন্তু জুতো-পালিশওয়ালা এই ছেলেটার বদমেজাজকে ও ভয় পায়। ক্রিস্তফোরিদির জামার পকেটে যে একটা গুলতি আছে তা-ও ওর ভালোই জানা। এইসব সাতপাঁচ ভেবে ও চুপ করে রইল।

ওদের চারপাশে দেখতে-দেখতে ছোট একটা ভিড় জমে উঠল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল গুলিয়া। জাহাজের মাল্লার

পোশাক পরে ছিল সে, নীলরঙের জ্যাকেট আর ট্রাউজার্স। ভিড়ের মধ্যে দেখা গেল বড় দ্বীপের বুড়ি ধোপানীকে আর সবশেষে দেখা গেল মিলিশিয়ার লোক গ্রিশাকে।

ব্যস, কর্কিয়াকে আর পায় কে? সে রীতিমতো চেঁচাতে শুরু করল। আচ্ছা, এমন সব ব্যাপারস্যাপার ঘটতে চলেছে আর সে কী করে তা নিয়ে গলা না-চড়িয়ে কথা বলে? এ কী সম্ভব?

চিৎকার করে কর্কিয়া সবাইকে জানিয়ে দিল যে লেখাপড়া-জানা জ্ঞানীগুণী লোকেরা পোতিতে একটা কৃষি-প্রদর্শনীর আয়োজন করতে চলেছেন, আর সেখানে দেখানো হবে নতুন ধরনের নানা ফল আর শাকসব্জি আর নানা জাতের নামিদামি যতসব গাছপালা। প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের দিন তার নাতি সোসো যে বক্তৃতা দেবে সে-কথাও চেঁচিয়ে শুনিয়ে দিল সবাইকে। আ মরি, কী একখান বক্তিমেই-না দেবে ছোঁড়া! অমন বক্তিমে কস্মিনকালেও কেউ দ্যায় নি! না, 'প্রাভদা' কাগজেও অমন বক্তিমের দেখা মিলব না!

শুনে মিলিশিয়ার লোক গ্রিশা বলল, 'বুড়োর বারফট্টাই শুনে হাসি পায়। একদম গণ্ডমুখ্যু যারে কয়। ও জেবনে কোনোদিন 'প্রাভদা' পড়েচে নাকি?'

এতে কর্কিয়া অল্প-একটু দমে গেল। তবে তা এক-মুহূর্তের জন্যে।

পরে বলল, 'বুড়া মানুষেরে অমন কথা বলা পাপ, বুইলে? আমি লিজে ন্যাকাপড়া না-জানতে পারি, কিন্তু আমার এই-যে লাতিরে দেখচ এ পোতি থেকে কুতাইসি পর্যন্ত গোটা তল্লাটে যত মিলিশিয়ার নোক আচে তাদের সবার চাইতে বেশি ন্যাকাপড়া জানে।'

ফলে ধুমধড়াক্কা তর্ক বেধে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই

এই চেঁচামেচিতে ক্লান্ত হয়ে উঠে ক্রিস্তফোরিদি একজোড়া বুরুশ বাগিয়ে ধরে তার জুতো-পালিশের বাক্সের ওপর প্রচণ্ড জোরে পিটতে শুরু করল। ফলে অবশেষ চিৎকার থামল। জুতো-পালিশের জন্যে পয়সা নিতে রাজি হল না ক্রিস্তফোরিদি। যেন কিছুই এসে-যায় না এমন ভাব দেখিয়ে বলল, 'পাইওনিয়ারদের লেগে বিনে-পয়সায় জুতাপালিশ!' নিজের উদারতায় নিজেরই বুকখানা ওর ফুলে উঠল দশহাত হয়ে।

নাতির হাতখানা ধরে রাস্তা দিয়ে গটগট করে হেঁটে চলল কর্কিয়া। সদ্য বৃষ্টির জলে-ধোয়া স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ এই দিনটি ছিল তারও উৎসবের দিন। ক্ষীয়মাণ জীবনে তার নতুন এক সূর্যোদয় ঘটছিল সেদিন।

কাটাকাটাভাবে কতগুলো কথা মনে আসছিল তার। অস্পষ্ট, জমকালো কিছু-কিছু কথার টুকরো। ভাবছিল, প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের সময় কথাগুলো বলতে পারলে মন্দ হয় না। যদি সুযোগ পায় তাহলে সে বলবে কথাগুলো। আর হর্গার সবচেয়ে বয়স্ক বাসিন্দা হিসেবে তার তো বক্তৃতা দেয়ার অধিকার আছেই, কেননা প্রধান খালটি খোঁড়ার কাজ হর্গায় শিগগিরই শেষ হতে চলেছে।

প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের আগের দিন গোটা সন্ধেবেলাটা আর তারপর গোটা রাত নেভ্স্কায়া প্রদর্শনীর ঘরে কাটাল।

ঘরগুলোয় তখন নেভ্স্কায়া আর চোপ ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। গোড়ায় ক্যাপ্টেন অনবরত বকে যাচ্ছিলেন, কিন্তু নেভ্স্কায়ার কাছ থেকে ক্রমশই কম-কম সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। কথাবার্তা বলার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না তার। এটা লক্ষ্য করে অল্পক্ষণের মধ্যে ক্যাপ্টেন চুপ করে গেলেন।

একটি-একটি করে প্রদর্শনীর জন্যে সাজানো ফল আর গাছগুলো পরীক্ষা করে দেখছিল নেভ্স্কায়া, যেন এর আগে আর কখনও সেসব দেখে নি ও।

গাছগুলোর ডালপালার ফাঁকে-ফাঁকে নিচু-করে-ঝোলানো ইলেক্‌ট্রিক-বাতিগুলো ঝিল্‌মিলে জোনাকিপোকার মতো জ্বলছিল। পাতার ঝাঁপালো ঢাকনায় বাতির আলোর উজ্জ্বলতা কোমল হয়ে উঠেছিল।

কী একটা শোনার জন্যে কান পাতল নেভ্স্কায়া। তার মনে হল যেন সে শুনতে পাচ্ছে পাতার অস্ফুট ফিস্‌ফিসানি, মুটমুট করে ডালপালা ভাঙার আওয়াজ আর মাটির বহুপ্রার্থিত জল কুলকুল করে পান করার মৃদু শব্দ।

এইসব গাছপালা ওর ভারি পরিচিত, প্রাণের প্রিয় সব গাছপালা। ওদের দুর্বলতা আর মিথ্যে জাঁক অনেকদিনের চেনা ওর। প্রকাশ্য কিংবা অন্তর্নিহিত ওদের সম্পদসম্ভারকে মূল্য দিতে শিখেছে নেভ্স্কায়া — মূল্য দিতে শিখেছে এইসব নীরব সত্তার গভীরে, কোথায় নিচে শিকড়ে আর বৃন্তে, বাকলে আর মঞ্জরীতে আর বীজকোষে এদেরই সৃষ্ট অমূল্য প্রাণরসকে।

সেইসব তরুক্ষীর সঞ্চিত পুরনো মদের মতোই শক্তিদায়ক আর বৃক্ষভেদে স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট। তারা রোগহর, সুগন্ধি, পুষ্টিকর, পচন-নিবারক, চেতনানাশক, মানসিক স্থিরতাদায়ক, তারা রবারের মতো চটচটে আঠালো, জলের মতো লঘু তরল, তারা ঘন তৈলাক্ত আবার মনোরম তৃষ্ণাপহারী — নিজ-নিজ বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে তারা বিশিষ্ট।

উদ্ভিদকোষের মধ্যে রাসায়নিক রূপান্তরের এক জটিল আর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ চলে। সূর্যালোক, বাতাস, বহতা

টাটকা জল, রিওনের কাদা আর রাত্রি (হ্যাঁ, রাত্রিই — কেননা ওই ক'ঘণ্টার অন্ধকার না-পেলে গাছ বাঁচতে পারে না) মিলে সৃষ্টি করেছে মাথাখারাপ করে দেয়ার মতো সুগন্ধ এইসব ফল।

একটার-পর-একটা গাছের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লাগল নেভ্স্কায়া আর তার চোখের সামনে দেখতে-দেখতে খুলে গেল এক বিশাল জগৎ। মানুষের সমগ্র ইতিহাস, পৃথিবীর ভূগোল, সভ্যতার বৈষয়িক দিকগুলি — সবকিছুরই হদিশ মিলবে এই নীরব বৃক্ষজগতের দিকে তাকালে, ভাবল সে।

প্রদর্শনীর জন্যে সাজানো ছিল বাঁশ আর ইউক্যালিপ্টসের চারা, মিষ্টি আর নরম গোলাপি রাঙা-আলু আর আট কিলোগ্রাম ওজনের জাপানি মুলোর কন্দ।

আর ছিল কমলা-হলুদরঙের বড়-বড় গোল-গোল ফল — বাতাবি লেবু। স্বাদ যার একই সঙ্গে কমলা আর পাতিলেবুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

থরে-থরে সাজানো লেবুবর্গের ফল — পাতিলেবু, কমলালেবু, কামকোয়াট আর খুদে-কমলা মান্দারিন। ওদের মধ্যে সঞ্চিত আছে রহস্যময় ভিটামিন-সি। খাবারে এই খাদ্যপ্রাণ ভিটামিন-সি'র অভাব ঘটলে দেখা দেয় স্কার্ভি রোগ। মেরু-অভিযাত্রীদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এ-রোগে ধরলে দাঁতের মাড়ি থেকে বদরক্ত বেরোতে থাকে আর দাঁতগুলো দেখতে-দেখতে এত আলগা হয়ে যায় যে হাত দিয়ে ছুঁলেই আপনা থেকে খুলে আসে তা। আর এ-রোগে একটু নড়াচড়া করতে হলেই রোগীকে প্রচণ্ড প্রয়াস করতে হয়।

এইসব গাছপালা মানুষের ছেলেবেলার সত্যিকার বন্ধু। সেই জন্যেই কি জাপানি মান্দারিন লেবুগাছের

পাতাগুলো অমন বাচ্চাদের হাতের পাতার মতো দেখতে?

মান্দারিন গাছের পাতার ওপর চকচকে ফুলো-ফুলো তেলের থলিগুলোর গায়ে আস্তে-আস্তে হাত বুলোয় নেভ্‌স্কায়া। একেবারে বাচ্চার হাতের তেলোর মতোই কোমল ওই জায়গাগুলো। এককেটা এই গাছ আকারে খুবই ছোট, অথচ এতে বছরে প্রায় চার হাজার করে মান্দারিন ফলে। যখন ফুল ধরে গাছগুলোয় ফুলের পাপড়িতে তখন পাতাগুলো যায় ঢেকে।

কমলালেবুর স্তূপের ওপর ঝুঁকে দাঁড়ায় নেভ্‌স্কায়া। এর মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ জাতের কমলা হল রিজ-লেবু। প্রতি বছর শরৎকালে তুর্কিরা ট্রেবিজন্ড থেকে এই লেবু নিয়ে আসে। আর তখন বন্দরে ফেলুক্কা-বজরাগুলো কাঁচা-কাঁচা কমলায় বোঝাই হয়ে ঢেউয়ের তালে-তালে দুলতে থাকে আর নৌকোর মাঝিরা বস্তাবন্দী করে সেই লেবু বিক্রি করে।

এছাড়া এখানে আছে ক্যালিফোর্নিয়ার ‘ওয়াশিংটনী কমলা’, কেমন একটা ঝাঁঝালো মোদো-মোদো স্বাদ এই লেবুর। আর আছে খুদে-খুদে কামকোয়াট লেবু, আকারে এগুলো আখরোটের চেয়ে বড় নয়।

পাতিলেবুগুলো শোয়ানো আছে একটুকরো ঘাসের জমিতে। ভোরবেলাকার হলুদের ছোঁয়ালাগা ভারি ঠাণ্ডা ফল এই লেবুগুলো। আমেরিকান লাইমকোয়াট লেবু একটা হাতে তুলে নিল নেভ্‌স্কায়া। লেবুটার পাতলা স্বচ্ছ খোসার ভেতর দিয়ে লেবুর মাঝখানকার কালো-কালো বিচিগুলো ওর চোখে পড়ল। প্রচণ্ড শীতও সইতে পারে এই ফলগুলো।

নেভ্‌স্কায়ার দৃঢ়বিশ্বাস যে কলখিদায় আধা-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গাছপালা বেশ ভালোভাবেই বেঁচেবর্তে থাকবে। যদিও

কখনোসখনো শীতকালে এখানে বরফ পড়ে, তবুও। এর জন্যে যা দরকার তা হল সামান্যতম সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ-অঞ্চলের পুরনো বাসিন্দাদের কাছে ও শুনেছে যে শীত পড়ায় যত না ক্ষতি হয় তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হয় গাছের ডালপালায় জমা বরফের চাপেই। বরফের চাপে সরু-সরু চারাগাছগুলো ভেঙে যায়।

পোতিতে অবশ্য বরফ পড়ে কালেভদ্রে। কিন্তু আধা-গ্রীষ্মমণ্ডলের সেই বরফের চেহারা উত্তরাঞ্চলের পরিচিত বরফ পড়ার থেকে একেবারে ভিন্ন ধরনের। এখানে তখন বরফ পড়ে প্রচুর পরিমাণে, প্রবলভাবে, আর বরফের ফলকগুলো হয় যেমনি মোটা-মোটা আর তেমনি ভারি।

নেভ্স্কায়া হাতঘড়ির দিকে তাকাল। রাত বারোটা বেজে গেছে। চোপকে সে বলল তার জন্যে অপেক্ষা না-করতে। চোপ বাড়ি চলে গেলেন এরপর।

ক্যাপ্টেনকে চুপ করিয়ে দিয়েছে বলে কষ্ট হচ্ছিল নেভ্স্কায়ার। কথা বলতে দিলে ওঁর মুখ থেকে হয়তো শোনা যেত বেপাত্তা-হয়ে-যাওয়া অনেক অভিযাত্রীর গল্প, মেরু-অঞ্চলের প্রচণ্ড তুষারের বিবরণ, আমুণ্ড্সেন, স্কট আর রসের কাহিনী। আর তার সঙ্গে নিশ্চয়ই নিজের বানানো গপ্পোও কিছু জুড়ে দিতেন!

তিত্কুটে কমলালেবুর স্তূপের কাছে একটুক্ষণ দাঁড়াল নেভ্স্কায়া। এই কমলার ফুল বিয়ের সময় লাগে, ফরাসি ভাষায় এই ফুলকে বলে 'ফ্লিয়ার দ্যরাঁজ'। এই ফুল থেকেই আবার তৈরি হয় সবথেকে সূক্ষ্ম এসেন্স।

প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড জাপানি খেজুরের থোকায় হাত দিল না নেভ্স্কায়া। ও জানে, মুক্তোর মতো বিন্দু-বিন্দু ঘামে-

ভেজা গাঢ় লালরঙের এই ফলে সামান্য ছোঁয়া লাগলেই তা নষ্ট হয়ে যায়। এ থেকে চিনি আর সাইড্যার-মদ তৈরি হয়।

জাপানি খেজুরের পাশেই সাজানো শাদাসিধে লকট ফল। এই ফলে বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থির অসুখ সারে। এর পাশেই রাখা আছে তারের জালে-ঘেরা চীনে বার্নিশ-গাছ। এরপর আছে টিউলিপ-ফুলগাছের কাঠের কয়েকটা নমুনা। এই কাঠের ভেতরকার লম্বালম্বি স্তরগুলো অন্যান্য গাছের মতো সমান্তরালভাবে বেড়ে ওঠে না, পরস্পর জড়াজড়ি করে তারা জটিল সব গ্রন্থি আর বাঁকের সৃষ্টি করে। এর ফলে টিউলিপ-গাছের কাঠ যেমন নমনীয় তেমনই শক্ত হয়। এই কাঠ দিয়ে তৈরি হয় এরোপ্লেনের প্রপেলার।

এরপর নেভ্স্কায়া এসে দাঁড়াল তার প্রিয় পীচফলগুলোর কাছে। গোলাপি থেকে হলদে কতরকমেরই-না রঙের ছোঁয়ালাগা এই পীচফল। পীচফল দেখলে নেভ্স্কায়ার মনে পড়ে যায় নরম-নরম রোঁয়ার আভাসসুদ্ধ বাচ্চার তুলতুলে গালের কথা। এরকম একটা পীচ থেকে নিঙড়নো রসে গোটা একটা গ্লাস ভরে উঠবে।

এবার চলে এল সে আঁশওয়ালা গাছগুলোর কাছে। এখানে প্রথমেই তার চোখে পড়ল সরু-সরু, শাদাসিধে চেহারার কাঁটাওয়ালা র‍্যামিগাছ।

বড়খালের উত্তর এলাকায় ইতিমধ্যেই এই র‍্যামিগাছের বড়-বড় আবাদ গড়ে তোলা হয়েছে। বছরে দু'বার করে এই আবাদগুলোর ফসল কাটা হয়। আর এই শাদাসিধে কাঁটাগাছের প্রতি হেক্টর আবাদ থেকে পাওয়া যাচ্ছে আট শো কিলোগ্রাম ওজনের চকচকে, রেশমের মতো শক্ত, হলদেটে তন্তু।

এই বিভাগেই সাজানো আছে ড্রাগনগাছের তরোয়ালের

মতো লম্বা-লম্বা পাতা। বন্দরের সবচেয়ে গায়ের জোরওয়ালা মালখালাসি মজুররাও এই পাতা ভেঙে দু'টুকরো করতে পারে না। পাতা ভাঙতে গিয়ে তারা ঘেমে নেয়ে একশা হয়, হাত ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় তাদের, তবু পাতাগুলো ভাঙতে পারে না।

আর আছে এখানে নিউজিল্যান্ডের শণগাছ। সেই সেকালের জাহাজী ক্যাপ্টেন জেমস কুকের আবিষ্কার এই গাছ।

ক্যাপ্টেন কুক সম্বন্ধে আশ্চর্য সব গল্প বলেছেন চোপ। দেখা যায় প্রতিটি পেশা বা ব্যবসার ক্ষেত্রে মনোরম পূর্ব-ঐতিহ্য বেশ জোরালো প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আর চোপ যখন আগেকার কালের নামজাদা সব নাবিকের গল্প বলেন, কেমন করে তাঁরা অদম্য সাহসের সঙ্গে বিচারবুদ্ধিকে, তাক-লাগানো মস্ত-মস্ত কাজের মহিমার সঙ্গে বিনয়কে মেলাতেন তার কথা বলেন, তখন সমুদ্র-জীবনের সেই চমৎকার ঐতিহ্যের প্রভাব তাঁর মধ্যে বিশেষ করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ওইসব নাবিকের কথা, তাঁদের দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বলে যেতে পারেন চোপ। আর এর ফলে তাঁর সম্বন্ধে এই ধারণাটা ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠেছে নেভ্স্কায়ার মনে যে চোপ হচ্ছেন মন-মাতানো নানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের একেবারে স্বর্ণখনিবিশেষ।

পাহাড়ি আঁধি নামার সেই ঘটনাটার পর ক্যাপ্টেন কুকের কথা ফের একবার উঠেছিল। লাপ্‌শিনের তখনকার আচরণ-প্রসঙ্গে নেভ্স্কায়াকে বলেছিলেন চোপ:

'লাপ্‌শিন হল গে' বিজ্ঞানী, আর আমি তো ওসব কিছুই না। তা, ক্যাপ্টেন কুককেও সারাজীবন নোকে মুখ্যুসুখ্যু

বলে মনে করত। দক্ষ জাহাজী আর অভিযাত্রী-দলের নেতা ছিলেন বলে বিজ্ঞানীরা তাঁকে সহ্য করত কোনোরকমে, কিন্তু অনুসন্ধাতা হিসেবে তাঁর মতামতের দাম দিত না কানাকড়িও। তারা মনে করত, যে-লোক শুদ্ধ ভাষায় নিজের মতামত লিখে প্রকাশ করতে পারে না তার কাছে আর বেশি কী আশা করা যায়? তাদের এই মনোভাব অবিশ্যি জানা ছিল কুকের। কিন্তু তিনি ছিলেন গে জাহাজী। ও আপনার সে টাইফুনই বলুন আর বরফের পাহাড়ই বলুন, ভগমানই বলুন আর শয়তানই বলুন — কাউকে কখনও ডরান নি তিনি। তবে বিজ্ঞানী লোকজনকে তিনি ভয়ংকর ডরাতেন। তাদের সামনে কোনো-কিছু বলতে হলে মুখে কথা বেধে যেত তাঁর, তোত্‌লাতে শুরু করতেন। এমন কি তাঁর জাহাজের লগবইতেও নিজের মনের কথা কালেভদ্রে লিখতেন তিনি। নিজের মনের কথা নিজের কাছেই এমন জবড়জঙ্গ ঠেকত যে কাগজে তা লিখে রাখতে ভরসা পেতেন না পর্যন্ত।

'তবু বাতাসের গতি আর মেঘ, অক্ষরেখা, দ্রাঘিমা আর জাহাজে গন্ধকের ধোঁয়া দেয়া নিয়ে তাঁর নেখাপত্তরের মধ্যে হঠাৎ-হঠাৎ নজরে পড়ে যায় কিছু-কিছু সত্যিকার তাক-নাগানো কথাবার্তা। কুক যখন পাগলের মতো বরফের চাঙড় আর ঝড়ঝাপ্‌টা ভেদ করে কুমেরু-মুখো ছুটে চলেছিলেন, তাঁর জাহাজের মাল্লাদের যখন ধীরস্থির ক্যাপ্টেনকে দেখে তাক লেগে যাচ্ছিল, তখন তিনি লগবইতে নিখেছিলেন যে ওইসব জায়গার সৌন্দর্য দেখে তাঁর মন অবাকবিস্ময়ে আর ভয়ে ভরে উঠছে...।'

কুক সম্বন্ধে এরকম কত কথাই-যে মনে পড়ে গেল নেভ্‌স্কায়ার তার ইয়ত্তা নেই। বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে

গেল এই চিন্তায়। মনে পড়ল, ওর জানা অনেক গাছের সঙ্গেই কুকের নাম জড়িত! সঙ্গে সঙ্গে চোখ চলে গেল ঘরের আরেক প্রান্তে-রাখা অস্ট্রেলীয় অ্যাকেশিয়া গাছের দিকে।

আঁশওয়ালা গাছগুলো ছেড়ে, কাঠ-বার্নিশের চমৎকার তেল পাওয়া যায় যে টাং-গাছ থেকে তা পাশে রেখে, নেভ্স্কায়া এতক্ষণে এগিয়ে গেল জেরেনিয়ম ফুলগাছের কেয়ারির দিকে।

একটা পাতা ছিঁড়ে চটকাতেই জেরেনিয়মের নির্যাসের ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এল ওর। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল আধো-ঘুমন্ত এক জেলা-সদরের গ্রীষ্মের দিনগুলোর কথা, যখন বাড়িগুলোর জানলায়-জানলায় পাতলা লেসের পর্দার পেছনে টবে-পোঁতা জেরেনিয়ম গাছ দেখা যেত।

আগেকার দিনে জেরেনিয়মকে তাচ্ছিল্যভরে বলা হোত পেটি-বুর্জোয়াদের পছন্দসই ফুল। আসলে কিন্তু এরা ছিল শ্রমিক-এলাকার প্রিয় ফুল — রোদ্দুরে-ঝলমলে আবহাওয়া-থেকে-আসা একমাত্র অতিথি, যারা নাকি বস্তির জঘন্য জীবনে একটুখানি সৌন্দর্যের ছোঁয়া দিত। এই ফুলগাছ যেমন কিনতে গেলে দামে শস্তা, তেমনি ফুলও ফোটে যত্রতত্র আর অজস্র, এমন কি একেবারে আলো-বাতাসহীন খুপরিতে আর মাটির তলাকার ঘরেও। আর একারণেই এই ফুলের ওপর নেভ্স্কায়ার দরদ বেড়ে গেছে দ্বিগুণ।

আহা, একদিন কত অন্যায়ভাবেই-না এদের নিন্দে করা হয়েছে! এই ভেবে নেভ্স্কায়া নিচু হয়ে গাছগুলোর গায়ে হাত বুলোল। গাছগুলোয় ফুলের ডাঁটাগুলো তীরের মতো খাড়া হয়ে আছে আর তাদের ডগায় রাঙা-রাঙা পাখার মতো মেলে আছে ফুলের পাপড়িগুলো। আর তাদের ওপর ভারি-ভারি রোমশ ডালপালা মেলে আর হাজার-হাজার খুদে

গোল-গোল মঞ্জরী ঝুলিয়ে ঝ্ুঁকে আছে জাপানি ক্রিপ্টোমেরিয়া গাছ।

শাকসব্জির বিভাগে ম-ম করছে সোঁদা মাটির গন্ধ, সিগারের শুকনো তামাক-পাতা থেকে ছাড়ছে মিঠে ধুলোর সুবাস। চাল আর গমের দানা ডাঁই করে রাখা আছে এখানে।

কর্পূরগাছের পাতার কাছাকাছি বিশ্রাম নিতে একটু বসল নেভ্স্কায়া। ক্লান্তিতে ওর মাথা ধরে গিয়েছে, কর্পূরের গন্ধে স্বস্তিবোধ করছে একটু। চীনে চর্বিফল গাছের ফলগুলো ছোঁয়ার জন্যে একবার ও হাত বাড়াল। ফলগুলোর খোসা পুরু, শক্ত উদ্ভিজ্জ চর্বিতে ঠাসা। চীনারা এই চর্বি দিয়ে চমৎকার সাবান আর মোমবাতি বানায়।

নেভ্স্কায়া জানে, কলখিদায় হাজার পনেরো জাতের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও আধা-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গাছগাছড়ার বসত গড়ে তোলা সম্ভব। এই প্রদর্শনীতে গাছপালার প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের যে-ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে ওর কাছে তা এদেশের ভবিষ্যতেরই সুদূর একটা আভাস ছাড়া কিছু নয়।

চোখ বন্ধ করে বসে রইল ও, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল কখন। খোলা জানলা দিয়ে যতক্ষণ-না হালকা এক-ঝলক বাতাস এসে মাথার ওপরের গাছের পাতায় হিল্লোল তুলল আর ঘরের ছাদে ঝলমলিয়ে উঠল রোদ্দুরের একটা ঝলক ততক্ষণ ঘুমিয়ে রইল ও।

বাতাসের দমকে নেভ্স্কায়ার চুল এলোমেলো হয়ে গেল, ওর চোখেও ঝাপট দিল হাওয়া। জেরেনিয়ম ফুলের কিছু-কিছু পাপড়ি খসে ফরফর করে ঝরে পড়ল ঘরের মেঝেয়।

প্রদর্শনীর ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল নেভ্স্কায়া। ভিজে ফুটপাথ থেকে সমুদ্রের নোনা গন্ধ ছাড়ছে। গোটা কয়েক মোষ মুলো-বোঝাই উঁচু চাকাওয়ালা একখানা গাড়ি

টেনে হাঁপাতে-হাঁপাতে খপখপ করে পাশ দিয়ে চলে গেল। দুঃখী-দুঃখী নীল-নীল চোখ মেলে নেভ্‌স্কায়ার দিকে তাকাতে-তাকাতে গেল তারা। গাড়ির কোচোয়ান ঘুমে বিভোর। মুলোর স্তূপ থেকে জল ঝরে পড়ছে।

রাস্তাঘাট তখনও ফাঁকা। একমাত্র গ্রিশা ছাড়া আর কোনো জনমনিষ্যির দেখা নেই। রাস্তার মোড়ের মিলিশিয়া-পোস্টে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে গ্রিশা। নেভ্‌স্কায়াকে দেখে হাসল ও, তারপর একটা হাত তুলে টুপিতে ছুঁইয়ে স্যালিউটের ভঙ্গি করল।

আস্তে-আস্তে শহরের ঘরবাড়ির ওপর সূর্য উঠতে শুরু করল।

নেভ্‌স্কায়া হেঁটে বন্দর-এলাকায় চলে এল, তারপর পাড়ের কাছের ঢেউয়ে নেমে সাঁতার কাটতে লাগল। ঘুমঘুম ঢেউগুলো পাথুরে পাড়ের ওপর ভেঙে-ভেঙে পড়ছে, কান্নার সুরের মতো একটা গুঞ্জনধ্বনি থেকে-থেকে ছড়িয়ে পড়ছে জেটির এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে।

সমুদ্রের জলটা বিষম ঠাণ্ডা, নেভ্‌স্কায়ার রাতজাগার সকল ক্লান্তি দূর হয়ে গেল তাতে। জল থেকে উঠে সে যখন পোশাক পরছে ঠিক সেই সময়ে সূর্যের আলো তের্‌ছাভাবে এসে ছড়িয়ে পড়ল জাহাজঘাটায়, আদরভরে হাত বোলাল সমুদ্রের শান্ত জলে আর গ্রীক স্টিমারটার মরচে-ধরা গায়ে। স্টিমারটার নামটা ভারি অদ্ভুত ধরনের — 'জাম্বেজোস'।

স্টিমারটার ডেক থেকে হালকা-হালকা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। মাল্লারা হাতমুখ ধুচ্ছে রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে। হাসাহাসি আর পরস্পর ধাক্কাধাক্কি করছে তারা আর একে অন্যের ঘাড়ে জল ঢেলে দিচ্ছে।

একঝাঁক স্ক্যাড্‌মাছ পাড়ের কাছে একগোছা সামুদ্রিক

শ্যাওলার দিকে এগিয়ে এল সতর্কভাবে। স্বচ্ছ জলের নিচে কিছুক্ষণ ইতস্তত ঘোরাঘুরি করে হঠাৎ একসময় রুপোলি জলের ফোয়ারা হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝাঁকটা। আর একটা ভীষণদর্শন, ডেলা-বের-করা চোখওয়ালা কাঁকড়া শ্যাওলার গোছাটা থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুত পাশে হেঁটে পাথরের ওপর উঠে গেল।

বাড়িতে ঢুকে নেভ্স্কায়া ইয়োলচ্কা আর চোপকে ঘুম থেকে তুলল। প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের জন্যে তৈরি হওয়ার সময় হয়ে গেছে।

প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের সময় দুপুর বারোটায় নির্দিষ্ট হয়েছিল। এ-উপলক্ষে শহরে এসেছে হর্গা, সুপ্সা, সেনাকি, আনাক্লিয়া ইত্যাদি গ্রামাঞ্চল থেকে বহু যৌথখামারী। পাখোমভও এসেছেন, আর এসেছে গাবুনিয়া মিথাকে সঙ্গে নিয়ে।

দ্বারোদ্ঘাটনের বক্তৃতা দিলেন কাখিয়ানি।

সমবেত জনতার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে কাখিয়ানি শুরু করলেন, 'কমরেডস! প্রথমেই আমি আপনাদের একটা ছোট্ট প্রশ্ন করতে চাই। আচ্ছা বলুন দেখি, আপনাদের মধ্যে কার-কার ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়া হয়েছে? যাঁদের ম্যালেরিয়া হয়েচে দয়া করে তাঁরা একবার হাত তুলবেন কি?.. এই তো! দেখা যাচ্ছে প্রেত্যেকেরই আপনাদের ম্যালেরিয়া হয়েচে। কেবল এই-যে বাচ্চাটিকে দেখছেন, লাল টাইপরা এই-যে ছোট্ট ছেলেটি, এরই শুধু ওই জ্বালাতুনে অসুখটা কখনও হয় নি।

'কিন্তু ম্যালেরিয়া-রোগটা কী? কমরেডস, এটা দারিদ্র্যের রোগ ছাড়া কিছু নয়! আমাদের এই অঞ্চল ম্যালেরিয়া-

রোগের জন্যেই দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থায় থেকেচে এতকাল। আপনারা নিজেরাই জানেন বাদা-অঞ্চলে কত গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে, সেখানকার বাসিন্দেরা এই রোগে সবংশে গেছে মরেহেজে।

'অথচ কলখিদা হল গিয়ে গোটা সোভিয়েত দেশের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল। সবচেয়ে বেশি ওম, সবচেয়ে বেশি রোদ্দুর এখেনে, এখেনকার মাটি সবচেয়ে উর্বর। এ-কথাই বলে গ্যাচেন আমাদের কবিরা, শোতা রুস্তাভেলি আর আলেক্সান্দর পুশকিন।

'কিন্তু আমাদের এই তল্লাট জলায় ভর্তি। আমরা এইসব জলার জল নিকেশ করে নতুন এক গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চল গড়ে তুলতে যাচ্চি এখেনে। এই প্রদর্শনীতে আপনারা সেইসব গাছপালার অগ্রিম কিছু নমুনা দেখতে পাবেন যা ভবিষ্যতে একদিন কলখিদায় জন্মাতে চলেছে।

'এই সোনার মাটি (সোনার সাথে তুলনা দিচ্চি বলে আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্চি) মকাই আর জোয়ারের মতো মোটাদানার ফসল ফলানোর কাজে ব্যবহার করাটা হবে একটা মস্ত অপরাধ। আপনারা সারা জীবন জমিতে খালি মকাই আর জোয়ার বুনেই এসেচেন। এরপর আপনারা গড়ে তুলবেন চা, মান্দারিন, পাতিলেবু আর র‍্যামির আবাদ। আর আনাক্লিয়া থেকে কাবুলেতি পর্যন্ত সমুদ্রের ধার-বরাবর গড়ে উঠবে শত শত স্বাস্থ্যনিবাসের এক এলাকা।

'তবে আমাদের কাজের উদ্দেশ্য শুধুই বাদার জল নিকেশ করা আর নতুন জমি গড়ে তোলা নয়, আমাদের উদ্দেশ্য শুধুই বাদার চিরকেলে গাছপালা অ্যাল্ডার আর শরবনের বংশ লোপাট করা আর সম্পূর্ণ নতুন এক গাছপালার জগৎ গড়ে তোলা নয়। কমরেডস, ফের বলি — এ-ও আমাদের

কাজের একমাত্র লক্ষ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য আরও বেশিকিছু: সুস্থ, নবীন মানুষের এক সমাজ গড়ে তোলাও আমাদের কাজ।

'আপনারা জীবনে কখনও দিনে চারঘণ্টার বেশি কাজ করে উঠতে পারেন নি। যেমন করে স্পঞ্জ নিঙড়নো হয় তেমনিভাবে ম্যালেরিয়াও আপনাদের নিঙড়ে শুষে নিয়েচে। বেশির ভাগ সময় জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আপনারা কাঠের-তৈরি বাড়িতে শুয়ে পড়ে থাকেন আর কোঁকান, এত দুর্বল হয়ে পড়েন তখন যে একখানা হাত পর্যন্ত তোলবার ক্ষমতা থাকে না। এইভাবে শ'য়ে-শ'য়ে বছর আপনাদের কেটেচে, কমরেডস। কিন্তু আর না, ভবিষ্যতে আর কোনোদিন এমনটা হবে না। এই পাজি রোগটাকে আমরা নির্মূল করবই, আমাদের খোকাখুকুদের গালে টুকটুকে আপেল ফলাবই আমরা...।'

বলতে-বলতে কাখিয়ানির নিজের গালই লাল হয়ে উঠল। এরকম কাব্যিক একটা বর্ণনা দিয়ে ফেলেছেন বলে নিজেই লজ্জা পেয়ে গেলেন তিনি।

'আমরা একটা আর্দ্র আধা-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল গড়ে তুলচি। সমাজতন্ত্রের যুগের উপযুক্ত নতুন এক প্রাকৃতিক পটভূমি তৈরি করচি আমরা। কিন্তু, কমরেডস, আমাদের মনে রাখতে হবে যে মানুষের বিচক্ষণ আর অক্লান্ত তদারকি ছাড়া প্রকৃতির বাড়বৃদ্ধি হতে পারে না। এই নতুন গড়ে-ওঠা জমি-জায়গার ভালোরকম যত্ন নিতে হবে আমাদের, নইলে এ-জমি ফের পোড়ো জমি হয়ে উঠবে।

'আমাদের এই পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বহু দৃষ্টান্ত আচে যখন মানুষের যত্নের অভাবে প্রকৃতির অধঃপতন ঘটেচে। যেমন ধরুন, আমাদের সামনের এই গাছটা। রসে-

টইটম্বুর প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ডুমুর ফলাচ্চে এই গাছ। কিন্তু একে এর নিজের মতো করে থাকতে দিন, অযত্নে ফেলে রাখুন একে, দেখবেন দশ বছরের মধ্যে কী হাল হয়েছে এর। ফলগুলো তখন হয়ে উঠবে বিস্বাদ আর তাদের চেহারা হবে ছোট-ছোট বাদামের মতো। বুনো আর আবাদ-করা আঙুর কিংবা আপেলের মধ্যে কত-যে তফাত সে তো আর বলার দরকার করে না, আপনারা সবাই তা ভালোমতেই জানেন। এ-সবই খুব মামুলি ব্যাপার। তবু কিন্তু এমন কেউ-কেউ আছেন,' বলে কাখিয়ানি ভানো আহ্‌মেতেলির দিকে একনজর তাকিয়ে ফের বললেন, 'যাঁরা এটা মানতে অনেক টালবাহানা করে থাকেন...।'

এরপর সজোরে ঝমঝম করে ব্যাণ্ড বেজে উঠল। কর্‌কিয়া নাতিকে কনুইয়ের গুঁতো দিল একটা।

সোসো এগিয়ে এল। ওর গালদুটো টোম্যাটোর মতো টুকটুকে লাল হয়ে উঠেছে। জর্জীয় ভাষায় অল্প-দু'চারটে কথা যা ও বলল তার মোদ্দা বক্তব্য হল এই যে মিন্‌গ্রেলীয় বাচ্চারা নতুন গাছপালা আর বাগানের যত্ন নেবে, সুখী কলখিদা গড়ে তুলতে এঞ্জিনিয়রদের সাহায্য করবে তারা।

বিপুল হর্ষধ্বনি করে আর হাততালি দিয়ে ছেলেটাকে আপ্যায়িত করল সবাই। ফের একবার ব্যাণ্ড বেজে উঠল সজোরে। ভিড়ের পেছন থেকে উঁকিঝুঁকি মারছিল ক্রিস্তফোরিদি। তার মনে হল, হিংসেয় বুঝি বুকখানা তার ফেটে যাবে।

এরপর পাখোমভ বক্তৃতা দিলেন, তারপর নেভ্‌স্কায়া। ওঁদের কথা ক্রিস্তফোরিদি একবর্ণও বুঝতে পারল না। সবশেষে বুড়ো আর্তেম কর্‌কিয়া হঠাৎ এগিয়ে এল সামনে। ফলে ভিড়ের মধ্যে বেশ-একটু নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেল।

কর্কিয়া নিচু হয়ে কুর্নিশ জানাল কাখিয়ানিকে। ঠোঁটদুটো ওর ফাঁক হল একটুকু। তারপর একটুক্ষণ কী-যেন ভেবে নিয়ে ও বলল:

'কির্তজ্ঞতা জানাই, দোস্ত্। অনেক ধন্যবাদ, ইয়ার।'

আরও কী-যেন বলতে চাইল ও। ঠোঁটদুটো ফাঁকও করল, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা সরল না। ঘড়ঘড় শব্দ তুলে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে ও শুধু ওর কাঠের-তৈরি লাঠিখানা বাড়িয়ে ধরল কাখিয়ানির দিকে।

এই লাঠিগাছটা ছিল ওর গর্ব। যখন ওর মাত্র কুড়ি বছর বয়স তখন নিজের হাতে কুঁদে এটা তৈরি করেছিল। লোহার চেয়ে শক্ত এই লাঠি। কাখিয়ানি তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এটা ব্যবহার করুন এই-ই চায় কর্কিয়া, আর সেই শেষদিনটা যেন অনেক দেরিতে আসে।

লাঠিখানা হাতে নিয়ে বুড়োকে চুমো দিলেন কাখিয়ানি। ব্যান্ডপার্টি এবার প্রাণবন্ত কুচকাওয়াজের একটা সুর ধরল। প্রদর্শনীর দ্রষ্টব্যগুলো দেখার জন্যে জনতার ভিড়ও ভাঙল, লোকে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

ওইদিন সন্ধেবেলা দুখানে বসে বেচো আর গুলিয়ার কাছে আর্তেম কর্কিয়া সবিস্তারে বর্ণনা দিচ্ছিল কৃষি-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসবে ও কী সাংঘাতিক একটা বক্তৃতাই-না দিয়েছে, তার।

বলছিল, 'তাম্পর সব্বার সামনি বেইরে এসে আমি এই কথাগুলা বললাম: 'সারাটা জেবন আমি হর্গায় কাইটেচি, আর পেত্যেক বছর বানের জলে আমার জমিজিরেত ভেসে গেচে। দু-দু'বার আমি লিজে বাদার জলে ডুবতে বসেছেলাম পেরায়। জেবনে কোনোদিন মকাইয়ের রুটি আর পনির ছাড়া কপালে আর কিছু জোটে নাই। ম্যালোরি-জ্বরে আমার

দেহখান শুষে খেয়ে ছিবড়ে করে দেচে, হাড়ের উপরি চামড়াসার হয়ে গেচি আমি। তিন-তিনটে জলজ্যান্ত ছেলে আমার জ্বরে ভুগে মারা পড়েচে।' এই সকল কথাই বললাম আমি, বুইলে কিনা। আরও বললাম, 'আপনেরে আমাদের বুড়া-হাবড়াদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিতেচি! আমাদের লাতিপুতি আর তস্য লাতিপুতিদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিতেচি আপনেরে! সোভিয়েত রাষ্ট্র আমাদিগের জেবনে আরও সুখ দেয়ার লেগে কত অত্থই-না ব্যয় করতেচে। কী পরিমাণ অত্থ, ভাবেন একবার দোস্ত্! যন্তরপত্তর, নোকনস্কর, ইঞ্জিনিয়ার কত শ'য়ে-শ'য়ে! আর মাথা খাটাতেচে কত, মাথার দামও বড্ড কম নাকি!' এই সকল কথা বললাম আমি মেলার দরজা খোলার সময়।

'আরও বললাম, 'এই-যে আমার লাতিরে দেখতেচেন, ও ওয়ার ঠাকুদ্দার থেকেও বেশি জানেশোনে। এই লতুন যুগটা তেজী ঘোড়ার পিঠে সওয়ারের মতন দৌড়ুতে নেগেচে, আর আমরা বুড়া-হাবড়া মনিষ্যি, আমরা কখনও-সখনও এট্টু-আধটু পিছে পড়ে গেলেও পিছু-পিছু ছুটতে নেগেচি আমরাও। কেননা ঘোড়সওয়ার আমাদিগে ঠিক-ঠিক পথ দেইখে নে চলেচে, তাই আমাদিগের আর পথের বেভ্ভুল হতেচে না কোনোমতে।' এই সকল কথাই বললাম আমি, দোস্ত্। আর তা শুনে সব্বাই কী জোর হাতেতালি-যে দিল কী বলি, আর বাজনদারেরা ভোঁপ্পো-ভোঁপ্পো বাজনা বাজাল জোরসে।'

'ভোঁপ্পো-ভোঁপ্পো নয়, ব্যান্ড বাজাল,' শুধরে দিল বেচো। সে ভালোই জানত যে বুড়ো দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসবে মুখ খোলে নি একেবারেই, তবু ভদ্রতার খাতিরে তা নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করল না।

'তা হবে, ব্যান্ড-বাজনাই হবে,' কথাটা মেনে নিল কর্কিয়া। ফের বলল, 'এখন তো দেশে আর টাকার কুমিররা নাই, আর সেবার সেনাকিতে যারা গণ্ডগোল বাইধেছেল সেই মেনশেভিকরাও নাই। এখন মান্ষেরে অপর মান্ষের প্রেতি মায়াদয়া দেখাতেই নাগে।' এই সকল কথাই আমি সব্বাইরে কলাম, দোস্ত্।'

কর্কিয়ার প্রতিটি কথাই বিশ্বাস করল গ্লিয়া। সব শ্নে ও একেবারে তাজ্জব বনে গেল। প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসবে উপস্থিত থাকতে খ্বই লজ্জা হয়েছিল ওর। কেন-যে সেখানে যায় নি তাই ভেবে এখন ওর দ্ঃখ হল।

বলল, 'আর দিন-পাঁচেকের মধ্যে গাব্নিয়া বড়খাল খ্লে দেবে। আর তখন পাহাড় আর বাদা-জঙ্গলে জমা যত জল সব নিকেশ হয়ে গিয়ে পড়বে হোপি নদীতে, তাপ্পর সেখেন থেকে স্ম্দ্দ্রে। গাব্নিয়া আমারে কয়েচে বেচোরে খ্ঁজে বার করতে আর তোমারে খালপাড়ে আসার কথা বলতে।'

'কেনে? কিসের জন্যে?'

'তোমারে ওখেনকার ঘরবাড়ি সাজাতে নাগবে আর তোরণের গায়ে সোনালি হরফে কিছ্মিছ্ নিখতে নাগবে।'

'ওঃ হো, তাই বল!' হাসিম্খে চেঁচিয়ে বলল বেচো। 'আমরা এমন একখান উৎসবের বেবস্তা করব-না, দাদিয়ানি-সামন্তরাজারা যা কোনোদিন জম্মে দ্যাখে নাই।'

এবার কর্কিয়ার কাঁধে একখানা হাত রেখে গ্লিয়া বলল, 'আর তোমার সাথেও আমার এট্ কাজ আচে, ব্ড়া বাচাল। খ্ব গোপন কথা সেটা। আজ রাত্তিরে তোমারে নে আমি খালপাড়ে যাব, আর আসচে কাল দ্'জনায় মিলে

যাব বাদায়। গাব্‌রিনিয়ার লেগে বড় এট্টা কাজ করতে তুমি আমারে সাহায্য করবে, কেমন?'

'তা সেটা কী ধরনের কাজ গো, দোস্ত্‌?'

'আরে, চুপ-চুপ, এয়া রাজনৈতিক ব্যাপার। মুখ বুইজে থাকতে হবে, এ লিয়ে আর কোনো কথাবাত্তা না, বুইলে!'

শুনে রাজি হয়ে গিয়ে ঘাড় নাড়ল কর্‌কিয়া। যদিও ও বুড়ো হয়েছে তবু মন্দ কী, বাদায় না-হয় শেষবারের মতো একচক্কর পাক দিয়ে আসবে। সাম্‌ব্রেদির ইঞ্জিন-ডেরাইভারের ছেলে গাব্‌রিনিয়ার উব্‌গারের জন্যে এমন কাজ করা চলে। তাছাড়া এটা এট্টা রাজনৈতিক ব্যাপার বলে কথা!

ফাজীয় নারীমূর্তি

আগাগোড়া গুলিয়ার রহস্যময় ভাবভঙ্গি দেখে এতই ঘাবড়ে গিয়েছিল কর্‌কিয়া যে যাবার পথে সারা রাস্তা একটি কথাও বলল না সে।

সেদিন ভোরবেলা থেকেই পায়ের ওপর খাড়া হয়ে আছে দু'জনে। দুটো মোষের পিঠে যতরাজ্যের কোদাল, কুড়ুল, দড়িদড়া আর বস্তা বোঝাই করে জঙ্গলের ভেতরে ডুব দিয়েছে তারা।

দেখা গেল মোষদুটো জঙ্গলের মধ্যে বেশিদূর সেঁধোতে অনিচ্ছুক, বাদার জলে থেকে-থেকেই শুয়ে পড়ার চেষ্টায় আছে তারা। ফলে গুলিয়া তাদের পাঁশুটে চামড়ায় পাশের দিকে এত জোরে চাবুক হাঁকড়াতে লাগল যে সারা বন তার আওয়াজে গমগম করে উঠল আর শেয়ালগুলো ভয় পেয়ে

কাত্‌রে উঠে আর হাসতে-হাসতে ছুটে পালাতে লাগল দূর থেকে দূরান্তরে।

ভরা দুপুরের কাছাকাছি দুই শিকারি গিয়ে পৌঁছল রেমান দুর্গটার ধ্বংসাবশেষের কাছে।

গুলিয়া লক্ষ্য করল জঙ্গলটায় একটা পরিবর্তন ঘটেছে। গাছপালার ডালপাতা করুণভাবে ঝুঁকে পড়ে একেবারে মাটিতে লুটিয়ে আছে। পাঁশুটে আর প্রাণহীন ঠেকছে পাতাগুলোকে। মাথার ওপর আকাশে ঝুলে আছে জ্বলন্ত সূর্য।

দুর্গের ভাঙা পাঁচিলের ওপর চেপে বসে ওরা দুপুরের খাওয়া সারতে লাগল।

'পেরাচীন কালে এখেনে এট্টা কেল্লা ছেল, বুইলে আর্তেম,' পনিরের টুকরো চিবোতে-চিবোতে বলল গুলিয়া। 'আর সেই কেল্লায় ছেল এট্টা পাথরের মূত্তি। তা, মূত্তিটে এখনও রয়ে গ্যাচে। বাদার জলে ডুবে আচে সেটা। মূত্তিটের দাম ঢের-ঢের ট্যাকা, বুইলে দোস্ত্‌!'

কিন্তু এমন একটা জবর খবর শুনেও কর্‌কিয়ার বিন্দুমাত্র ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না।

খাওয়া শেষ হলে ছোট-ছোট দুটো গাছ কাটল ওরা, তারপর কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে গাছের কাণ্ডদুটোকে চৌকোনা করে স্লেজের নিচেকার প্রধান দুটো পাটাতনের আকার দিল তাদের। এইভাবে স্লেজের একটা কাঠামো তৈরি হল। গুলিয়া এর ওপর গাছের ডালপালা আর টাটকা পাতা বিছিয়ে একটা গদি বানিয়ে নিল। তারপর এই স্লেজে মোষদুটোকে জুতে তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে এল ছোট্ট একটা ডোবার ধারে। দেখা গেল ডোবাটার জলকাদার মধ্যে শুকনো ডালপালার একটা স্তূপ উঁচু হয়ে আছে।

'এখন কী করতে নাগবে আমাদেরে?' শুধোল করকিয়া।

'পাথরের সেই মুত্তিটারে খুঁড়ে বার করব, তাপ্পর লিয়ে যাব গাবুনিয়ার ঠেঁয়ে। মুত্তি-টুত্তি বড্ড পছন্দ করে ছেলেটা, বুইলে দোস্ত্।'

মতলবটা করকিয়ারও বেশ মনমতো ঠেকল। অতএব কাজ শুরু করল দু'জনে, আর ওপরে-ওপরে চাপানো ডালপালাগুলো টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে দিতেই তার তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল একখানা হাত। গোলাপি মার্বেলপাথরে গড়া, সূক্ষ্ম, সুকুমার, মেয়ের হাত একখানা। কেবল একটা আঙুল ভাঙা তার।

'শেয়ালে কামড়ে খেয়েচে, নচ্ছার জীব কোথাকার!' মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বলল করকিয়া। তাজ্জব বনে যাওয়ায় ওর চোখদুটো তখন গোল-গোল হয়ে উঠেছে।

মূর্তিটার চারপাশের মাটি সাবধানে কোদাল চালিয়ে কেটে সরাতে লাগল ওরা। দেখতে-দেখতে মূর্তির মাথা আর তারপর কাঁধদুটো বেরিয়ে পড়ল। এর ঘণ্টাখানেক পরে অর্ধেক জলে-ভর্তি গভীর একটা গর্তের মধ্যে দাঁড়ানো-অবস্থায় গোটা মূর্তিটাই পড়ল বেরিয়ে। গায়ে মার্বেলের-তৈরি পোশাক আলগাভাবে জড়ানো, শ্লথবসনা, হাস্যময়ী এক নারীমূর্তি।

এই গোটা সময়টাই মাটি খুঁড়তে ব্যস্ত ছিল করকিয়া। মাঝে-মাঝে কেবল দম ফেলতে আর হাতের তেলোদুটো থুতু দিয়ে ভিজিয়ে নিতেই যা একটু-আধটু থেমেছে। মূর্তির দিকে একনজর তাকাবার সময় পর্যন্ত পায় নি সে এতক্ষণ। এইবার কাজ শেষ হওয়ায় টান করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সে তার পরিশ্রমের ফলাফল পরখ করে দেখার জন্যে এতক্ষণে

মূর্তিটার দিকে চোখ ফেরাল। আর যা দেখল তাতে আঁতকে উঠে এক-পা পিছিয়ে এল সে। তারপর ডোবার গর্তটা থেকে হাঁচোড়পাচোড় করে উঠে এসে তাড়াতাড়ি আরও খানিকটা পিছিয়ে দাঁড়াল।

চিৎকার করে গুলিয়াকে ধমকে বলল তারপর, 'জঘন্য মিথ্যেবাদী কোথাকার! এই তোর রাজনীতি? এ তো দেখি ন্যাংটা মেয়েছেলে!'

'বুড়া মানুষ তুমি, তোমার ঠেঁয়ে ক্ষ্যামা চাই,' প্রচণ্ড বিদ্রূপের সুরে জবাব দিল গুলিয়া। 'সত্যিই তোমার ঠেঁয়ে ক্ষ্যামা চাই, দোস্ত্। তোমার মতন বিচক্ষণ মানষের এমন বোকামি করা উচিত হয় না। এই মূত্তিটের দাম ঢের-ঢের ট্যাকা। আমরা এয়া গাবুনিয়ারে দোব...। যাও, দড়িদড়া আর বস্তাগুলা লিয়ে আস দেখি।'

ওর এ-কথায় এমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল কর্কিয়া যে জবাব দিতেও ভুলে গেল। দড়ি আর বস্তা আনতে স্লেজের কাছে চলে গেল সে। এদিকে ডোবা থেকে জল তুলে-তুলে গুলিয়া মূর্তিটার ওপর ঢালতে লাগল। অবশেষে শ্যাওলার সবুজ আস্তরণ ভেদ করে প্রাচীন মার্বেলপাথরের প্রাণের উষ্ণতা ঝিলিক দিতে শুরু করল।

মূর্তিটাকে অনেকগুলো বস্তা আর ছাঁটা ডালপালা দিয়ে মুড়ে দিল গুলিয়া, তারপর দড়ি দিয়ে আপাদমস্তক পাকিয়ে বাঁধল। মোষদুটোর সাহায্যে মূর্তিটাকে এরপর ডোবার ভেতর থেকে টেনে ওপরে তুলল দু'জনে মিলে, সাবধানে স্লেজের ওপর শুইয়ে দিল তারপর।

ফেরার পথে আরও ধীরে-ধীরে চলল ওরা। মোষদুটো বারবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল, আর গুলিয়া আর কর্কিয়া সারাটা পথ সভ্যতা, সংস্কৃতি, কীর্তিস্তম্ভ, মূর্তি

এইসব জটিল আর কঠিন সমস্যাদি নিয়ে তর্ক করতে-করতে এল।

বাদা-জঙ্গল থেকে মূর্তিটাকে টেনে নিয়ে আসার এই সিদ্ধান্তের পেছনে ওর যে অস্পষ্ট মনোভাবটা কাজ করছিল তা যে কীভাবে বোঝাবে বুড়োকে তা ভেবে পাচ্ছিল না গুলিয়া। গোটা খালপাড় তখন উৎসবে মেতে উঠেছিল। সারা কলখিদাই মেতে উঠেছিল উৎসব উদ্‌যাপনে। আর তাই গুলিয়ার মনে হয়েছিল, মূর্তিটা এই উৎসবের উপযুক্ত একটা শোভা হবে, কারণ মূর্তিটা-যে বাদার বুক থেকে ছিনিয়ে-আনা অপ্রত্যাশিত একটা উপহার।

ওরা যখন খালপাড়ে পেঁাছল তখন রাত নেমে এসেছে। গাবুনিয়ার ঘরের জানলায় আলো দেখা যাচ্ছিল। গুলিয়া বাইরে থেকে আস্তে-আস্তে টোকা দিল জানলার কাচে। গাবুনিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

গুলিয়া ওকে ফিস্‌ফিস করে বলল, 'একখান টর্চ লিয়ে আমার সাথে আস দেখি। দারুণ একখান মাল দেখাতে চাই তোমারে। বাদার জঙ্গলে পেয়েচি মালটা।'

গাবুনিয়া মুখে কিছু বলল না, কেবল সন্দেহভরা দৃষ্টিতে গুলিয়ার দিকে একনজর তাকাল। তারপর ঘর থেকে টর্চলাইটটা নিয়ে নিঃশব্দে ওর পিছুপিছু চলল।

ছাউনির শেষ ব্যারাক-বাড়িটা ছাড়িয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে মোষদুটো খচমচ শব্দ করে ঘাস চিবোচ্ছিল। ওদের পাশটিতে দাঁড়িয়ে ছিল কর্‌কিয়া। তার মুখটা ফ্যাকাশে মেরে গেছে। ভয় হচ্ছে গাবুনিয়া-না শেষকালে তাদের বকাঝকা দেয়, কিংবা হাবাগবা দুই অপদার্থ বুড়ো ঠাউরে না হাসিমস্করা জুড়ে দেয়। আর তাহলে লজ্জা রাখার জায়গা থাকবে না তাদের।

ঝোপের মধ্যে ঢুকল এসে গাবুনিয়া।

'এইবার আলো মারেন দেখি!' গুলিয়া বলল।

টর্চটা জবালল গাবুনিয়া। রুপোলি আলোর ধারায় ধরা পড়ল এক মর্মরমূর্তি, অন্ধকার পাতার বিছানায় শুয়ে হাসছে।

ভয়ে কাঠ হয়ে গাবুনিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল কর্কিয়া। এঞ্জিনিয়রের চোখদুটো তখন মূর্তির দিকে নিবদ্ধ। ভুরুদুটো কোঁচকানো। মুখখানা আশ্চর্যরকম ফ্যাকাশে। অনেকক্ষণ কোনো কথা না-বলে ওইভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে। অবশেষে হঠাৎ একসময় রূঢ়ভাবে শুধোল:

'কোথায় পেলে এটা?'

'পুরানো কেল্লার ভাঙা ইমারতের মধ্যে, দোস্ত্,' বলল গুলিয়া। 'তোমার লেগে আনলাম। তুমি মূত্তি ভালোবাস, তাই।'

একটা হাত দিয়ে গুলিয়ার কাঁধটা জড়িয়ে ধরল গাবুনিয়া। নরম সুরে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ, ভাই। অনেক জ্ঞানীগুণী লোকও যে-কথা মানতে চায় না তুমি তা বুঝেছ। আগেকার কালের যাকিছু মূল্যবান সম্পদ আমাদের হাতে এসেছে সেই সবকিছু সংগ্রহ করতে হবে আমাদের, তাহলেই আমাদের ঐশ্বর্য সকল দেশের যাকিছু ঐশ্বর্য আছে তার চেয়ে বেশি হয়ে দাঁড়াবে...। এদিক থেকে আমরা খুবই ভাগ্যবান, কমরেড। ধন্যবাদ, গুলিয়া! কিন্তু এই জিনিসটি এতই সুন্দর যে এটি কোনো একজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না। এটি আমাদের সকলের যৌথসম্পত্তি।'

মূর্তিটাকে ফের বস্তায় মুড়ে ফেলতে বলল গাবুনিয়া। তারপর নিচু হয়ে মূর্তিটা তুলে তিনজনে ধরাধরি করে গাবুনিয়ার ঘরে নিয়ে এল। কাজটা চুকলে পর গুলিয়া আর

কর্কিয়া গর্বে আর আনন্দে ডগমগ হয়ে নিজেদের ব্যারাক-ঘরে চলে গেল।

এদিকে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে পুরনো পুঁথিপত্তর ঘাঁটতে লাগল গাবুনিয়া। অবশেষে যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেল আরিয়ানের বইটিতে আর সংশ্লিষ্ট বাক্যটির নিচে পেন্সিলের দাগা দিয়ে রাখল। বাক্যটি এই:

'ফাজিস নদীর বাম তীরে অসামান্য সুন্দর এক ফাজীয় রমণীমূর্তি দণ্ডায়মান আছে।'

গুলিয়ার পাওয়া এই মূর্তিটি স্পষ্টতই উল্লিখিত সেই রমণীমূর্তি।

সুইস পর্যটক দুবোয়া দ্য মংপেররে অল্প কয়েকজন ইউরোপীয়ের মধ্যে একজন যিনি একদা এই ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গটি দেখেছিলেন। তিনি এর নির্মাণকাল আনুমানিক ১০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ বলে নির্দেশ করেছেন। অতএব এই মূর্তিটি যে দু'হাজার বছরের পুরনো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বস্তার মোড়ক সরিয়ে গাবুনিয়া মর্মরমূর্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আরেকবার ভালো করে লক্ষ্য করল। দীর্ঘ দুটি হাজার বছর বয়ে গেছে এর স্বচ্ছ, প্রসন্ন কপাল ও ভ্রূযুগলের ওপর দিয়ে, দুখানে বসে কর্কিয়া মানুষের প্রতি অপর মানুষের যে-দয়ামায়ার কথা বলেছিল সেই একই রকম সুকুমার করুণামাখানো এর হাসিটির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে দু'-দুটো হাজার বছর। আর এই দু'হাজার বছর গোলাপি মার্বেলপাথরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢেকে দিয়েছে ধূসর সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম চিড়ের জালিকাজে।

বাইরে ভোরের আভাস দেখা দিলে গাবুনিয়া জানলাটা

হাট করে খুলে দিল। থেকে-থেকে এক-আধটা পাখি গাছের মাথায়-মাথায় চমক দিয়ে পালাচ্ছে। ভোরের হাওয়ায় মৃদু মর্মর উঠছে পাতায়-পাতায়। জঙ্গলের পেছনে অনেক নিচে সূর্য উঠছে, প্রকাণ্ড ঝকমকে এক-টুকরো মনির মতো। দেখতে-দেখতে আলোছায়ার দৌড়োদৌড়ি-খেলায় ভরে উঠল ঘরখানা। এক-টুকরো ঝলমলে রোদ এসে স্পর্শ করল মার্বেলপাথরে-গড়া মুখখানা, হাসিমাখা ঠোঁটদুটিতে আদরভরে হাত বুলোল বাতাস। আর হঠাৎ গাবুনিয়া অনুভব করল যে সে তাকিয়ে আছে নাম-না-জানা কোনো মহৎ শিল্পীর সৃষ্টিকর্মের দিকে।

খালের ঢোকবার মুখে লম্বা-লম্বা পতাকাদণ্ডের ওপর পতপত করে সার-সার রক্তপতাকা উড়ছে, যেন তারা ছুঁয়ে যাচ্ছে পাশের পর্বতশ্রেণীকে। পশ্চিম থেকে মৌসুমী বাতাস বইছে আর সমুদ্রতীরের এই দেশের হাওয়া ফুসফুস ভরে তুলছে যৌবনের দুর্মদ শক্তিতে।

আর মর্মরমূর্তির দিকে তাকিয়ে গাবুনিয়া ভাবল, আমাদের এই দিনটি থেকে দু'হাজার বছর আগে কোন এক অজ্ঞাত ভাস্কর তাঁর এই সৃষ্টিকর্মের মধ্যে কলখিদার আশ্চর্য ভবিষ্যতের মর্মবাণীটিকে কী এক কৌশলে যেন বিধৃত করে রেখে গেছেন।

জঙ্গলে আতশবাজি

কখনও-কখনও কী-সব সামান্য ব্যাপারস্যাপার থেকেই-না খুশির মেজাজ তৈরি হয়! যেমন, এক-ঝলক তাজা হাওয়া, তা সে টেব্‌লের ওপর রঙিন উজ্জ্বল পাতাবাহারের পাতাসুদ্ধ ফুলদানিটা উলটে দিলেও। যেমন, সমুদ্রের ঢেউয়ে

নেচে-বেড়ানো এক-টুকরো কমলালেবুর খোসা। যেমন, বাইরের রাস্তায় পাথর-নুড়ি মাড়ানোর আওয়াজ, জানলার বাইরে পরিচিত কারও গলা, কিংবা যেমন, আকাশ — শান্ত সমুদ্রের ওপর উঁচু-হয়ে-ওঠা ওই নীল গম্বুজটা।

ওইদিন ভোরবেলা এই কথাই ভাবছিল নেভ্স্কায়া। কিন্তু এ-ব্যাপারে চোপের তেমন সায় ছিল না।

কেননা তাঁর মতে, ঢেউয়ের ওপর কমলালেবুর খোসা ভেসে বেড়ানোটা ডাহা শৃঙ্খলাভঙ্গের ব্যাপার। এই গ্রীক স্টিমারগুলোর বেহায়া রাঁধুনিরা ফের মাত্রা ছাড়িয়েছে দেখা যাচ্ছে, জাহাজ থেকে বন্দরের জলে তারা জঞ্জাল ফেলা শুরু করেছে আবার।

আর ওল্টানো ফুলদানির জলে টেব্লক্লথে যে দাগ ধরে গেল, তার বেলা?

রাস্তার পাথর-নুড়ি থেকে তো আওয়াজ উঠছে নতুন জুতোর চামড়ার মতো। কারও স্নায়ু যদি বিকল হয় তাহলে ওই আওয়াজে তার গা-সির্সির করে উঠতে বাধ্য।

আর জানলার বাইরে লোকের গলা শোনা যাচ্ছে বলছ? তা, গলা তো শোনা যাচ্ছে হরেক রকম। যেমন ধর, 'সন্ত আন্তনির আগুন' অর্থাৎ লালচুলো পাইলটের গলার আওয়াজ। তা, গলাটা চেনা বটে, তবে তা শুনে কারও বিশেষ পুলক জাগে বলে তো মনে হয় না। পাইলট ভদ্দরলোকটি বিরক্তিকররকম তো-তো করে আধো-আধো গলায় বলে চলেছে: 'ঘুইলে দ্যাও! দানদিক-বরাবর, দানদিক-বরাবর, বলতি তুনত!'

'আর আকাশ? হ্যাঁ, সেটা অবিশ্যি অন্য কথা। আকাশটাকে অবিশ্যি তাচ্ছিল্য করা চলে না। আকাশ — হুম্, সেটা একটা কথা বটে!'

চোপের সঙ্গে এ-নিয়ে তর্কে নামল না নেভ্‌স্কায়া। এমন কি ওঁর এই ওজর-আপত্তিও এমন সকালবেলা মিষ্টি লাগছে। তবে সবচেয়ে বেশি আনন্দ হল নেভ্‌স্কায়ার যখন বাইরে থেকে মোটরের হর্নের আওয়াজ শোনা গেল। বড়খালের দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসবে ওদের নিয়ে যেতে চালাদিদি থেকে গাড়ি এসেছে।

চোখ-ধাঁধানো ঝলমলে শাদা পোশাক পরে বেরিয়ে এলেন চোপ। তাঁর ইউনিফর্মের হাতায়-লাগানো সোনালি জরির দড়িতে ঠিকরে পড়ল রোদ্দুর আর তাঁর পরিষ্কার-কামানো গালের ওপর ধূসর চোখদুটোকে আরও জ্বলজ্বলে ঠেকল।

ইয়োলচ্‌কাকে চোপ গাড়ির সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে তুলে বসিয়ে দিলেন। ক্রিস্তফোরিদি কিন্তু গাড়ির ফুটবোর্ডের ওপর দাঁড়িয়ে যেতে চাইল। সেদিন সারাদিন হাসিতে মুখ ভরে রেখেছিল সে, একবারের জন্যেও বিরাম দেয় নি। আর পরদিন সকালে সে বুঝে উঠতে পারে নি তার ঠোঁটের চারপাশের চামড়ায় এত ব্যথা হয়েছে কেন!

নেভ্‌স্কায়া তার ঘর ছেড়ে বেরোতে অল্প-একটু দেরি করেছিল। যখন সে বেরিয়ে এল দেখল বাকি সবাই গাড়িতে উঠে পড়েছে ততক্ষণে। ক্যাপ্টেনের চোখে পড়ল, গত রাতের বৃষ্টির ফলে রাস্তার এখানে-ওখানে জমা স্বচ্ছ জলে সবুজাভ একটা ছায়া, আর তা পড়েছে নেভ্‌স্কায়ার পোশাকের নরম সাগর-সবুজ রঙ থেকে।

বাতাসে-ওড়া সিল্‌কের পোশাকের খস্‌খসানি তুলে গাড়ির কাছে এগিয়ে এল নেভ্‌স্কায়া। ওর চোখে রোদ্দুর পড়ায় ক্যাপ্টেন সে-চোখে হাসির আভা আর উজ্জ্বল গভীরতা দেখতে পেলেন।

ওকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করার জন্যে গাড়ি থেকে নেমে এলেন চোপ। আশ্চর্য এই যে এমন কাজ তিনি আগে কখনও করেন নি! গাড়িতে ওঠার সময় উষ্ণ, সবল হাতে নেভ্স্কায়া তাঁর হাত চেপে ধরল, আর নিজের অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল চোপের। আহ্, কী অভিশপ্ত এই মাল্লার জীবন!

জাহাজের ডেক, হাল, ডেকের নিচের খোল, কয়লা-মজুতের জায়গা, সমুদ্রের বিপদ-আপদ — এইসব নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন যখন জীবন ততক্ষণে হাতের নাগাল ছাড়িয়ে পালিয়ে গেছে। তাছাড়া এমন সুন্দরী, হাস্যময়ী মেয়েদের সংস্পর্শেও চোপ আসেন নি কোনোদিন। না-না, ডোরাকাটা স্লিপিং স্যুট পরা, উজ্জ্বল লাল রঙে আঙুলের নখ রাঙানো, ছোটখাট হালকাপলকা বুর্জোয়া প্রাণীদের কথা বলছেন না তিনি, তিনি বলতে চাইছেন তাঁর নিজের ধাঁচের মেয়ের কথা: সেই ধাঁচের মেয়ে যারা ফ্রন্টে লড়াই করেছে, শারীরিক পরিশ্রম করেছে আর ত্যাগস্বীকার করেছে অনেক, যাদের জীবন নিয়োজিত ভবিষ্যৎ রূপায়ণের কাজে।

আহ্, এক-আধবার নয়, দশবার অভিশপ্ত এই মাল্লার জীবন!

'জীবনে এই সবই হারালি তুই, বুড়ো ঘুঘু,' নিতান্ত মনমরা হয়ে ভাবলেন চোপ। 'ছেলে-ছোকরারা তোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গ্যাছে।'

পরীক্ষামূলক বাগানের ধারে পেঁছে থামলেন ওঁরা। সেখানে প্রকাণ্ড একটা ফুলের তোড়া বানিয়ে নিলেন।

হাওয়ার তোড়ে প্রায়ই নেভ্স্কায়ার মাথার সবুজ স্কার্ফখানার একটা প্রান্ত ক্যাপ্টেনের গালে ঝাপটা মারতে লাগল। ভালোবাসার মানুষের আঙুলের ছোঁয়ার মতো

এই হালকা ছোঁয়ায় শিউরে উঠতে লাগলেন তিনি।

আর নেভ্‌স্কায়া হাসতে-হাসতে চলল সারাটা পথ। তাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দিচ্ছিল গাঁয়ের কুকুরগুলোর আচার-আচরণ।

গাড়িখানা কোনো-একটা গাঁয়ের রাস্তায় ঢুকলেই কুকুরগুলো অলসভাবে পায়ে-পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসছিল। তাদের ভাবভঙ্গিতে একঘেয়েমিজনিত অসম্ভব বিরক্তির ছাপ, চারপাশের বিশাল দুনিয়ার সবকিছু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট। এমন কি তাদের মধ্যে কেউ-কেউ হাই পর্যন্ত তুলছিল, আর রাস্তার ওপরই বসে পড়ে গায়ের পোকা বাছায় মন দিচ্ছিল। কিন্তু যে-মুহূর্তে গাড়িখানা এমনই একটা কুকুরের চৌহদ্দির মধ্যে পোঁছচ্ছিল, অমনই কুকুরটা হঠাৎ ভয়ঙ্কর রেগে ওঠার ভান করছিল। ঘেউঘেউ করে ডাক ছেড়ে আর গরগর করতে-করতে গাড়ির চাকা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে গাড়ির পাশে-পাশে ছুট লাগাচ্ছিল সেটা। তারপর অনধিকারপ্রবেশকারীদের নিজের চৌহদ্দি পার করে দিয়ে এসে কুকুরটা ফের একই রকম হঠাৎ তার আগেকার নির্বিকার ভাব ধারণ করছিল, তারপর সেই পুরনো বিরক্তির ভাব সারা অঙ্গে ফুটিয়ে তুলে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ফিরে যাচ্ছিল তার নিজের জায়গায় — কোনো-একটা বাড়ির ফটকে।

সবুজ পাতার ওপর নৃত্যরত ফোঁটা-ফোঁটা সূর্যালোক, শাদা ধুলোর ঘূর্ণি আর বাতাসের দুষ্টু ঝাপটা, কুকুরের ডাক আর বাচ্চাদের আনন্দ-কলরব ছুটন্ত গাড়ির এঞ্জিনের একটানা গোঁ-গোঁ আওয়াজের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল।

...ওইদিন গাবুনিয়ার ঘরে ব্যারোমিটর ইঙ্গিত

দিচ্ছিল, বাতাসের চাপ 'মোটামুটি ভালো' থাকবে।

তবু গাবুনিয়া আর মিখা উদ্বেগ কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। থেকে-থেকেই মিখা কেবল আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল, বৃষ্টির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিনা তা-ই বুঝতে। কিন্তু আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র ছিল না। দিনটা ছিল স্ফটিক-নীল আকাশের, নিঃশব্দ আর বাতাসহীন। একমাত্র শব্দ যা কানে আসছিল তা হল খালপাড়ের গাছের নিচ থেকে ভেসে-আসা হাতুড়ি আর কুড়ুলের আওয়াজ। ছুতোরমিস্ত্রিরা সেখানে ওইদিনের ভোজের জন্যে প্রকাণ্ড একটা লম্বা টেবিল আর কিছু বেঞ্চি বানাচ্ছিল।

মিন্‌গ্রেলীয় মজুররা তখনও যে-যার ব্যারাকের ঘরে বসে দাড়ি কামাচ্ছে। সিওমা ব্যস্তসমস্তভাবে কাগজের কার্তুজের খোলে ভরে চলেছে রহস্যময় কী-একরকমের গুঁড়ো। সারা সকাল ধরে সে খালি শিস দিচ্ছে আর মুখে ঘোঁতঘোঁত আওয়াজ করছে — এটা তার মেজাজ সবচেয়ে খুশ থাকার লক্ষণ।

দুপুর থেকে অতিথিরা আসতে শুরু করলেন। প্রথমেই এলেন কাখিয়ানি, পাখোমভ আর ভানো আহ্‌মেতেলিকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর এসে পৌঁছলেন চোপ আর সঙ্গে নেভ্‌স্কায়া। এরপর এল গ্রিশা, মিলিশিয়ার ব্যান্ডপার্টির আগে-আগে।

খালের জলে লাল পতাকার ছায়া পড়েছে। এক শো লোকের ভোজের জন্যে সাজানো টেবিলের ওপর গাছের ডাল থেকে ডালে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে লিয়ানালতা।

যথেষ্ট পরিমাণে টেব্‌লক্লথ সংগ্রহ করা যায় নি বলে বুড়ো দুখানওয়ালার আপসোসের অন্ত নেই। ছাউনির রান্নাঘর থেকে ইতিমধ্যেই রোস্ট-করা ভেড়ার মাংসের সুগন্ধ আকাশে

উঠছে, আর তার সঙ্গে মিশে পাওয়া যাচ্ছে খাস্তা কেক আর রক্তিম 'ইসাবেলা' মদের সৌরভ।

সরু একটা লাল ফিতে আড়াআড়িভাবে খালের এপাড় থেকে ওপাড়-বরাবর জলের ঠিক ওপরটায় টানটান করে বাঁধা।

স্থানীয় লোকের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি আর্তেম কর্কিয়াকে সঙ্গে নিয়ে কাখিয়ানি আর গাবুনিয়া স্টিমারের বাঁধাঘাট থেকে অপেক্ষমান মোটরলঞ্চটিতে নেমে এলেন।

লঞ্চের হালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সিওমা। নৌকো আটকানোর একখানা আঁকশি দিয়ে লঞ্চখানাকে সে আটকে রেখেছে। সদ্য দাড়ি কামিয়ে এসেছে সে, ভারি ছিমছাম দেখাচ্ছে তাকে। যেন প্যারেড করতে নেমেছে এমনভাবে সে অ্যাটেন্‌শনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। পুরনো জাহাজী শৃঙ্খলার নিয়মকানুন অনুযায়ী কোন সময়ে কোনটা উপযুক্ত কাজ সিওমা ভালোই জানে তা।

মজুর-কর্মীরাও খালের দুই পাড়-বরাবর সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে।

কাখিয়ানি এবার হাত তুললেন। লঞ্চের এঞ্জিন চালু করল সিওমা।

উদ্যোক্তাদের মতলব ছিল লঞ্চখানা এমনভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে তার সামনের মাথাটা খালের এপাড় থেকে ওপাড়ে আড়াআড়িভাবে বাঁধা লাল ফিতেটায় গিয়ে ঘা দেয় আর তা ছিঁড়ে দেয়। কাজটা খুব সহজ ছিল না। সিওমা লঞ্চখানাকে সোজা ফিতেটার দিকে চালাচ্ছে আর একেকবার আড়চোখে তাকাচ্ছে ফিতের দিকে। লঞ্চও সামনের দিকে ছুটে চলেছে, জোরে আরও জোরে।

সামনের মাথাটা ঠিকমতোই ফিতেটায় গিয়ে ঘা দিল।

লাল ফিতেটাও আরও টানটান হয়ে উঠে পট করে গেল ছিঁড়ে, আর তার ছেঁড়া দুই প্রান্ত ছাড়া পেয়ে হাওয়ায় গেল উড়ে। লঞ্চখানাও সজোরে ঝিকঝিক শব্দ তুলে খাল বেয়ে ছুটল।

হাত নেড়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সিওমা, 'হিপ, হিপ, হুররা!'

দুই পাড় থেকেও ওর চিৎকারের সজোর সাড়া মিলল। ব্যান্ডে বাজতে লাগল 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীতের সুর। মজুররা টুপি নাড়তে লাগল। লঞ্চের এঞ্জিন বন্ধ করে দিল সিওমা, আর লঞ্চের আরোহীরাও দাঁড়িয়ে উঠলেন।

এই প্রথম ওই আদিম অরণ্য গান-বাজনায় মুখর হয়ে উঠল।

চোপের দিকে নজর পড়ল নেভ্স্কায়ার। স্যালুটের ভঙ্গিতে টুপিতে আঙুল ঠেকিয়ে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ইউনিফর্মের ঝলমলে শাদার পটভূমিতে রোদে-পোড়া আঙুলগুলো তাঁর কালো-কালো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তি আর প্রশান্তির প্রতিমূর্তি যেন। হঠাৎ খেয়াল হল নেভ্স্কায়ার যে লোকে বড়-একটা হামেশাই-যে 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীত শুনতে পায় তা নয়। আর তাই এই সঙ্গীতের উদাত্ত সুর মানুষের মনে সাফল্যের চূড়াস্পর্শের অনুভূতি আনে — জয়গৌরবের, শ্রম-সমাপ্তির সঙ্গীত হিসেবে। আর হয়তো এই কারণেই এ-সঙ্গীত শোনার সময়ে চাপা আবেগে মানুষের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে।

সঙ্গীত শেষ হলে কাখিয়ানি চেঁচিয়ে বললেন:

'সেলাম, কমরেডস! জয়ের আনন্দ উপভোগ করুন সবাই মিলে!'

'সেলাম, সেলাম!' সাড়া দিল মজুরের দল।

'কমরেডস!' কাখিয়ানি এবার শুরু করলেন। 'খাল কাটার কাজ খতম, কাজেই একটা সন্ধে বিশ্রাম আর আনন্দ-উৎসবের জন্যে খরচ করতে পারি আমরা...। আপনারা জবর একখান কাজ করেছেন, কমরেডস, সবথেকে প্রবীণ শ্রমিক-কর্মী থেকে শুরু করে সোভিয়েতে শিক্ষা-পাওয়া সবথেকে তরুণ এঞ্জিনিয়র পর্যন্ত আপনারা প্রেত্যেকে। বল্‌শেভিক পার্টির পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্চি। বাদা আর জঙ্গল, বৃষ্টি আর ম্যালেরিয়া-জ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে জয়ী হয়েচেন আপনারা।

'শুধু আপনারা জলাজমির জলনিকাশই করেন নি। আরও অনেক বেশিকিছু করেছেন। কেন, তা বোঝাবার জন্যে আমি শুধু দুটো ঘটনার কথা বলতে চাই। এর মধ্যে কাব্যিভাব কিছু নেই, এ নিছক সত্য ঘটনা।

'এই-যে এখানে বুড়ো মানুষটিকে দেখছেন, এই আর্তেম কর্‌কিয়া সারা জীবন গলায় খালি বাদামের খোলে মরা শুকনো মাকড়সা-ভরা একটা মাদুলি ঝুলিয়ে রেখেছিল এতকাল। ওর বাবাও এমনি বাদামের খোল পরে থেকেছেন, ওর ঠাকুর্দাও পরে থেকেছেন এই বাদাম। আপনারা সকলেই জানেন যে আগেকার দিনে বাদা-অঞ্চলের লোকে বিশ্বাস করত, জ্বরের মহৌষধ হল মরা শুকনো মাকড়সা। বৃদ্ধারা একেকটা মাকড়সার ওপর মন্ত্র পড়ে দিতেন আর লোকে বিশ্বাস করত যে মরা মাকড়সা আর বৃদ্ধাদের মন্ত্রপড়া তাদের জ্বরের হাত থেকে বাঁচাবে।

'কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগে আর্তেম কর্‌কিয়া তার মাদুলিটা গলা থেকে খুলে জলে ফেলে দিল। বলল, 'বাদামের খোলা আর মাকড়সা দে কী হবে আমার যখন ইঞ্জিনিয়াররাই মাকড়সার চে' ভালোভাবে ম্যালোরি নিকেশ

করতে পারবে?’ কাজেই দেখতে পাচ্চেন আপনাদের শ্রম কী করে কুসংস্কার থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হয় তা শেখাচ্ছে মানুষজনকে।

‘আরও একটা ব্যাপার আপনাদের জানাব, কমরেডস। আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো ভুলভাবে এ-ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করতে পারেন। কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমি বাদা থেকে উদ্ধার-করা ফাজীয় নারীমূর্তির কথা বলছি। খোদাই-মূর্তির গুণাগুণ বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই। মিকায়েলঅ্যাঞ্জেলোও নই, আন্তকোল্স্কিও নই আমি, আমি শুধু নেহাতই পতিত জমি পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। কিন্তু এই ব্যাপারটা — গুলিয়ার মতো সরল শাদাসিধে একজন শিকারি আর এই বুড়ো আর্তেম কর্কিয়া এই ধরনের জিনিসের সাংস্কৃতিক মূল্য-যে বুঝতে পেরেচে, হয়তো খুব স্পষ্টভাবে নয় তবু তাসত্ত্বেও তারা-যে এটা ধরতে পেরেচে — এই ঘটনাটাই আমাকে দারুণ আনন্দ দিয়েচে, কমরেডস! যদিও আমি খোদাই-মূর্তির গুণাগুণের বিচার করতে অসমর্থ, তবু।

‘প্রতিটি সংস্কৃতি, প্রতিটি সভ্যতা ছেঁকে তার সেরা জিনিসগুলো আমাদের নিতে হবে, কমরেডস। আমাদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের হাপরে এই সবকিছু ফেলে গালিয়ে নিতে হবে, আর তাহলেই আমরা এমন এক সবসেরা সংস্কৃতি তৈরি করতে পারব যার তুলনা পৃথিবীর মানুষ কোনোদিন দ্যাখে নি, জানে নি।

‘সোভিয়েত আধা-গ্রীষ্মমণ্ডল দীর্ঘজীবী হোক! আপনারা নিজের হাতে, নিজেদের শ্রম দিয়ে এই দেশ গড়ে তুলছেন। আচ্ছা, কমরেডস, এবার আপনারা বিশ্রাম করুন, প্রাণভরে আনন্দ উপভোগ করুন!’

কাখিয়ানির বক্তৃতার পর সবাই এসে জড় হল প্রকাণ্ড টেবিলটার চারপাশে। লাল হয়ে উঠে আর ঘামতে-ঘামতে দুখানওয়ালা ব্যস্তসমস্তভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একই সঙ্গে অস্বস্তি আর পরমানন্দের দোলায় দুলছিল সে। বেচোর আঁকা ছবিতে যেমনটি আছে ঠিক তেমনই খোলা আকাশের নিচে এই বিরাট ভোজের আয়োজন, এক শো জন নিমন্ত্রিতের জন্যে এই ভোজ, আর এ-সবই জীবনে এই প্রথম তার নিজের হাতে-গড়া আয়োজন — একথা ভেবে তার পরমানন্দ। আর অস্বস্তি আর আতঙ্ক এইজন্যে যে পুরো টেবিল ঢাকবার মতো যথেষ্ট সংখ্যায় টেব্‌লক্লথ পাওয়া যায় নি আর হয়তো সকলের খাবার সাজানোর মতো যথেষ্ট ডিশও যোগাড় হয়ে উঠবে না।

পাখোমভ খুশিখুশি ভাব নিয়ে লম্বা টেবিল-বরাবর তাকিয়ে দেখলেন একবার।

তারপর গাবুনিয়াকে বললেন, 'আপনারা সবাই হলেন গিয়ে আর্‌গোন্যট, বুঝেছেন? জেসন একদিন এই কলখিদাতেই 'স্বর্ণ-মেষচর্ম', আবিষ্কার করেছিলেন, আর আপনারা এখানে আবিষ্কার করলেন গ্রীষ্মমণ্ডলকে। হ্যাঁ, ভালো কথা। আচ্ছা, কখনও কি ভেবেছেন প্রাচীনকালের লোকেরা 'স্বর্ণ-মেষচর্ম' বলতে কী বুঝেছিলেন? আরে, সাধারণ ভেড়ার চামড়াই বোঝাতে চেয়েছিলেন তাঁরা। তাঁরা করতেন কী জানেন? একেকটা ভেড়ার চামড়ার ধারে-ধারে পাথরের নুড়ি বেঁধে দিয়ে চামড়াখানা ফেলে রাখতেন জলে সোনার রেণু আছে এমন সব নদীর তলায়। চারপাশে পাথর বাঁধা থাকায় চামড়াখানা ঠিক জায়গায় থাকত, ওপরে ভেসে উঠত না। আর জলে ভেসে-আসা সোনার রেণুগুলো আটকে যেত ওই চামড়ার লোমে।'

'এ তো খুব সোজা ব্যাপার,' বললেন কাখিয়ানি। 'কাব্যিটাব্যি কিছু নেই এতে। এ হল গিয়ে নদী থেকে সোনা ছেঁকে তোলার আদিম একটা পদ্ধতি আর-কি।'

'একেবারে সরল-সহজ সব ব্যাপারের মধ্যেও কাব্যি আছে হে,' পাখোমভ হেসে-হেসেই ফোড়ন কাটলেন। 'উপকথার মধ্যেই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বীজ নিহিত থাকে। মানুষের বড়-বড় সব লক্ষ্য পূরণের আকাঙ্ক্ষা থেকেই উপকথার জন্ম। এদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর উপকথা হল ইকারাসের কাহিনী। আজকের দিনে প্রতিটি বৈমানিক হল নতুন একেকজন ইকারাস। তেমনি জেসনের উপাখ্যানে বলা হয়েছে কেমন করে তিনি একজোড়া অগ্নি-নিশ্বাসী বলদ লাঙলে জুতে মাঠে লাঙল দিয়েছিলেন। আচ্ছা, বলুন দেখি এই অগ্নি-নিশ্বাসী বলদ কী বস্তু?'

'কী আবার, ট্র্যাক্টর,' হাসি চাপতে-চাপতে বলল গাবুনিয়া।

পাখোমভ সায় দিলেন, আর হো-হো করে হেসে উঠলেন চোপ।

'নিজের যোগ্যতায় মানুষের আস্থা থাকা উচিত,' পাখোমভ বলে চললেন। 'আর তা থাকলেই সে পারবে নদীর গতিপথ ঘুরিয়ে দিতে আর সাইবেরিয়ায় পাতিলেবু ফলাতে। না-না, হাসি নয়, আমি ভেবেচিন্তেই বলছি কথাটা। নিজের শিল্পকলার শক্তিতে আর তার অসাধ্যসাধনের ক্ষমতায় মানুষকে আস্থা রাখতেই হয়। কবি অর্ফিউস যখন বীণা বাজিয়ে গান ধরলেন তখন সমুদ্র শান্ত হয়ে গেল। গ্রীকরা একথা লিখেছে রীতিমতো গুরুত্ব দিয়েই। তারা সরলভাবে এটা বিশ্বাস করত। শিল্পের শক্তিতে আস্থা রাখত তারা। তা, প্রযুক্তিবিদ্যাও তো এক-ধরনের শিল্পই, নাকি বলেন কমরেড কাখিয়ানি? গ্রীকরা যেমন অর্ফিউসের বীণার

ওপর ভরসা রাখত, আমাদেরও তেমনি প্রযুক্তিবিদ্যায় আস্থা রাখা উচিত। আজ আপনারা কলখিদা-বিজয়, 'স্বর্ণ-মেষচর্ম' আর আরগোন্যটদের দুঃসাহসিক অভিযানের উপাখ্যানগুলোকে বাস্তব সত্য করে তুলছেন। ধন্যি আপনাদের!'

'আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি,' বিষম লজ্জা পেয়ে বিড়বিড় করে বললেন কাখিয়ানি। 'কাজেই আপনার কথা বিশ্বেস না-করে করি কী। আপনি যা বলচেন তাহলে তা-ই!'

চুপটি করে বসে নেভ্স্কায়া ওর চারপাশের নানারকম আলাপ-আলোচনা শুনে যাচ্ছে। জেসন আর পৌরাণিক উপকথা, ট্র্যাক্টর আর বৈমানিক নিয়ে তর্ক শুনে যাচ্ছে ও, শুনছে মজুর-কর্মীদের উচ্ছল খুশিভরা আলাপ আর থেকে-থেকে মিখার কান-ফাটানো হাসি, কানে আসছে গুলিয়ার ধরা-ধরা গলার আওয়াজ, বাচ্চাদের কিচিরমিচির, চোপের মোলায়েম হাসিঠাট্টা-ভরা কথা।

ব্যান্ডে এমন একটা প্রাণমাতানো সুর বাজছে যা নেভ্স্কায়া আগে কখনও শোনে নি। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে টেবিলটার এখানে-সেখানে, আর শাদা-শাদা টেব্লক্লথগুলো, বোতল আর গেলাস, খাওয়ায় ব্যস্ত লোকজনের রোদে-পোড়া হাতগুলোর ওপর এসে পড়েছে সোনালি আলোর আভা। গেলাসগুলোর ভেতরে উঁকি দিয়ে সেই আলোর আভা রক্তিম মদকে ঝলমলিয়ে তুলেছে, হাতে-গড়া আটার রুটিগুলোকে করে তুলেছে সোনালিরঙের।

যেন একটা মস্ত বড় ঘনিষ্ঠ পরিবারের সাধারণ হৈ-হল্লায়-ভরা ছুটির দিন উদ্যাপিত হচ্ছে জায়গাটায়।

নেভ্স্কায়া নিজে কিন্তু একেবারেই কথা বলছে না। তার

মনে হচ্ছে কী-একটা যেন ঘটেছে তার, কী যেন একটা ভর করেছে তার ওপর, যা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। তবে সেটা ভারি সূক্ষ্ম আর সুন্দর একটা জিনিস। কিন্তু কী হতে পারে তা?

আর হঠাৎ সে ধরতে পারল ব্যাপারটা কী।

'আরে, এ তো বন্ধুতার মনোভাব! পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তার মধ্যে সবচেয়ে মধুর সেই সত্যিকার খাঁটি বন্ধুতা। এ সেই বন্ধুত্ব যা গড়ে ওঠে একসঙ্গে কাজ করা আর বিপদের সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে দিয়ে, সংঘর্ষের আর জয়ের সাফল্য অর্জনের মধ্যে দিয়ে, হার মানা আর তুমুল তর্কবিতর্কের পর্যায় পার হয়ে। এ হল আমাদের নতুন যুগের নতুন ধরনের এক মানসিক আবেগ, মানুষের জানা সবরকম আবেগের মধ্যে সবচেয়ে মধুর এ।'

মজুরদের দিকে ফিরে তাকাল নেভ্‌স্কায়া। অনেকেই ওর দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর তাদের গেলাস তুলে ধরল ওর স্বাস্থ্যপান করতে। ওর জন্যে, লেখাপড়া-জানা এই মেয়েটির জন্যে তাদের গর্বের শেষ নেই, যে নাকি তাদেরই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সারা রাত প্রচণ্ড বৃষ্টি মাথায় করে কাজ করে গেছে। ওর জন্যে, ঝলমলে সিল্‌কের গাউন-পরা এই সুন্দরী মেয়েটির জন্যে তাদের গর্বের সত্যিই শেষ নেই।

ফের একবার নেভ্‌স্কায়া ফিরে তাকাল সেইদিকে যেখানে বসে আছে গাবুনিয়া আর আছেন কাখিয়ানি আর পাখোমভ। সবাই ওঁরা তার বন্ধু। ওঁরা এখনও পৌরাণিক উপাখ্যান আর উপকথা নিয়ে গভীর তর্কে ডুবে আছেন।

এবার ওর চোখ পড়ল চোপের দিকে। ক্রিস্তফোরিদি, ইয়োলচ্‌কা আর সোসো ক্যাপ্টেনের দিকে হাঁ-করে তাকিয়ে

তাঁর প্রতিটি কথা গিলছে। গল্প বলছেন চোপ। মুখখানাকে গম্ভীর করে রেখেছিলেন তিনি, এবার কী একটা কথায় যেন হঠাৎ সজোরে হেসে উঠলেন। বাচ্চারাও রিন্‌রিনে গলায় ওঁর সঙ্গে হাসিতে যোগ দিল। নেভ্‌স্কায়াও হাসল, কেন-যে হাসল তা ও নিজেই জানে না।

প্রায় গাছের মাথা-বরাবর নেমে এসেছে সূর্য। দ্রুত পশ্চিমে ঢলে পড়ছে। তেরছা হয়ে এসে-পড়া রোদ্দুরে গাছের পাতাগুলোকে চকচকে ব্রোঞ্জের তৈরি বলে মনে হচ্ছে।

জঙ্গলের পেছনে বহুদূরে সূর্য যখন সমুদ্রে ঢলে পড়তে যাচ্ছে এমন সময় কথাবার্তা আর হাসির হৈ-চৈ ছাপিয়ে একটা বেশ চড়াসুরের প্রায়-মেয়েলি গলা রিন্‌রিন করে বেজে উঠল। দেখা গেল মিখা গাইছে প্রাচীন জর্জীয় একটা গান:

রাজা হেরাক্লিসের ছেল পরতাপ দোর্দণ্ড,
কেবল এট্টা ব্যাপারে তার জারিজুরি ফাঁক,
সোন্দরী তার রানী খেদান দেল—অবাক কাণ্ড—
রানী তারে ধারে ঘেঁষতে দিত না বেবাক।

নেভ্‌স্কায়ার কানের কাছে ঘেঁষে এসে গাবুনিয়া গানের কথাগুলো রুশ ভাষায় তর্জমা করে দিতে লাগল। মাথা নিচু করে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে বসলেন পাখোমভ। কাখিয়ানি বসে রইলেন সন্ধের আকাশ যেখানে উলটে শুয়ে আছে খালের সেই স্বচ্ছ, কালো জলের দিকে তাকিয়ে।

রাজা ঘুরে মরত একা বাগানে মনমরা,
কেঁদে-কেঁদে সারাটা রাত ভোর করত ও-সে,

যতেক রাখাল, ব্যাধেও জানত রাজার কপাল পোড়া,
পীরিত-খোওয়া রাজায় নিয়ে রঙ্গ করত কষে।

খালি একটা মদের গেলাস হাতে নিয়ে ঘোরাতে লাগলেন চোপ। আঙুলগুলো একটু-একটু কাঁপছে। জর্জীয় ভাষা তিনি জানেন, গানের মানে বুঝতে অসুবিধে ছিল না তাঁর। মাল্লার জীবন বড় অভিশপ্ত! তাঁর মনে হল গানটা যেন তাঁকে নিয়েই লেখা, জীবনে কোনোদিন কেউ ভালোবাসে নি যাঁকে সেই বুড়ো জাহাজীকে নিয়েই লেখা গানটা।

আমার কিন্তু কিচ্ছুটি নাই, ছেঁড়া কপ্‌নিসার,
ঢাল-তলোয়ার ছাড়া দ্যাখো কিচ্ছুটি নাই ঘরে,
তবু আমায় সোহাগ করে তামারা আমার,
রাজা হেরাক্লিস হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরে।

ওজনে-ভারি একটা ফুল ঝুপ করে খসে চোপের হাতে পড়ল। কালো-কালো ক'টা পাপড়ি খসে ছড়িয়ে পড়ল টেবিলে।

ফুলটা তুলে ক্যাপ্টেন নিজের ইউনিফর্মের বাট্‌নহোলে গুঁজে নিলেন। ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত পরিণত এই কালো গোলাপ তাঁর চেনা। এ-ফুল একমাত্র পরীক্ষামূলক বাগানেই জন্মাচ্ছে এখন।

আড়চোখে ক্যাপ্টেন নেভ্‌স্কায়ার দিকে তাকালেন। ওর ঠোঁটের কোনাদুটো একটু-একটু কাঁপছে। হাসি চাপার চেষ্টা করছে ও। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কিছুতেই দৃষ্টিবিনিময় করবে না, ঠিক করেছে।

'হ্যাল্লো!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সিওমা। নাচের ভঙ্গিতে গোড়ালি আর পায়ের আঙুলগুলো দ্রুত মাটিতে ঠুকতে-

ঢুকতে বলল, 'হ্যাল্লো! ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, খেলা জমে উঠেচে!'

সঙ্গে সঙ্গে মজুররা লাফিয়ে উঠে খাড়া হয়ে গেল পায়ের ওপর। ব্যান্ডপার্টিও ধরে দিল 'লেজ্‌গিন্‌কা' নাচের বাজনা। গাবুনিয়াও লাফিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে আর ঘুরে-ঘুরে দ্রুত হালকা চালের এই জাতীয় নাচে যোগ দিল। তীক্ষ্ন একটা চিৎকার ছেড়ে আর জামার হাতার ধাক্কায় টেবিলের গেলাসগুলো উলটেপালটে দিয়ে মিখাও নেমে পড়ল নাচে।

ড্রামগুলো দ্রুত লয়ে সজোরে বেজে চলল। টেবিলের বাকি সবাই নাচিয়েদের ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল আর বাজনার তালে-তালে হাততালি দিয়ে চলল: 'আশ্‌! আশ্‌! আশ্‌! আশ্‌!'

মোটা চেহারা সত্ত্বেও দুখানওয়ালার নাচের কারদানি দেখে জোর বাহবা দিয়ে উঠল সবাই। লাট্টুর মতো বনবন করে ঘুরছিল সে, তার চওড়া সুতী-কাপড়ের ট্রাউজার্স নাচের ধাক্কায় ফুলে উঠেছিল নৌকোর পালের মতো। মাথার ওপর দু'হাত তুলে সে তালি দিচ্ছিল আর একসময় ভিড়টার ভেতরে চক্কর দিয়ে হালকা চালে দ্রুত নেচে ফিরতে লাগল।

'আশ্‌! আশ্‌! আশ্‌! আশ্‌!' নাচের বোল আওড়াতে লাগল একই সঙ্গে নাচিয়ে আর দর্শকের দল।

পায়ের দাপে জঙ্গলের ওপর ধুলোর মেঘ ভেসে উঠল।

এরপর নেভ্‌স্কায়া যখন পোশাকের পেখম উড়িয়ে নাচিয়ের দলে ভিড়ে গেল তখন লোকের আনন্দ-উৎসাহ উঠল চরমে। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় ঝলমল করতে লাগল ওর সবুজ পোশাক, পাশ দিয়ে নেচে-নেচে যাবার সময় দর্শকদের মুখেচোখে ও দিয়ে যেতে লাগল উষ্ণ হাওয়ার ছোঁয়া।

ভিড়ের চারপাশ ঘিরে পাশেপাশে ডিগবাজি খেতে-খেতে চেঁচাতে লাগল ক্রিস্তফোরিদি, 'উর্‌রা! ঠিকমতো দাও শান! ঝকঝকে খরশান!'

ক্রিস্তফোরিদির দেখাদেখি ওর পিছু-পিছু সোসোও ডিগবাজি খেয়ে চলল।

লাঠিগাছ উঁচিয়ে নাড়তে-নাড়তে কাশতে লাগল আর্তেম কর্‌কিয়া। গুলিয়া পায়ে তাল দিতে লাগল, কিন্তু নাচিয়ের দলে ভিড়ে যেতে রাজি হল না।

'আমাদিগের এই বাদায় সুখের দিন এয়েচে, দোস্ত! অ্যাদ্দিনে সুখের দিন এয়েচে,' চেঁচিয়ে বলে উঠল কর্‌কিয়া।

ইয়োলচ্‌কা যাতে নাচিয়েদের দেখতে পায় তার জন্যে তাকে তুলে কাঁধের ওপর বসিয়ে নিলেন চোপ।

স্ফূর্তিতে সবচেয়ে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল ভানো আহ্‌মেতেলি। চুলোয় যাক ন্যাট্রিয়া, শয়তানের গভ্‌ভে যাক তা! নাচো, নাচো, জোরে আরও জোরে!

প্রচণ্ড আনন্দে নেচে চলল ভানো। ইয়োলচ্‌কার পাশ দিয়ে নাচতে-নাচতে দ্রুত ছুটে চলার সময় সে মজা করে মুখে হুপ-হুপ আওয়াজ করল আর চোখ ঘোরাতে লাগল।

'ইস্‌, এই নোকগুলোর লাচন দেখে আর হেসে বাঁচি নে,' মিলিশিয়ার লোক গ্রিশা চেঁচিয়ে বলল, তারপর নিজেই নেমে পড়ল নাচিয়ের দলে।

এমন সাংঘাতিক জোরে ও পাক খেতে লাগল যে অদৃশ্য হয়ে গেল প্রায়। ফলে অন্য সব নাচিয়েকে বাধ্য হয়ে নাচ থামাতে হল। লোকে ওর কাছ থেকে দৌড়ে পালাতে লাগল, যেন ও আস্ত একটা বোমা, এখুনি বুঝি ফাটবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কান-ফাটানো একটা হুইস্‌লের শব্দ আকাশ চিরে ফেলল। তারার মাঝখানে উঠে একটা রকেট

সজোরে ফাটল আর তারপর ঝলমলে আলোর তারাবৃষ্টি হল আকাশ জুড়ে। বোঝা গেল, সিওমার তারাবাজি পোড়ানো শুরু হয়েছে।

এরপর গোছায়-গোছায় রকেট আকাশে উঠতে লাগল আর ফাটতে লাগল কান-ফাটানো আওয়াজ করে। আর একমাত্র তখনই স্ফূর্তির হুল্লোড়ে গা-ঢেলে-দেয়া মানুষ লক্ষ্য করল যে রাত হয়ে গেছে, নেমে এসেছে নীলচে সন্ধে-রাত বারুদ আর মদের গন্ধে ঝাঁঝালো হয়ে।

খালের দুই পাড়ে আগুনের কুণ্ডও জ্বালানো হয়েছে সারে-সারে। ফলে খালের জল রঙ ধরেছে তরল আগুনের, আর সেই জ্বলন্ত লাল আভা চিরে-চিরে যাচ্ছে উড়ন্ত রকেটের শাদা-শাদা অর্ধবৃত্তের রেখায়।

এদিকে হাজারে-হাজারে জোনাকি গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে, একবার জ্বলছে একবার নিবছে। মনে হচ্ছে যেন তারাভরা আকাশটাই নেমে এসেছে মাটির কাছাকাছি। থেকে-থেকে জোনাকিরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর ঘুরপাক খাচ্ছে জঙ্গলটার মাথার ওপর — বাংলা-বাতি বাজির আলোয় ভয় পেয়ে কখনও-বা উঠে যাচ্ছে ওপরে, আবার কখন ফের নেমে এসে নীলচে আলোর ঝিলিক তুলে ছুঁয়ে যাচ্ছে গাছের মাথা।

ক্যাপ্টেনের কোলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল ইয়োলচ্কা। চোপ তাকে গাবুনিয়ার ঘরে নিয়ে এসে সরু একফালি খাটখানার ওপর শুইয়ে দিলেন। গ্রীষ্মকালের বিদ্যুচ্চমকের মতো লাল আর শাদা আলোর ঝিলিক খেলে বেড়াচ্ছে ফাজীয় নারীমূর্তির হাসি-হাসি মুখখানার ওপর।

'আহ্, এক-আধবার নয়, দশ-দশবার অভিশপ্ত এই মাল্লার জীবন!'

জানলায় এসে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। আকাশে আগুনে-ম্যাজিকের খেলা দেখতে লাগলেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে।

ইতিমধ্যে নেভ্‌স্কায়া কখন নিঃশব্দে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। হালকা, তপ্ত একখানা হাত ক্যাপ্টেনের কাঁধে রেখে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বাজি পোড়ানো দেখতে লাগল সে-ও। নড়তে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছিলেন চোপ, কথা বলতেও সাহস হচ্ছিল না। নেভ্‌স্কায়াও চুপ করে রইল।

তারপর একসময় যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে গেল নেভ্‌স্কায়া। ওর পোশাকের খস্‌খসানি শুনলেন চোপ। দরজা বন্ধ হল, তা-ও শুনলেন। আর তারপর হঠাৎ রাত্তিরটা ওঁর চারপাশে পাক খেতে শুরু করল। জানলার চৌকাঠ চেপে ধরলেন তিনি, চোখের ওপর হাত বুলোলেন একবার। হাতটা কেমন ভিজে-ভিজে ঠেকল।

'আহাম্মক কোথাকার!' বিড়বিড় করে নিজের মনেই বললেন চোপ। 'সাতচল্লিশটা বছর একা-একা কাটিয়ে দিলি, আর এখন কিনা হঠাৎ...।'

বাইরে রাতের জগৎ তখন গান-বাজনায় আর আলোয় জমজমাট। আর চোপ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, একমাত্র এখনই, এই সাতচল্লিশ বছর বয়সে তিনি জানতে পারলেন সম্পূর্ণ সুখ বলতে কী বোঝায়!

তাড়াতাড়ি পিছু ফিরে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

নগ্নপদ আর্‌গোন্যটরা

পরদিন ভোরবেলা দিনের আলো ফুটতেই সিওমা একখানা মোটরলঞ্চ চালিয়ে এনে খালের স্টিমারঘাটায় ভেড়াল। অতিথিদের কয়েকজন আগের দিনই ঠিক করেছিলেন, তাঁরা

পোতিতে ফিরবেন খাল বেয়ে হোপি নদী হয়ে সমুদ্রপথে। আগের দিনের মতোই দিনটা ভালো যাবে বলে ঠাহর হচ্ছিল।

খালের দুই পাড়-বরাবর আগের রাতের অগ্নিকুণ্ডগুলো তখনও চাপা আগুনে ধোঁয়াচ্ছে। গাছের পাতা থেকে গরম ছাইগাদার ওপর শিশির পড়ে হিসহিস শব্দ উঠছে থেকে-থেকে। জঙ্গলে পাখিরা গান ধরেছে।

সিওমার লঞ্চের যাত্রী হল নেভ্‌স্কায়া, বাচ্চারা, চোপ আর গাবুনিয়া।

লঞ্চ যখন ব্যারাক-বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে দ্রুত ছুটে চলল তখন মজুররা টুপি নেড়ে চেঁচিয়ে বিদায় জানাল। এরপর এল জঙ্গল, গাছপালার পাতায় সবুজ ঝরনার মতো তা-ও দেখতে-দেখতে পার হয়ে গেল। এরপর খাল ফুরোল, আর লঞ্চখানা একবার ঝাঁকি দিয়ে উঠে আঁকাবাঁকা হোপি নদীর রহস্যময় ছায়াবীথির মধ্যে সেঁধোল।

সূর্য উঠল এই সময়। ওদের পেছনদিকে প্রকাণ্ড একটা শাদা গোলকের মতো উঠে নদীর জলের ওপর লম্বা-লম্বা ছায়া ছড়িয়ে দিল।

ঝিকঝিক শব্দ তুলে সামনে, আরও সামনে গাছপালা আর নদীর জলের উষ্ণ সোঁদা গন্ধ গায়ে মেখে এগিয়ে চলল ওরা। অবশেষে একসময় দূরে সমুদ্র দেখা দিল, আর সেদিক থেকে বাতাস বয়ে নিয়ে এল সামুদ্রিক শ্যাওলা আর ভিজে বালির ঠাণ্ডা, তীব্র গন্ধ।

ছোট্ট শহর রেদুত-কালে নদীর জলে ছায়া ফেলে চুপটি করে শুয়ে আছে। খুঁটির-ওপর-বসানো তার গোলাপি আর নীলরঙের বাড়িগুলোর প্রতিটি খুঁটিনাটির ছায়া জলের ওপর উজ্জ্বল, রোমশ একখানা শালের মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

মোটরলঞ্চের জোরালো ঝিকঝিক শব্দ শহরটার বাড়ি থেকে বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল, ছুটে চলল। দরজায়-দরজায় ধাক্কা দিয়ে বাসিন্দাদের জাগিয়ে তুলল তা।

একটা বাড়ির বারান্দায় বাচ্চাকোলে একটি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়াল পর্যন্ত। একটা মোরগ ডেকে উঠল এক জায়গায় আর একঝাঁক পায়রা মাথার ওপর ঘুরপাক খেতে লাগল।

লঞ্চখানা এবার ছুটে বেরিয়ে এল খোলা সমুদ্রে, তারপর সুন্দর শোভনভাবে একটা বাঁক নিয়ে দক্ষিণ দিকে মুখ ফেরাল। নদীর মোহানার কাছে নোঙর-করা একখানা পুরনো পালতোলা জাহাজের গায়ে জলের ধারা ছিটিয়ে দিয়ে গেল লঞ্চখানা।

দূরে কোথাও সমুদ্রের পাড়ে ঢেউ ভাঙার একঘেয়ে শব্দ কানে এল।

জাহাজের মাল্লারা রোদে-পোড়া চেহারা নিয়ে বসে ছিল ডেকের ওপর, আর খালি-পাগুলো ঝুলিয়ে রেখেছিল জাহাজের পাশটাতে, জলের ওপর। পাইপ টানতে-টানতে তারা, এই নতুন যুগের আর্‌গোন্যটরা, তাকিয়ে ছিল কলখিদার তীরভূমি ছাড়িয়ে ভেতর দিকে — দেশের গভীরে।

১৯৩৪

তুষারের কাল

বৃদ্ধ পতাপভ মারা যাওয়ার মাসখানেক আগে তাঁর বাড়িতে থাকতে এসেছিল তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না। বাচ্চা মেয়ে ভারিয়া আর বাচ্চার বৃদ্ধা আয়াকে নিয়ে অতঃপর তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না একা বাড়িটাতে বসবাস করতে লাগল।

শহরের একপ্রান্তে একটা টিলার ওপর ছোট্ট তিন ঘরওয়ালা একখানা বাড়ি। বাড়ি থেকে উত্তরের নদীটা দেখা যায়। বাড়ি আর তার সংলগ্ন বর্তমানে-ন্যাড়া বাগানটার ওধারে ঝলমল করে শাদা একটা বার্চবন। আর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেই বনে ডাকাডাকি করে দাঁড়কাকের দল। ঝাঁক বেঁধে ন্যাড়া গাছগুলোর মাথার ওপর উড়ে-উড়ে ডাকতে থাকে তারা, যেন শহরটায় বিষণ্ন আবহাওয়াই বুঝি ডেকে আনে।

মস্কো ছাড়বার পর তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌নার পক্ষে বেশ কিছুদিন সময় লাগল ছোট-ছোট বাড়ি আর ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ-তোলা সংলগ্ন বাগানের ফটক-নিয়ে-গড়া এই নির্জন শহরটায় মন বসাতে, নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে এখানকার সন্ধেগুলোর সঙ্গে, যা নাকি এতই নিস্তব্ধ যে প্যারাফিন-বাতির শিখার দপ্‌দপানি পর্যন্ত শোনা যায়।

'ইস, কী বোকা আমি!' তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না ভাবত তখন। 'কেন-যে মস্কো ছাড়তে গেলুম, থিয়েটর, বন্ধুবান্ধব সব ছেড়েছুড়ে কেন-যে মরতে চলে এলুম কে জানে! অনায়াসেই ভারিয়াকে পাঠিয়ে দিতে পারতুম ওর আয়ার বাড়ি পুশকিনোতে, সেখানে বিমান-আক্রমণ হচ্ছে না। আর নিজে থেকে যেতে পারতুম মস্কোয়। হায়-হায়, কী বোকাই-না আমি!'

তবে তখন মস্কোয় ফিরে যাওয়ার পক্ষে খুবই দেরি হয়ে গেছে। তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না ঠিক করল, শহরে যে-কয়েকটা ফৌজী হাসপাতাল আছে সেখানেই সে গানের জলসার আয়োজন করবে। এইভাবে মনখারাপের ভাবটা কাটিয়ে উঠল সে। এমন কি এরপর একটু-একটু করে শহরটাকে ভালোও লাগতে লাগল তার, বিশেষ করে যখন শীত এসে বরফে ঢেকে দিল শহর, তখন। দিনগুলো তখন মিষ্টি-মিষ্টি ঠাণ্ডা আর কুয়াশায় শাদাটে হয়ে উঠল। নদীটার জলও অনেক দিন পর্যন্ত জমল না, সবজেটে জল থেকে কুয়াশা উঠতে থাকল খালি।

ছোট্ট শহরটায় আর অপরিচিত একজনের এই বাড়িটায় থাকায় ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠল তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না। বেসুরো-হয়ে-যাওয়া পিয়ানোটাতে আর দেয়ালের গায়ে আটকানো উপকূলরক্ষী নৌবহরের জ্যাবড়াজোবড়া সাঁজোয়া যুদ্ধজাহাজগুলোর হলদে-হয়ে-ওঠা পুরনো ছবিগুলোতেও ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠল সে। বৃদ্ধ পতাপভ একসময় জাহাজের মেকানিকের কাজ করতেন। তাঁর লেখার টেবিলে রঙ্‌চটা সবুজ পশমী কাপড়ের ওপর এখনও খাড়া-করা আছে যে-জাহাজে তিনি কাজ করতেন সেই ক্রুজার 'গ্রমবোই'এর একটা খেলনা-মডেল। মেয়ে ভারিয়াকে তাতে হাত দিতে

দেয় না তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না। সত্যি বলতে কী, এ-বাড়ির কোনো কিছুতেই হাত দেয়া ভারিয়ার বারণ।

তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না জানে যে পতাপভের একটি ছেলে আছে, নৌ-বাহিনীর এক অফিসর, যে নাকি এখন কৃষ্ণসাগরের নৌবহরে কাজ করছে। টেবিলের ওপর ক্রুজারের মডেলটার ঠিক পাশেই রাখা আছে এই ছেলেটির একখানা ছবি। কখনও-কখনও তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না ছবিখানা তুলে নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবতে থাকে। তার মনে হয় মুখটা যেন চেনা-চেনা, অনেক অনেক দিন আগে, এমন কি তার অসফল দাম্পত্য জীবন শুরু হওয়ার আগেই, কোথায় যেন দেখেছে সে এই মুখখানা। কিন্তু সে কোথায়? কখন সে? কে জানে!

আর জাহাজীও যেন ছবি থেকে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে — শান্ত, বিদ্রূপভরে অল্প-একটু কুঁচকে-থাকা চোখ মেলে। যেন ভর্ৎসনার সুরে বলতে চায়, 'কী ব্যাপার? মনে পড়ছে না কখন আমাদের দেখা হয়েছে?'

আর তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না খুব মৃদু গলায় জবাব দেয়, 'কই, না তো।'

তা-ই শুনে পাশের ঘর থেকে ভারিয়া চেঁচিয়ে বলে, 'কার সঙ্গে কথা বলচ তুমি, মা-মনি?'

'কার সঙ্গে আবার! পিয়ানোর সঙ্গে,' হাসতে-হাসতে জবাব দেয় তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না।

শীতের মাঝামাঝি থেকে পতাপভের নামে একই হাতের লেখায় একে-একে অনবরত চিঠি আসতে থাকে। তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না যত্ন করে চিঠিগুলো লেখার টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখে। একদিন রাত্রে আচমকা ঘুম ভেঙে গেল ওর। দেখল, জানলার বাইরেটা তুষারের মৃদু আলোর

আভায় উদ্ভাসিত। আর পতাপভের আমল থেকে রয়ে-যাওয়া পাঁশুটেরঙের হুলোবেড়াল আর্খিপ কৌচে বসে ঝিমোচ্ছে।

তাতিয়ানা পেত্রোভ্না ড্রেসিং গাউনখানা গায়ে চড়িয়ে পতাপভের পড়ার ঘরে গেল। তারপর গিয়ে দাঁড়াল জানলায়। একটা পাখি গাছ থেকে হঠাৎ উড়ে যাওয়ায় ডালের ওপর জমা বরফ খানিকটা খসে পড়ল, আর সূক্ষ্ম, শাদা তুষারের একমুঠো কণা হাওয়ায় ভেসে এসে ছড়িয়ে পড়ল জানলাটার গায়ে।

টেবিলের ওপরকার মোমবাতিটা জেবলে একখানা আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিল তাতিয়ানা পেত্রোভ্না। তারপর অনেকক্ষণ বাতির শিখাটার দিকে তাকিয়ে রইল। একটুও না-কেঁপে স্থির নিস্পন্দ হয়ে জবলছে আগুনের শিখাটা। হঠাৎ কী মনে করে সাবধানে একখানা চিঠি তুলে নিয়ে চিঠিখানা খুলল ও, তারপর একবার চারদিকটা দেখে নিয়ে সেখানা পড়তে শুরু করল।

দেখল চিঠিখানায় লেখা:

‘বাবামনি, মাসখানেক হয়ে গেল আমি হাসপাতালে। আমার আঘাতটা তেমন কিছু গুরুতর নয়, আর তা সেরেও উঠছে ঠিকমতো। দোহাই তোমার, এ নিয়ে যেন আবার চিন্তা করতে বোসো না আর সিগারেটের পর সিগারেট ধবংস কোরো না, লক্ষ্মিটি!

‘প্রায়ই তোমার কথা মনে পড়ে আমার,’ তাতিয়ানা পেত্রোভ্না পড়ে চলল। ‘আমাদের বাড়িখানা আর আমাদের ছোট্ট শহরটার কথাও বড্ড মনে পড়ে। এখান থেকে ওই সবকিছু কত-যে দূর বলে মনে হয় কী বলি! মনে হয় যেন

ওরা রয়েছে দুনিয়ার অপর কোনো প্রান্তে! চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাই, আমি যেন ফটকটা খুলে বাগানের মধ্যে ঢুকছি। সময়টা শীতকাল, মাটিতে বরফ জমে আছে, তবু নদীর পাড়ের ওপরকার লতাবিতান পর্যন্ত পায়েচলা পথটা সাফ করা হয়েছে। লাইল্যাক ফুলের ঝাড়গুলো সব বরফে ঢাকা। বাড়ির ভেতরে চুল্লিগুলোয় কাঠপোড়ার পটপট আওয়াজ উঠছে। হাওয়ায় বার্চকাঠ পোড়ার গন্ধ। বেসুরো পিয়ানোটাও অবশেষে সারানো হয়েছে আর তুমি বাতিদানগুলোয় লেনিনগ্রাদ থেকে আমার আনা হল্‌দে মোমবাতি ক'টা লাগিয়ে দিয়েছ। পিয়ানোর ওপর রাখা রয়েছে সেই একই ক'টা বাজনার স্বরলিপি: সেই 'ইস্কাপনের বিবি' গীতিনাট্যের মুখপাতের বাজনাটা আর 'আমার দূরদেশের সাগরপারের জন্যে' সেটাও...। আচ্ছা, আমাদের দরজার ঘণ্টিটা কী কাজ করছে? বাড়ি ছাড়ার আগে ওটা মেরামত করে দেয়ার সময় পাই নি। কিন্তু আমি কি সত্যিই এসব আবার দেখতে পাব? সত্যি কি কোনোদিন বাড়ি ফিরে আমাদের কুয়ো থেকে নীলরঙের সেই বালতিতে জল তুলে স্নান করতে পাব? আমার সেই স্নানের কথা মনে আছে তোমার? আহ্, যদি তুমি জানতে দূরে-দূরে থেকে ওই সবকিছুকে কী ভালোটাই-না বেসে ফেলেছি আমি! যুদ্ধের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলোতে এইসব কথাই মনে পড়ত আমার — আন্তরিকভাবেই একথা বলছি, অবাক হোয়ো না কিন্তু। আর তখন মনে হোত, আমি-যে শুধু নিজের দেশকেই রক্ষা করছি তা নয়, আমার প্রাণের প্রিয় দেশের সেই ছোট্ট কোণটিকেও রক্ষা করছি — যেখানে আছ তুমি, আছে আমাদের ওই বাগান, আমাদের গাঁয়ের খুদে দুষ্টু ছেলেরা, নদী পেরিয়ে সেই বার্চবনটা, এমন কি আমাদের হুলোবেড়াল

আর্খিপও। না-না, দোহাই তোমার, এটা পড়ে হেসো না কিন্তু, মাথা নেড়ো না আমার ছেলেমানুষি দেখে।

'হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর অল্প কয়েক দিনের ছুটিতে আমি হয়তো বাড়ি গেলেও যেতে পারি। তবে এখনও ঠিক বলতে পারছি না এটা সম্ভব হবে কিনা। আমি যাবই এটা যেন ধরে নিয়ো না।'

টেবিলের সামনে অনেকক্ষণ বসে রইল তাতিয়ানা পেত্রোভ্না, জানলার বাইরে যেখানে নীলাভ অন্ধকারে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ছে সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। ও ভাবছিল, এখন যে-কোনো দিন একজন অপরিচিত মানুষ যুদ্ধের ফ্রন্ট থেকে এখানে এসে হাজির হয়ে যাবে, আর অপরিচিত লোকজন বাড়িটাতে বাস করছে আর যেমনটি সে এসে দেখবে বলে আশা করছে সবকিছু তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরকম দেখে সে-দৃশ্য সহ্য করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।

পরদিন সকালবেলা তাতিয়ানা পেত্রোভ্না ভারিয়াকে বলল কাঠের একখানা বেলচা দিয়ে নদীর পাড়ের ওপরকার লতাবিতান পর্যন্ত পথটা থেকে বরফ সরিয়ে সাফ করে ফেলতে। লতাবিতানটা ভেঙে পড়ার মতো অবস্থায় পেঁছেছে। তার কাঠের তৈরি থামগুলোয় ছাতা পড়ে রঙ চটে গেছে। বাড়ির দরজার ঘণ্টিটা মেরামত করল তাতিয়ানা পেত্রোভ্না নিজেই। ঘণ্টিটার গায়ে ভারি মজার একটা বয়ান লেখা: 'আমি ঝুলছি দোরগোড়াতে, বাজাও আমায় সেই সুবাদে!' মেরামত করার পর ঘণ্টিটা বাজাল তাতিয়ানা পেত্রোভ্না। সঙ্গে সঙ্গে সজোরে টুংটাং করে বেজে উঠল সেটা। আওয়াজটা মনোমতো না-ঠেকায় আর্খিপ ঘনঘন

কান নাচাল কয়েকবার, তারপর এটাকে তার ওপর ব্যক্তিগত উৎপীড়ন বলে ধরে নিয়ে বাইরের ঘর ছেড়ে চলে গেল। ওর কাছে খুশিভরা টুংটাং আওয়াজটা ঠেকল স্পষ্টতই ঘোর দৌরাত্ম্যের সামিল বলে।

ওইদিনই বিকেলে তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না লাল হয়ে উঠে, হাঁপাতে-হাঁপাতে আর চোখে উত্তেজনার ঝিলিক হেনে ব্যস্তসমস্তভাবে শহর থেকে এক বুড়ো পিয়ানো-সারাইওয়ালাকে ধরে নিয়ে এল। রুশী-বনে-যাওয়া ওই চেকদেশী বুড়োর হাতে প্রাইমাস আর তেলের স্টোভ, পুতুল আর অ্যাকর্ডিয়ন সারানোর কাজ না থাকলে সে পিয়ানোরও সুর বেঁধে থাকে। কাজ শেষ হলে পর চেকদেশী লোকটি বলল যে পিয়ানোটা বহু পুরনো বটে তবে জিনিসটা খুব ভালো জাতের। পিয়ানোটা-যে ভালো জাতের তা তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না নিজেও জানত।

পিয়ানো-সারাইওয়ালা চলে যাওয়ার পর সে টেবিলের সবক'টা ড্রয়ার তন্নতন্ন করে খুঁজে অবশেষে মোটা-মোটা হল্‌দে মোমবাতির একটা প্যাকেট আবিষ্কার করল। তা থেকে গোটা-দুই মোমবাতি পিয়ানোর ওপরকার বাতিদানের দুই মাথায় লাগিয়ে দিল সে। তারপর সন্ধেবেলা মোমবাতি-দুটো জ্বালিয়ে পিয়ানোর সামনে বসল, আর দেখতে-দেখতে গোটা বাড়ি গমগম করে উঠল বাজনার আওয়াজে।

বাজানো শেষ হলে পর তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না মোমবাতি-দুটো ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল। আর এককালে ক্রিস্‌মাস উৎসবে ফার্‌গাছের সঙ্গে জড়িয়ে যে একরকমের একটা মিষ্টি ধূপের গন্ধ পাওয়া যেত তেমনই গন্ধে ভরে উঠল সব ক'খানা ঘর।

মায়ের ব্যাপারস্যাপার দেখে ভারিয়া আর চুপ করে থাকতে পারল না।

বলল, 'অন্যের জিনিসে হাত দিচ্ছ কেন বল দেখি? আমাকে কোনো জিনিস ছুঁতে দাও না তুমি, আর নিজে তো দিব্যি হাত দিচ্ছ সবতাতে! তার বেলা? দরজার ঘণ্টি, মোমবাতি, পিয়ানো, সবকিছু ছুঁচ্চ তুমি। অন্যের বাজনার কাগজ পর্যন্ত পিয়ানোর ওপর রেখেচ।'

'আমি বড় হয়েছি কিনা, তাই,' বলল তাতিয়ানা পেত্রোভ্না।

ঠোঁট উল্‌টিয়ে অবিশ্বাসভরে মায়ের দিকে তাকাল ভারিয়া। ঠিক সেই মুহূর্তে তাতিয়ানা পেত্রোভ্নাকে মোটেই বড়দের মতো দেখতে লাগছিল না। গোটা মুখখানা গোলাপি আর ঝলমলে হয়ে উঠেছে তার, তাকে দেখতে লাগছে অনেকটা সোনালি চুলওয়ালা সেই ছোট্ট মেয়েটির মতো যে রাজপ্রাসাদে গিয়ে পায়ের একপাটি কাচের চটিজুতো হারিয়েছিল। তাতিয়ানা পেত্রোভ্না নিজেই ভারিয়াকে ওই মেয়েটির গল্প শুনিয়েছে।

লেফ্‌টেন্যান্ট পতাপভ ট্রেনে আসার সময়েই হিসেব করে দেখল যে বাড়িতে সে সর্বসাকুল্যে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি থাকতে পারবে না। একে তো তার ছুটি খুবই অল্পদিনের, তার ওপর ট্রেনে এই আসা-যাওয়াতেই কেটে যাবে প্রায় সবটুকু সময়।

শহরটাতে ট্রেন এসে পেঁছিল বিকেলে। স্টেশনেই পুরনো-পরিচিত স্টেশনমাস্টারের কাছে লেফ্‌টেন্যান্ট শুনল যে তার বাবা মাসখানেক আগে মারা গেছেন আর মস্কো থেকে এক

যুবতী গায়িকা তার মেয়ে নিয়ে ওদের বাড়িটাতে বাস করছে এখন।

'উদ্বাস্তু আর-কি,' স্টেশনমাস্টার মন্তব্য করল।

আগাগোড়া কোনো কথা বলল না পতাপভ। সে কেবল তাকিয়ে ছিল জানলা দিয়ে বাইরে প্ল্যাটফর্মের দিকে, যেখানে তুলোভরা কোট আর ফেল্টের বুট পরে ট্রেনের যাত্রীর দল চায়ের কেটলি-হাতে প্ল্যাটফর্মের এদিক-ওদিক দৌড়ে বেড়াচ্ছিল। কেমন মুষড়ে পড়ল পতাপভ, মাথাটা ঘুরে উঠল ওর।

স্টেশনমাস্টার সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আহা, বড্ড ভালো নোক ছেলেন গো! ছেলের বাড়ি আসা আর দেখে যেতে পারলেন না।'

'ফেরার ট্রেন কখন পাওয়া যাবে?' পতাপভ শুধোল।

'কাল ভোর পাঁচটায়।' একটু থেমে স্টেশনমাস্টার ফের বলল, 'তা, আপনি আজ রাতটা আমার ওখেনেই কাটাতে পারেন। গিন্নি আপনেরে রাতের খাওয়া দেবে'খন। বাড়ি যাওয়ার আর দরকার কী আপনের?'

'ধন্যবাদ,' পতাপভ বলল। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ওর চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে সহানুভূতিতে মাথা নাড়ল স্টেশনমাস্টার।

নরম পাঁশুটে মেঘে-ঢাকা আকাশের নিচে শহরের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে নদীর ধারে চলে এল পতাপভ। আকাশ আর মাটির মধ্যে তেরছা হয়ে ঝরে পড়ছে হালকা ফিস্‌ফিসে তুষার। রাস্তায় ঘোড়ার নাদের আশপাশে লাফিয়ে-লাফিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে দাঁড়কাকগুলো। গোধূলির আবছায়া গাঢ় হয়ে আসছে। নদীর অপর পারের জঙ্গল থেকে হঠাৎ একটা হাওয়া উঠে ঝাপটা দিয়ে ওর চোখে জল এনে ফেলল।

'হুম, বড্ড বেশি দেরি করে ফেলেছি,' পতাপভ নিজের মনে বলল। 'তবে এখন আর এখানকার কেউ নই আমি — এই শহর, এই নদী, এই বন, এই বাড়ি, এসব কিছুই নয় আমার।'

ফিরে দাঁড়িয়ে নদীর ওপর ঝুঁকে-পড়া দূরের টিলাটার দিকে তাকাল ও। ওইখানেই আছে স্মৃতিভারে জড়িয়ে ওর চিরচেনা সেই তুষারে-মোড়া বাগান, সেই বাড়ি। বাড়িটার চিমনি থেকে পাকিয়ে-পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। বাতাস সেই ধোঁয়া বয়ে নিয়ে যাচ্ছে নদীর ওপারে বার্চবনটার দিকে।

পতাপভ বাড়ির পথে পায়ে-পায়ে হেঁটে চলল। ও ঠিক করল বাড়ির ভেতর ঢুকবে না, কেবল পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যাবে, কিংবা হয়তো বাগানের মধ্যে ঢুকবে একটু, তারপর একমুহূর্তের জন্যে পুরনো লতাবিতানে দাঁড়াবে। সম্পূর্ণ অপরিচিত কয়েকজন লোক, ওর আর ওর বাবার জন্যে যাদের কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই এমন কয়েকজন যে ওর বাবার বাড়িতে থাকছে এই চিন্তাটাই কেমন অসহ্য ঠেকছিল। কাজেই ও-বাড়িতে গিয়ে নিজের চোখে কিছু না-দেখাই ভালো, শুধু-শুধু নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী! তার চেয়ে বরং এ-জায়গাটা ছেড়ে চলে যাওয়া, অতীতকে মুছে ফেলা মন থেকে অনেক ভালো।

'সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বয়স বাড়ে তেমনি বাস্তবের পোড়-খাওয়া চোখে চারপাশটা দেখতে শেখাও দরকার।'

গোধূলির ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারে বাড়িতে এসে পৌঁছল সে। সাবধানে বাগানের ফটকটা খুলল, তবু ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠল একটা। মনে হল তুষার-শাদা বাগানটা যেন চমকে

উঠল হঠাৎ। সর্‌সর শব্দ করে একটা ডাল থেকে খানিকটা জমা বরফ ঝরে পড়ল। পিছু ফিরে দেখল পতাপভ। লতাবিতানের পথটা পরিষ্কার, বরফ নেই। লতাবিতানে পেঁছে নড়বড়ে রেলিঙটার ওপর হাত রাখল ও। দূরে, বনের ওপারে আকাশটা লালচে হয়ে উঠেছে—মেঘের আড়ালে চাঁদ উঠছে নিশ্চয়ই। টুপিটা খুলে মাথার চুলে একবার হাত বোলাল ও। চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। একমাত্র নিচে টিলার গোড়ায় জলের জন্যে বরফ-খোঁড়া গর্তের কাছে যেতে গিয়ে গাঁয়ের মেয়েরা তাদের খালি বালতির ঝনঝন আওয়াজ তুলছে।

রেলিঙে দুই কনুইয়ের ভর দিয়ে দাঁড়াল পতাপভ, তারপর দুই হাতের তেলোয় নিজের মাথাটা চেপে ধরল।

ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'নাঃ, কিছুতেই এটা মেনে নেয়া যাচ্ছে না।'

এমন সময় কাঁধের ওপর হালকা একটা হাতের ছোঁয়া অনুভব করল ও। মুখ ফিরিয়ে দেখল, একটি যুবতী মেয়ে ফ্যাকাশে, গম্ভীর মুখ নিয়ে আর মাথায় মোটা একটা রুমাল জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কালো দুটো চোখ মেলে মনোযোগী দৃষ্টিতে ওকে দেখছে সে। তার গালে আর চোখের পাতায় গুঁড়ো বরফ গলছে তখন — নিশ্চয়ই কোনো গাছের ডাল থেকে নাড়া খেয়ে বরফ পড়েছে মুখেচোখে।

'টুপিটা মাথায় পরুন,' ফিস্‌ফিস করে বলল মেয়েটি। 'নইলে ঠাণ্ডা লাগতে পারে। আর বাড়ির ভেতর আসুন-না। বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়ানো ঠিক নয়।'

পতাপভ কোনো কথা বলতে পারল না। মেয়েটি ওর জামার হাতা ধরে ওকে বাড়িতে নিয়ে এল, বরফ-সাফ-করা রাস্তা ধরে। বাড়ির সামনের সিঁড়ির বারান্দায় এসে পতাপভ

থামল। গলায় হঠাৎ একটা দলা উঠে এল বলে মনে হল ওর, মনে হল দম ফেলতে পারছে না। মেয়েটি ফের একই রকম নরম ফিস্‌ফিসে গলায় বলল:

'ও কিছু না। আমার দিকে নজর দেবেন না, ধরে নিন আমি নেই। এ-ভাবটা আপনার এখুনি কেটে যাবে।'

বুটজোড়া থেকে বরফের গুঁড়ো ছাড়ানোর জন্যে পা ঝাড়া দিল মেয়েটি, আর সেই মুহূর্তে দরজার ছোট্ট ঘণ্টিটা বেজে উঠল বাড়ির বাইরের ঘর জুড়ে টুংটাং আওয়াজে। বুক ভরে গভীর একটা নিশ্বাস টানল পতাপভ।

অস্বস্তিতে কী-একটা যেন বিড়বিড় করে বকতে-বকতে বাড়িতে ঢুকল ও। তারপর বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে গায়ের ওভারকোটখানা খুলে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে পোড়া বার্চকাঠের ধোঁয়ার গন্ধ নাকে এল ওর। দেখল, আর্‌খিপ কৌচে বসে হাই তুলছে। আর কৌচের কাছেই চুলের বিনুনি দুলিয়ে বাচ্চা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খুশিভরা চোখে পতাপভকে দেখছে। অবশ্য ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নেই মেয়েটি, সে দেখছে ওর জামার হাতায়-লাগানো পদমর্যাদাজ্ঞাপক সোনালি জরির ফিতেগুলোকে।

'আসুন, ভেতরে আসুন,' তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না বলল। পতাপভকে সে নিয়ে গেল রান্নাঘরে।

পতাপভ দেখল, রান্নাঘরে সেই নীল বালতিতে ঠাণ্ডা জল ভরা রয়েছে আর রয়েছে ওকপাতার এমব্রয়ডারি নকশা-করা তার পরিচিত একখানা সুতীর তোয়ালে।

ঘরের বাইরে চলে গেল তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না। এরপর বাচ্চা মেয়েটি একখানা সাবান নিয়ে ঘরে ঢুকল আর ওর হাতমুখ ধোওয়া দেখতে লাগল। তখনও পতাপভের সেই সংকোচের ভাবটা কাটছে না।

অল্প-একটু লাল হয়ে উঠে মেয়েটিকে সে শুধোল, 'তোমার মা করেন কী?'

নেহাত কিছু বলতে হয় বলেই প্রশ্নটা করল সে।

'মা-মনি না ভাবে, মা-মনি খুব বড় হয়েচে,' যেন একটা রহস্য ফাঁস করে দিচ্ছে এমনভাবে ফিস্‌ফিস করে বলল মেয়েটি। 'কিন্তু মোট্টেও বড় হয় নি, বুঝেচ। মা-মনি আমার চেয়েও বাচ্চা আচে।'

'কেন বল তো?' শুধোল পতাপভ।

মেয়েটি এর কোনো জবাব দিল না। শুধু হেসে উঠে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সারাটা সন্ধে পতাপভ কিছুতেই মন থেকে এই অদ্ভুত একটা অনুভব ঝেড়ে ফেলতে পারল না যে সে সূক্ষ্ম অথচ অত্যন্ত গভীর একটা স্বপ্নের মধ্যে আছে। বাড়িতে ফিরে যা-কিছু সে দেখবে বলে আশা করেছিল, কেমন করে যেন সবকিছু আছে ঠিক তেমনি অবস্থায়। সেই এক বাজনার স্বরলিপি পিয়ানোর ওপর সাজানো। বাবার ছোট্ট পড়ার ঘরখানা আলো করে রেখেছে সেই এক হল্‌দে মোমবাতির কাঁপা-কাঁপা দুটো শিখা। এমন কি হাসপাতাল থেকে বাবাকে লেখা তার চিঠিগুলো পর্যন্ত সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা আছে টেবিলে — তার বাবা চিঠিপত্র সর্বদা যেখানে গুছিয়ে রাখতেন ঠিক সেইখানটায়, সেই এক পুরনো কম্পাসটা চাপা দিয়ে।

চা খাওয়ার পর তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না পতাপভকে নিয়ে গেল বার্চবনটার ওধারে, তার বাবার কবর দেখাতে। হালকা মেঘে-মোড়া অস্পষ্ট চাঁদ উঠে এসেছে আকাশের অনেক উঁচুতে। বার্চগাছগুলো ঝকমক করছে চাঁদের আলোয়, মাটিতে বরফের ওপর তাদের হালকা ছায়া পড়েছে।

পরে, আরেকটু রাতে, তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না পিয়ানো বাজাতে বসল। পিয়ানোর চাবির ওপর দিয়ে হালকা হাতে আঙুল চালাতে-চালাতে হঠাৎ একসময় পতাপভের দিকে ফিরে বলল:

'আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি।'

'আমারও অমন মনে হচ্ছে কিন্তু,' জবাব দিল পতাপভ।

তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌নার দিকে ঠাহর করে এক-নজর তাকাল সে। মোমবাতির আলো তেরছাভাবে পড়ে ওর মুখের অর্ধেকটা আলোকিত করে তুলেছে। পতাপভ উঠে দাঁড়াল, ঘরের মধ্যে পায়চারি করল একটুক্ষণ, তারপর ফের দাঁড়িয়ে গেল।

'নাঃ, কিছুতেই মনে পড়ছে না,' ধরা-ধরা গলায় বলল সে।

শুনে পতাপভের দিকে সচকিতভাবে এক-নজর তাকাল তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না, কিন্তু কিছু বলল না।

পড়ার ঘরে কৌচের ওপর পতাপভের শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছিল না তার। এ-বাড়িতে প্রতিটি মিনিট তার কাছে মূল্যবান ছিল, ঘুমিয়ে একটা মিনিটও নষ্ট করতে মন উঠছিল না তার।

শুয়ে-শুয়ে সে শুনছিল আর্‌খিপের চুপিসারে চলাফেরার শব্দ, দেয়ালঘড়ির টিকটিক আওয়াজ, পাশের ঘরে আয়ার সঙ্গে তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌নার কথাবার্তার ফিস্‌ফিসানি। কথাবার্তা এরপর থেমে গেল একসময়, আয়াও বাইরে চলে গেল, তবু দরজার নিচের ফাঁক দিয়ে এসে-পড়া আলোর রেখাটুকু গেল রয়ে। কাগজ ওল্‌টানোর খসখস শব্দ কানে এল পতাপভের। তার মানে, তাতিয়ানা পেত্রোভ্‌না বই

পড়ছেন। ওর মনে হল, তিনি বোধহয় জেগে আছেন পরদিন ভোরে ট্রেনের জন্যে সময়মতো যাতে ওকে ঘুম থেকে তুলে দিতে পারেন সেইজন্যে। ইচ্ছে হল বলে যে এর দরকার নেই কেননা ও মোটেই ঘুমোচ্ছে না, কিন্তু মহিলাকে ডাকতে ভরসা পেল না ও।

ভোর ঠিক চারটের সময় তাতিয়ানা পেত্রোভ্না নিঃশব্দে দরজা খুলে পতাপভকে ডাকল। নড়ে উঠে জেগে ওঠার জানান দিল পতাপভ।

তাতিয়ানা পেত্রোভ্না বলল, 'ওঠার সময় হয়েছে কিন্তু। যদিও এত ভোরে আপনাকে ঘুম থেকে তুলতে ভারি কষ্ট হচ্ছে, তবু।'

ঘুমন্ত শহর পার হয়ে পতাপভকে স্টেশনে পৌঁছে দিল তাতিয়ানা পেত্রোভ্না। ট্রেন ছাড়বার দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ার পর পরস্পরকে বিদায় জানাল ওরা। পতাপভের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দিল তাতিয়ানা পেত্রোভ্না।

বলল, 'চিঠি দেবেন কিন্তু। আমরা প্রায় আত্মীয়ই বনে গেছি, তাই না?'

কোনো কথা বলল না পতাপভ, কেবল ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

এর কয়েক দিন পরে তাতিয়ানা পেত্রোভ্না পতাপভের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেল — ফেরার পথে ট্রেন থেকে লেখা:

'আমি অবশ্য ভুলি নি কোথায় আমাদের দেখা হয়েছিল, তবে তখন বাড়িতে বসে এ-নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে হয় নি। আচ্ছা, আপনার মনে পড়ে ১৯২৭ সালের সেই হেমন্তে ক্রিমিয়ার কথা? আর লিভাদিয়ার বাগানে আদ্যিকালের

সেই প্লেনগাছগ্মলোকে? আকাশে সেদিন অন্ধকার মেঘের ঘনঘটা, সম্দ্র বিবর্ণ, ফ্যাকাশে। বাগানের পথ ধরে আমি হে'টে চলেছিলাম ওরিয়ান্দার দিকে। পথে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা, মেয়েটি বসে ছিল পথের ধারের এক বেঞ্চিতে। মেয়েটির বয়স বছর ষোলো হবে। ও আমায় দেখতে পেয়েছিল, উঠে পড়ে আমার দিকেই আসতে লাগল ও। যখন আমরা পাশাপাশি এসে পড়লাম, আড়চোখে আমি একবার মেয়েটিকে দেখে নিলাম। ও কিন্তু দ্রুত, হালকা চালে একখানা বই হাতে খ্মলে ধরে আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। মেয়েটি চলে যেতে আমি থেমে পেছন ফিরে অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল্মম। সেই ষোড়শী মেয়েই হচ্ছেন আজকের আপনি। এ আমার ভুল হতে পারে না। সেদিন পেছন থেকে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ আমার কেমন মনে হয়েছিল, যে-মেয়ে আমার গোটা জীবন ব্যর্থ করে দিতে কিংবা অপরিমেয় স্মখাবেশে ভরে দিতে পারে সে-ই চলে গেল আমার পাশ দিয়ে। মনে হয়েছিল, এ-ই সেই মেয়ে যাকে আমি পাগলের মতো ভালোবাসতে পারি। তখনই, ওইখানে দাঁড়িয়ে আমি ভেবেছি, যে করে হোক খ্মঁজে বের করবই আপনাকে। হ্যাঁ, ওখানে দাঁড়িয়েই আমি একথা ভেবেছি, তব্ম কিন্তু জায়গা ছেড়ে এক-পা নড়ি নি। কেন — তা বলতে পারব না। তার পর থেকে ক্রিমিয়া আর সেখানকার সেই পথটা — যেখানে এক-ম্মহ্মর্তের জন্যে আপনাকে দেখেছি আর তারপর চিরকালের মতো হারিয়েছি — তাদের আমি প্রেমে পড়ে গেছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে জীবন আমার প্রতি সদয়। ফের আমি আপনার দেখা পেলাম। আর যদি এরপর সবকিছ্ম ভালোয়-ভালোয় উতরে যায় আর আমার জীবন যদি আপনার কাম্য হয়, তাহলে

অবশ্যই জানবেন তা একান্ত আপনারই। হ্যাঁ, ভালো কথা। বাবার টেবিলে-রাখা আমার লেখা খোলা চিঠিখানা নজরে পড়েছে আমার। ফলে সবকিছু বুঝতে পেরেছি, সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে, আর এজন্যে দূর থেকে আপনাকে শুধু ধন্যবাদ জানাতে পারি।'

চিঠিখানা সরিয়ে রেখে তাতিয়ানা পেত্রোভ্না জলভরা চোখে তাকিয়ে রইল জানলার বাইরে, বরফে-ঢাকা বাগানটার দিকে।

'হায় রে,' ফিস্‌ফিস করে বলল সে। 'আমি-যে জীবনে কোনোদিন ক্রিমিয়ায় যাই নি! কোনোদিনই না! সেকথা বলি কাকে! কিন্তু এখন কি তাতে কিছু এসে-যায়? তাছাড়া ওঁকে ভুল শুধরে দিয়ে লাভ কী? নিজের ভুল ভাঙিয়েও কি লাভ আছে কিছু?'

বলে নিজের মনেই হেসে উঠল তাতিয়ানা পেত্রোভ্না, তারপর হাত দিয়ে চোখদুটো ঢাকল। জানলা দিয়ে সূর্যাস্তের ক্ষীণ রক্তাভার মোলায়েম দ্যুতি দেখা গেল, আর কেন যেন মুছে না-গিয়ে আভাটা অনেকক্ষণ লেগে রইল আকাশে।

১৯৪৩

কাচপুঁতির মালা

যেখানেই যাই চাষীর ঘরের ভোরবেলাটা অনেকটা একই রকম ঠেকে। তা সে আমি যে-অঞ্চলের লোক সেই কস্ত্রোমা শহরের কাছের এলাকাই হোক, ইউক্রেন হোক, কিংবা কার্পেথীয় পর্বতমালার পায়ের কাছের ছোট্ট গাঁ গুত্সুলই হোক। সর্বত্রই পাওয়া যাবে রুটির টকটক গন্ধ, বুড়ো মানুষের ফোঁসফোঁস নিশ্বাস ফেলার শব্দ, বার-বারান্দায় আধ-জাগন্ত মুরগিদের কোঁকরকোঁকর ডাক আর দেয়ালে ঘড়ির দ্রুত টিকটিক।

তারপর বাইরে কালো অন্ধকার নীলচে রঙ্ ধরতে শুরু করবে, আর ঝাপসা-হয়ে-থাকা জানলার কাচের ভেতর দিয়ে আবছা দেখা যাবে বাইরে বসন্তের স্বল্প হিম আর ঘাসের ওপর পড়ে-থাকা শিশির, আর তা থেকে বোঝা যাবে যে দিনটা নির্মেঘ, পরিষ্কার থাকবে। এরপর ফিকে অন্ধকারে ঘরের মধ্যে ক্রমশ চোখে ধরা পড়বে দরজার মাথায় লটকানো ঝুলকালিমাখা ক্রুশকাঠ, টুলের ওপর রাখা ভেড়ার চামড়ার হাতকাটা জ্যাকেট ও তার ওপর চাপানো রঙ্চটা ফেল্টের টুপিটা। আর তখনই মনে পড়ে যায় যে আমি কস্ত্রোমার কাছে আমার দেশে-গাঁয়ে নেই, আছি সোভিয়েত ইউনিয়নের

সবথেকে পশ্চিম সীমান্তে গ্রুত্সুল-অঞ্চলে। আর জানলা দিয়ে ওই-যে দূরে নীল-নীল মেঘগুলো দেখা যাচ্ছে ওগুলো মেঘ নয় মোটেই। ওগুলো হল কার্পেথীয় পর্বতমালার একটা অংশ। আর ওই দূরে বন আর কুয়াশা ছাড়িয়ে পাহাড়ের মধ্যে থেকে শোনা যাচ্ছে একটানা কামানের গর্জন। যুদ্ধের আরেকটা দিন শুরু হচ্ছে।

উঠোনে বেরিয়ে হাতমুখ ধুতে যাই। ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টায় মাথাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে যায় আর গতকাল যা-কিছু ঘটেছে ছবির মতো সব মনে পড়ে যায় ফের।

বাড়িটার সামনের ফাঁকা জায়গাটায় এত ডেইজিফুল ফুটে আছে যে সৈন্যদের তা মাড়িয়ে যেতে অস্বস্তি বোধ হয়। ফুলগুলো এড়িয়ে ফাঁকা জায়গাটার একধার ঘেঁষে চলে তারা। জায়গাটায় একটামাত্র বন-গোলাপের ঝাড়ে ফুল এসেছে। দিনের বেলার গর্মির চেয়ে ভোরবেলাকার ঠাণ্ডায় গোলাপের গন্ধটা বেশি জোরালো হয়ে ওঠে। সূর্য এখনও পাহাড়ের ওধারে আছে, তবে পাহাড়ের পশ্চিমের ঢালুতে গাছের মাথাগুলো ভোরের রোদ পড়ে এরিমধ্যে উজ্জ্বল পিঙ্গল রঙ ধরেছে।

চাষীর কুঁড়েঘরখানা হল ইগ্নাত আর তার নাত্নি গানিয়ার। ইগ্নাতের বয়স হয়েছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। ও ছিল কাঠুরে, কিন্তু আজ একবছর হয়ে গেল ভারি কুড়ুলখানা চালাবার সামর্থ্য নেই। ও বলে, 'ভগমানরে ধন্যি মানি যে রুশী কামান দেইখ্যা দেহে ক্রুশচিহ্ন আঁকার সামথ রয়ে গেছে এখনও।' এমন কি গির্জে পর্যন্ত হেঁটে যাওয়াও ওর পক্ষে কষ্টকর। তাই গানিয়া ওকে ধরে-ধরে নিয়ে যায়। নীলরঙের কাগজের ফুল-দিয়ে-সাজানো বেদীর সামনে হাঁটু ভেঙে বসে ও। আর শাদা ঝাঁকড়া চুলে-ভরা মাথাটা নেড়ে-

নেড়ে ফিস্‌ফিস করে ও তখন ধন্যবাদ জানাতে থাকে দু'বেলা খাওয়া জোটার জন্যে, জঘন্য সোয়েবীয়দের কবল থেকে দেশটা মুক্তি পেয়েছে বলে আর নিজের দেশে বেঁচেবর্তে থেকে আরও একটা বসন্ত চোখে দেখতে পাওয়ার আনন্দে।

আহ্‌, কী চমৎকার এই দেশটা! হালকা কুয়াশায় মুড়ি-দেয়া দেশটা! মনে হয় এই কুয়াশা যেন বসন্তের সদ্য-গজানো নতুন ঘাস, ফুল আর পাতা, চষা মাটি আর সবুজ অঙ্কুরের নিশ্বাস থেকে উঠে ছড়িয়ে পড়ছে গড়ানে পাহাড়গুলোর মাথার ওপর।

জলের ওপর ছপছপ করে এসে-পড়া ময়দাকলের চাকাগুলো পাড়ের ওপরকার কালো-কালো উইলোগাছে জল ছিটচ্ছে আর সেই জলের ফোয়ারায় ঝলমল করছে ছোট-ছোট যতসব রামধনু।

একেকসারি পাহাড়ের পেছনেই দেখা যাচ্ছে আরেকসারি করে পাহাড়। দিগন্তের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত পর্যন্ত সবুজের আর আলোর ঢেউ উথলে-উথলে উঠছে যেন। আকাশটা এতই নির্মল নীল আর নিটোল ঠেকছে যে তাকে পুরনো নামে নভ বলে ডাকা ছাড়া উপায় থাকছে না। পুরো হলুদ রঙ ধরেছে সূর্য়। প্রতিবার নিশ্বাস নেয়ার সঙ্গে বুক ভরে উঠছে পাইনের বাকল আর এখনও পর্যন্ত পাহাড়ের চুড়োগুলোয় লেগে-থাকা ছিটেফোঁটা তুষারের চন্‌মনে মিশ্র গন্ধে।

মাত্র গতকালই আমরা এই গ্রামখানা দখল করেছি। কেবলমাত্র বুড়ি-হাবড়ি, বাচ্চা ছেলেমেয়ে আর কিছু থুত্থুড়ে বুড়ো ছাড়া গাঁয়ে মানুষ বলতে কেউ নেই। গাঁয়ের বাকি লোকজন জার্মানদের হাত এড়াতে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল,

এখনও সেখানেই আছে তারা। জার্মানরাও খুব বেশি দূরে নেই, পাহাড়ি খাদটার ওপারে এদিককার একমাত্র পাহাড়ি রাস্তাটার দিকে তাক করে হানা দিয়ে আছে। আমাদের এখন দরকার এমন একজন পথ-প্রদর্শকের যে নাকি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে জার্মানদের ওই ঘাঁটির ওপর দিকে চেশ্‌স্কে লোনো নামের পাহাড়চুড়োটায়। ওটাই হল একমাত্র জায়গা যেখান থেকে হানা দিয়ে জার্মানদের হটিয়ে রাস্তাটা পরিষ্কার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব।

হরি, হরি! শক্তসমর্থ জোয়ান পথ-প্রদর্শকের বদলে গাঁয়ের লোকে দশ-বছুরে একটি মেয়েকে এনে হাজির করল আমাদের লেফ্‌টেন্যান্টের সামনে। মেয়েটির পরনে ছিল নতুন একজোড়া চামড়ার মোকাসিন জুতো, শাদা পাড়-বসানো গাঢ় তামাটেরঙের লম্বা একটা স্কার্ট, একগাদা ঝিনুকের বোতাম-বসানো হাতকাটা হলুদরঙের একটা জ্যাকেট আর মাথায় বাঁধা সিল্‌কের একখানা স্কার্ফ। খুদে মেয়েটি উৎসবের পোশাকে সেজে এসে লেফ্‌টেন্যান্টের সামনে চোখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল আর হাত দিয়ে নীল এপ্রনের প্রান্তটা মোচড়াতে লাগল।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে লেফ্‌টেন্যান্ট শুধোলেন, ‘এর চেয়ে বড়সড় কাউকে দিতে পারলেন না?’

কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা কয়েকজন বৃদ্ধ কথাটা শুনে নিজেদের মধ্যে তাকাতাকি করলেন, ফেল্টের টুপিগুলো খুলে মাথা চুলকোলেন একবার, তারপর জানালেন যে মেয়েটি হল এ-তল্লাটের সবচেয়ে নামজাদা শিকারি আর কাঠুরে বুড়ো ইগ্‌নাতের নাত্‌নি, আর লজ্জার কথা বলতে কী, চেশ্‌স্কে লোনোতে পেঁছনোর পথ এই মেয়েটির চেয়ে ভালো আর কারও জানা নেই। ইগ্‌নাত অবিশ্যি নিজে পথটা চেনে, তবে

কিনা ইদানীং সে বড়ই দুর্বল হয়ে পড়েছে আর বছরখানেক ওই পাহাড়-অঞ্চলে একেবারেই যায় নি।

শুনে সন্দেহভরে মাথা নাড়লেন লেফ্‌টেন্যান্ট। বললেন:

'পারবে তুমি সেখানে নিয়ে যেতে আমাদের? পথটা সত্যিই চেনো তো?'

'হ্যাঁ, চিনি,' লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে-উঠতে মেয়েটি জবাব দিল।

'কাকপক্ষীও টের পাবে না এমনভাবে পারবে?'

'না, টের পাবে না,' আরও লাল হয়ে উঠে বলল মেয়েটি।

'তোমার ভয় করছে না?' লেফ্‌টেন্যান্ট কড়া সুরে শুধোলেন এবার।

তাঁর দলের লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল চারপাশে। ভুরু কুঁচকে উঠেছিল তাদের। এ আবার কেমনধারা পথ-প্রদর্শক? ওর কথাবার্তাও বেশ ভারিক্কি বলে বোধ হচ্ছে না।

লেফ্‌টেন্যান্টের শেষ প্রশ্নের জবাব দিল না মেয়েটি। তার বদলে মুখ তুলে বড়-বড় পাঁশুটে চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল, তারপর চোখ নিচু করে ফেলল আবার। নিজের অজান্তে লেফ্‌টেন্যান্টের মুখেও হাসি ফুটে উঠল, তারপর হেসে ফেলল সৈন্যরাও। অমন কালো-কালো চোখের পাতার নিচে লজ্জামাখানো এমন সুখের হাসি যে ফুটে উঠতে পারে, এটা যেন কেউ আশা করে নি।

সবাই চুপ করে রইল। এই নৈঃশব্দ্য ভাঙল হঠাৎ 'হেই, হতচ্ছাড়ি গান্‌কা!' বলে একটা চিৎকারের আওয়াজে। ঝাঁকড়াচুলো, চঞ্চল চোখ একটি ছেলে ডালপালার বেড়ার মোড়ের ওধার থেকে ঈর্ষাতুর দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখছিল এতক্ষণ। সে-ই ডেকে উঠেছিল। ডাক শুনে মেয়েটি ভুরু কোঁচকাল, সৈন্যরাও ফিরে তাকাল ছেলেটির দিকে আর

ছেলেটি অদৃশ্য হয়ে গেল। উপস্থিত বৃদ্ধরাও মাথা নাড়লেন। সত্যিই তো, ব্যাপারটা ছেলেটির ঈর্ষা করার মতো ছিল বৈকি।

বাচ্চা মেয়েটি সৈন্যদের পথ দেখিয়ে চেশ্স্কে লোনোতে নিয়ে গেল এরপর, রাস্তাটা থেকে জার্মানদের তাড়িয়ে দেয়া গেল। সন্ধেবেলায় গাঁয়ে ফিরে এল মেয়েটি, আর তার সঙ্গে এল যুদ্ধে আহত এক সৈনিক, নাম মালেয়েভ। সৈনিক ছেলেটি যেমন ভালো তেমনই সাহসী, কেবল তার দোষত্রুটি খুঁটিয়ে দেখলে একটিমাত্র সমালোচনা যা করা চলে তা হল এই যে ছেলেটির একটু বেশি বকবক করার দিকে ঝোঁক।

ওইদিনই সন্ধেয় ইগ্নাতের বাড়ির কাছে একখানা পাথরে বসে ব্যান্ডেজ-করা ডান হাতখানা গলায় ঝুলিয়ে রেখে ছেলেটি দুধ খাচ্ছিল আর গল্প জুড়েছিল উপস্থিত বৃদ্ধদের সঙ্গে। সম্ভ্রম আর স্নেহের ভাব নিয়ে ছেলেটির কথা শুনে যাচ্ছিলেন তাঁরা, তবে ওর কথা খুব-যে একটা বুঝতে পারছিলেন তা নয়। মালেয়েভ ছিল রিয়াজানের লোক, গুত্সুলের বুড়ো বাসিন্দাদের পক্ষে ওর কথার মাথামুণ্ডু বোঝা কঠিন ছিল।

'আমাদের বড়কত্তারা মেয়েটারে এর জন্যে পুরস্কার দেবেন। নিশ্চিত্ দেবেন! কেনে? না, মেয়েটা এমন বিচক্ষণ আর সাহসী বলে। সাহসের জন্যে কেমনে পুরস্কার দিতে হয় তা আমাদের ভালোই জানা আচে। কাজেই, নাগরিকগণ, এ-ব্যাপারে আপনেদের কোনো সন্দেহ থাকার কারণ নাই।'

শুনে বৃদ্ধরা সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন আর হাসলেন।

'কিন্তু বড়কত্তাদের কথা বাদ দিলেও,' মালেয়েভ বলে চলল, 'আমাদের ছোঁড়াগুলাও মেয়েটার কাচে কম কৃতজ্ঞ

লয়। ওয়ার সুখ্যাতি তাদের মুখে আর ধরে না। আর যা উব্‌গার করেচে ও তাতে ছোঁড়াদের কাচ থেকে ওয়ার কিছু লভ্য হওয়া উচিত। কিন্তু মুশকিলটে কী জানেন? ফৌজের নোক শুধু নোয়ার কৌটোয় র‍্যাশন আর কার্তুজ ছাড়া আর কিছু তো সাথে লিয়ে ঘোরে না। আপনেরা তো ভালোই জানেন একথা। কিন্তু মেয়েটারে এট্টা কিছু উপহার দেয়া উচিত, পুতুল কিংবা অমনিধারা এট্টা কিছু।'

সৈনিক-জীবনের এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে যতক্ষণ বক্তৃতা দিচ্ছিল মালেয়েভ, ততক্ষণ ও বিভ্রান্ত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে খালি-খালি চোখ টিপছিল আর পকেটে হাত পুরে ঠুনঠুন করে কী-একটা যেন বাজিয়ে চলছিল। কিন্তু কেউই তার এইসব সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বুঝতে পারছিল না।

আসলে মালেয়েভ পকেটের একটা স্বচ্ছ কাচের পুঁতির মালা কচলে-কচলে আওয়াজ করছিল। মালাটা ওকে লেফ্‌টেন্যান্ট দিয়েছিলেন, বলেছিলেন পরদিন সকালে গানিয়াকে মালাটা উপহার দিতে। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে উপহারটা একটা চমক সৃষ্টি করে দিতে। অর্থাৎ, পকেট থেকে মালাটা হুট করে টেনে বের করে মেয়েটির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলা চলবে না, 'এই লাও, এয়া তোমার!' গোটা ব্যাপারটা আরও মার্জিত, আরও সূক্ষ্ম রুচির পরিচয় দিয়ে সারতে হবে।

তাকে কী-যে করতে বলা হচ্ছে মালেয়েভ তা বুঝেছিল আর রাজিও হয়ে গিয়েছিল উৎসাহের সঙ্গে, যদিও তার মনে হয়েছিল যে কাজটা কঠিন আর অস্বস্তিকর।

বৃদ্ধরা একসময় যে-যার নিজের ঘরের পথে অন্ধকারে মিশে গেলেন। কেবল কার্পেথীয় পর্বতমালার ঊর্ধ্বে জ্বলজ্বল করতে থাকল তারার মেলা আর ঝর্নার জলের

শব্দ আরও জোরালো হয়ে উঠল। রাতের জঙ্গল থেকে ভেসে এল সোঁদা মাটির আর বুনো গাছপালার মিশ্র গন্ধ।

বুড়ো ইগ্‌নাত, মালেয়েভ আর গানিয়া তার পরও অনেকক্ষণ বসে রইল বাইরে। মালেয়েভ কিছুক্ষণের জন্যে বকবকানি বন্ধ করলে গানিয়া ভীরু-ভীরু গলায় ওকে শুধোল:

'আচ্ছা, মস্কোর কাছের নদীগুলো কি এ-তল্লাটের নদীর মতনই, নাকি একবারে পের্‌থক ধরনের?'

'নদীগুলোর মধ্যে তফাত আচে বৈকি,' মালেয়েভ বলল। 'তোমাদের নদীগুলো সোন্দর দেখতে, আমাদেরও তাই। তবে আমাদের নদীগুলো আরও চ্যাওড়া আর পোস্কার, আর সেইসব নদীর পাড়ে অনেক ফুল আর ঘাস গজায়। নদীগুলো খুব নম্বা-নম্বা, অনেক দূর চলে গিয়ে তারা ক্রিমিয়ার সাগরে পড়েচে। আর নাল সিল্‌কের নিশেন উঁড়িয়ে শাদা-শাদা লৌকো সব নদীগুলো দিয়ে চলাচল করে আর নদীর ধারে-ধারে দেখা যায় শ'য়ে-শ'য়ে ঝলমলে, তারা-ফুটফুট শহর।'

'আর জঙ্গল? তা-ও কি পের্‌থক?'

'হ্যাঁ, তা-ও ভেন্নরকম বৈকি। আমাদের জঙ্গলগুলো সব ব্যাঙের ছাতায় ভরা। আর হাজার-হাজার মাইল নম্বা। মাইরি! ব্যাঙের ছাতাও আবার ভেন্ন-ভেন্ন প্রেকারের। আমাদের জঙ্গলগুলোয় এট্টা ধূত্ত পাখি বাস করে, তার নাম কাঠঠোকরা। শক্ত ঠোঁট দিয়ে সে গাছের গাছে ঠোক্কর দিতে-দিতে চলে, আর যে-গাছটা মরে-হেজে গ্যাচে দ্যাখে তার গায়ে এট্টা গত্ত করে বনরক্ষকের জন্যে নিশানা দিয়ে রাখে। নিশানার অত্থ: 'এ-গাছটারে কেটে ফেলতে পার। এয়া কোনো কাজের না।''

বলে মালেয়েভ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। কিন্তু গানিয়া যখন ওকে আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল না, তখন নিজে থেকেই ফের বলল:

'কিন্তু তুমি আমারে মানুষজন সম্বন্ধে কোনো কথা শুধোলে না যে বড়? আমাদের তল্লাটের নোকজন কেমনধারা, সে-কথা?'

'তারা-যে কেমন আমি তো হেয়া জাইন্যা ফালাইছি,' হেসে জবাব দিল গানিয়া।

'তাই নাকি? জেনে ফেলেচ?' বলল মালেয়েভ। 'ভারি মজার মেয়ে তো তুমি।'

পরদিন খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ঘরের বাইরে এল মালেয়েভ। চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে পকেট থেকে পুঁতির মালাছড়াটা বের করল ও, তারপর মালাছড়া বাড়ির সামনের বেড়ায় ঝুলিয়ে রেখে একটা মোড়ের আড়ালে সরে গিয়ে সেখানে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। গানিয়া নদীতে জল আনতে গেছে, ফেরার পথে এই বেড়ার পাশ দিয়ে যেতেই হবে তাকে। মালেয়েভের এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মালাছড়া গানিয়ার চোখে পড়বেই। মালার পুঁতিগুলোতে অনেকক্ষণ ধরে ফুঁ দিয়ে মুখের ভাপ দিয়ে-দিয়ে নিজের গ্রেটকোটের গায়ে ঘষেছে সেগুলোকে। ফলে এখন রোদ্দুর পড়ে পুঁতিগুলো হীরের মতোই জ্বলজ্বল করছে।

একসময় গানিয়াকে ওই পথ ধরেই হেঁটে আসতে দেখা গেল। মালেয়েভের চোখদুটো আঠার মতো সেঁটে রইল ওর ওপর।

আসতে-আসতে হঠাৎ একসময় মালাছড়া ওর নজরে পড়ে গেল, আর তখন দাঁড়িয়ে পড়ে হাসি-হাসি মুখে জলভরা

বালতিদুটো নামিয়ে রাখল রাস্তায়। তারপর ইতস্তত করে রোগা একখানা হাত মালাটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে খুব আস্তে-আস্তে ও এগিয়ে আসতে লাগল বেড়াটার দিকে। এমন সতর্কভাবে হেঁটে আসছে যে মনে হচ্ছে বুঝি পাখি ধরতে আসছে ও, আর পাখি পাছে ভয় পেয়ে উড়ে পালায় তার জন্যেই বুঝি এত সতর্কতা।

হঠাৎ গানিয়া চেঁচিয়ে উঠল, আর মাথায়-বাঁধা স্কার্ফখানার খোলা দুটো প্রান্ত জোরে হাত দিয়ে চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কী হল বুঝতে না-পেরে অবাক হয়ে লুকোনো জায়গা থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে মালেয়েভ দেখল সেই ঝাঁকড়া-চুলো ছেলেটা হাতে ঝলমলে মালাছড়া বাগিয়ে ধরে বেড়ার ধার ঘেঁষে ছুটে পালাচ্ছে।

'আরে, বদমাশ ছোঁড়া চোর! দেখে ফেলেচিস তুই!' ভাবল মালেয়েভ। তারপর বাজপড়ার আওয়াজে হাঁক পাড়ল:

'ফ্যাল্ মালাছড়া! ফ্যাল্ শিগগির! নইলে অনেক দুঃখু আছে তোর কপালে!'

ছেলেটা ফিরে তাকিয়ে একবার দেখে মালাছড়া ঘাসের ওপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে দ্বিগুণ জোরে দৌড় লাগাল।

এরপর যা-যা ঘটল লেফ্টেন্যান্ট মোটেই ঠিক তেমনটি চান নি। অর্থাৎ, মালেয়েভ মালাছড়া মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল আর গানিয়া যেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁদছে সেখানে এসে তার হাতে মালাটা গুঁজে দিয়ে সংক্ষেপে বলল:

'এই লাও। মালাছড়া তোমারই জন্যে!'

অতএব ব্যাপারটা পুরোপুরিই ঘটল অত্যন্ত স্থূলভাবে এবং চমক দেয়াও সম্ভব হল না। কিন্তু মালা পেয়ে গানিয়া তার জলে-ভেজা খুশিভরা চোখ মেলে মালেয়েভের দিকে

এমন এক দৃষ্টিতে তাকাল যে সে থতমত খেয়ে এক-পা পিছিয়ে এল। আর তখন বিড়বিড় করে এই কথাক'টাই বলতে পারল সে:

'বড়কত্তারা যা করার তাঁদের নিজেদের মতন করেই করবেন। তবে এয়া আমাদের ছোঁড়াদের কাচ থেকে উপহার।'

বুড়ো ইগ্‌নাত এতক্ষণ ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হাসছিল। ওরা দু'জন যখন তার কাছে এল সে তখন গানিয়ার হাত থেকে মালাছড়া নিয়ে শূন্যে তুলে এমনভাবে নাড়া দিল যে কাচের পুঁতিগুলো ঠুনঠুন শব্দে বেজে উঠল আর ঝিকিয়ে উঠল রোদ্দুরে। মালাছড়া নাত্‌নির গলায় পরিয়ে দিয়ে বুড়ো বলল:

'এই কণ্ঠমালা সোনার থেইকাও সোন্দর। ওরে-ওরে আমার ছেমড়ি সোহাগী, এমনধারা নোকজনের সাথে সংসারে বাস কইর্‍যা ওই সোন্দর চক্ষুদুইটা তর সাথক হবে, সুখের মুখ দেইখবে-আনে।'

হাতের জলভরা বালতিদুটো মাটিতে নামিয়ে গানিয়া লাজুক-লাজুক ভাব করে মাথা নামিয়ে উজ্জ্বল চোখে গলায়-দোলানো মালাছড়া দেখতে লাগল। আর বালতির দুলে-ওঠা জলে রোদ্দুর পড়ে তার আভা এসে লাগল মালার গায়ে আর মেয়েটির বাদামি চামড়ার ওপর পুঁতিগুলো ঝলমল করতে লাগল অসংখ্য তারা-মিটমিট আলোর দ্যুতি ঠিকরিয়ে।

১৯৪৪

অক্টোবরের রাত

ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে গ্রামে বসে লেখাটা শহরে বসে লেখার চেয়ে অনেক সহজ ঠেকে। গ্রামের সবকিছু মনঃসংযোগ করার ব্যাপারে দারুণ সাহায্য করে, এমন কি ছোট্ট প্যারাফিনের বাতিটার দপদপানি আর বাইরে বাগানে বাতাসের আর্ত গোঙানি পর্যন্ত সবকিছু। আর তাছাড়া এইসব শব্দের মাঝখানে নেমে আসে সেই নিটোল স্তব্ধতা যখন মনে হতে থাকে যে পৃথিবীটা বুঝি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে আর নিঃশব্দে ঝুলে আছে মহাশূন্যে।

আর তাই ১৯৪৫ সালের হেমন্তের শেষদিকে রিয়াজানের কাছে একটা গাঁয়ে গিয়ে কাজ করব বলে আমি শহর ছাড়লুম। ওই গাঁয়ে বাগানওয়ালা একখানা পুরনো বাড়ি ছিল, বাগানটা অবশ্য আগাছায় ভরে গিয়ে রূপ নিয়েছিল সম্পূর্ণ পোড়ো বাগানের। বাড়িখানার মালিক ছিলেন ভাসিলিসা ইওনভ্না নামে এক বৃদ্ধা মহিলা, রিয়াজানের অবসরপ্রাপ্তা এক গ্রন্থাগারিকা। এর আগেও আমি আরও কয়েকবার ওখানে গিয়ে থেকেছি, আর প্রতিবারই যখন গেছি তখন দেখেছি বাগানটা আগের চেয়ে আরও পোড়ো আর

বাড়িখানা ও তার মালিকানী আরও বৃদ্ধ আর জীর্ণ হয়ে উঠেছেন।

শীতের আগে বছরের শেষ স্টিমার ধরে মস্কো থেকে যাত্রা করলুম। আমার ক্যাবিনের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল নদীর মরচেরঙের লালচে-বাদামি দুই পাড় দ্রুত পেছনদিকে সরে যাচ্ছে আর স্টিমারের প্যাড্ল-হুইলের ধাক্কায় ছড়িয়ে-পড়া পাঁশুটেরঙের ছোট-ছোট ঢেউ গিয়ে আছড়ে পড়ছে তাদের গায়ে। স্টিমারের সেলুনে ছোট্ট একটা লাল বাতি সারা রাত ধরে জ্বলছে। মনে হচ্ছিল আমি যেন একাই স্টিমারটাতে চলেছি, কেননা অন্য যাত্রীরা কদাচিৎ তাদের উষ্ণ ক্যাবিন ছেড়ে বাইরে বেরোচ্ছিল। কেবলমাত্র রোদে-জলে পোড়-খাওয়া খোঁড়ামতো একজন ফৌজী ক্যাপ্টেনকেই দেখছিলুম যিনি নাকি স্টিমারের ডেকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন আর হাসি-হাসি মুখ নিয়ে পাড়ের দিকে তাকাচ্ছিলেন খালি-খালি। আসন্ন শীতের জন্যে দুই পাড় তৈরি হয়েই ছিল: গাছের পাতা ঝরে গিয়েছিল অনেক আগেই, মাটিতে সটান লটকে পড়ে ছিল ঘাস, শাকসব্জির পাতার রঙ কালো হয়ে উঠেছিল আর গাঁয়ের কুঁড়েগুলোর ওপর পাকিয়ে উঠতে শুরু করেছিল শাদা ধোঁয়ার কুন্ডলী — অর্থাৎ সর্বত্রই ঘরের চুল্লিতে আগুন জ্বালানো শুরু হয়ে গিয়েছিল। এমন কি নদীও শীতের আগমনের অপেক্ষায় তৈরি হয়ে ছিল। প্রায় সমস্ত স্টিমারঘাটা আর মালখালাসী জেটি সরিয়ে নেয়া হয়েছিল আশপাশের খাঁড়ি আর খালের মধ্যে। এমন কি নদীর মধ্যেকার বয়াগুলোও তুলে নেয়া হয়েছিল। ভাগ্যে আকাশে অস্পষ্ট চাঁদের আলো ছিল আর পৃথিবী তারই কিছু-কিঞ্চিৎ দাক্ষিণ্য পাওয়ায় আমাদের স্টিমারের পক্ষে রাত্রে পথচলা সম্ভব হচ্ছিল।

ফৌজী স্যাপার-ক্যাপ্টেনটির সঙ্গে আলাপ জমালুম। এটা দু'জনের পক্ষেই বেশ পরিতোষের আর আনন্দের ব্যাপার হয়ে উঠল। জানা গেল, ক্যাপ্টেন জুইয়েভও আমার মতো নভসিয়েল্‌কিতে নামছেন আর আমারই মতো নদী পার হয়ে ওকা-র অপর তীরে গিয়ে হেঁটে মাঠ পেরিয়ে জাবোরিয়ে গাঁয়ে যেতে ইচ্ছুক। আর ওই রাত্রেই আমাদের স্টিমার নভসিয়েল্‌কিতে পেঁছনোর কথা।

'আমি অবিশ্যি ঠিক জাবোরিয়েতেই যে যাচ্চি তা নয়,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'আরও একটু এগিয়ে বনবিভাগের অফিস পর্যন্ত যাব আমি। তবে জাবোরিয়ে পর্যন্ত দু'জনে একসঙ্গেই যাওয়া যেতে পারে। যদিও ফ্রন্টে লড়াই করে এসেচি আর জীবনে অভিজ্ঞতাও হয়েচে মন্দ নয়, তবু রাত্রে একা-একা ওই নির্জন প্রান্তরটা পার হতে তেমন ভরসা পাচ্চি না। যুদ্ধের আগে আমি ছিলাম বনরক্ষক, আর এখন ফৌজ থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ফের সেই পুরনো কাজেই ফিরে যাচ্চি। বনটা অবিশ্যি ভারি চমৎকার! বনবিদ্যার গ্র্যাজুয়েট আমি। আসুন-না একবার আমার ওখানে। বনের মধ্যে এমন কতকগুলো জায়গা দেখাব আপনাকে, একেবারে মোহিত হয়ে যাবেন। ফ্রন্টে থাকার সময় প্রায় প্রতি রাত্রে আমি ওই জায়গাগুলোর স্বপ্ন দেখতাম।'

বলে হাসলেন তিনি, আর তাঁর মুখখানা লক্ষণীয়রকম তরুণ দেখাল।

বেশ রাত করে স্টিমারখানা সেদিন যখন নভসিয়েল্‌কিতে গিয়ে পেঁছল তখন দেখা গেল স্টিমারঘাটায় লণ্ঠনহাতে চৌকিদার ছাড়া আর কেউ উপস্থিত নেই। দু'জন মাত্র যাত্রী, জুইয়েভ আর আমি পাড়ে নামলুম। ভিজে তক্তা বেয়ে আমরা পাড়ে নেমে আসতে-না-আসতেই স্টিমারখানা

আমাদের গায়ে একঝলক ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করল। আমাদের নিজের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে রেখে লণ্ঠনহাতে চৌকিদারও সঙ্গে সঙ্গে পড়ল সরে।

জুইয়েভ বললেন, 'আসুন, আমাদের তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। বরং কিছুক্ষণ একটা কাটা-গাছের গুঁড়িতে চেপে বসে সিগারেটে কয়েকটা সুখটান দেয়া যাক। তারপর ঠিক করা যাবে এরপর কী করা যায়।'

তাঁর গলার স্বর শুনে, যেভাবে তিনি নদীর জলের ঘ্রাণ নিচ্ছিলেন আর চারপাশে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিলেন তা লক্ষ্য করে আর তারপর স্টিমারটা দূরে নদীর মোড় ঘোরার সময় ছোট্ট করে একটা হুইস্‌ল দেয়ায় সেই হুইস্‌লের শব্দ আধো-অন্ধকার রাত যেভাবে প্রতিধ্বনিতে ধরে ক্রমশ দূর থেকে দূরে পাঠিয়ে দিল আর সেই প্রতিধ্বনি ওকা নদীর ওপারে জঙ্গলের মধ্যে যেমন করে ভেসে চলে গেল তাই শুনে যেভাবে তিনি খুশিতে হেসে উঠলেন তাতে বোঝা গেল জুইয়েভের গন্তব্যস্থানে পেঁছনের ব্যাপারে সত্যিই বিশেষ তাড়াহুড়ো নেই। আর তা এই সহজ কারণে যে যেখানে ফিরে আসার প্রায় সকল আশা তিনি হারাতে বসেছিলেন সেই বহুপরিচিত জায়গাটায় ফের ফিরে আসতে পেরে তিনি অসামান্য আর অপ্রত্যাশিত এক আনন্দে মশগুল হয়ে উঠেছিলেন।

সিগারেট খাওয়া শেষ হলে পর আমরা হাঁচোড়পাঁচোড় করে খাড়াই পাড় বেয়ে উঠে বাতিঘরওয়ালা সফ্রোনের বাসায় এলুম। বাসার একটা জানলায় টোকা দিতে সফ্রোন এত তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল যে আমার সন্দেহ হল আদৌ ও ঘুমচ্ছিল কিনা। ও আমাকে চিনতে পারল, করমর্দন করলুম আমরা।

'আজ কিন্তু জল বাড়তে নেগেচে,' সফ্রোন বলল। 'গত চব্বিশ ঘণ্টায় জল বেড়েচে দুই মিটার। মনে লিচ্চে উত্তুরে কোথাও বিষ্টি হচ্চে। তা, তুমি এ-ব্যাপারে কিছু শোন নাই?'

'কই, না তো।'

হাই তুলল সফ্রোন। বলল:

'হেমন্তকাল তো, কিচ্ছুটি করার নাই। তা, নদী পার হবে নাকি?'

রাত্তিরবেলায় ওকা নদীটাকে ভীষণ চওড়া লাগছিল, দিনের বেলার চেয়ে অনেক বেশি চওড়া। নদীর প্রস্থ জুড়ে আগাগোড়াই স্রোত ছিল প্রবল। মাঝে-মাঝে এখানে-ওখানে মাছ লাফিয়ে উঠছিল, আর সেই ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় আমরা দেখতে পাচ্ছিলুম মাছ লাফানোর ফলে গড়ে-ওঠা জলের বৃত্তগুলো স্রোতের টানে দ্রুত ভেসে গিয়ে তাদের গোলালো আকার হারিয়ে ফেলছিল।

অবশেষে নদীর বিপরীত পারে পেঁছনো গেল। মাঠ থেকে শুকনো ঘাস আর উইলোপাতার মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। প্রায়-অদৃশ্য একটা পায়েচলা পথ ধরে কিছুক্ষণ হেঁটে গ্রাম্য একটা রাস্তায় এসে পেঁছলুম আমরা। চারিদিক নিস্তব্ধ। চাঁদ ঢলে পড়েছে পুবদিকে, ইতিমধ্যে জ্যোৎস্না আরও ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

এরপর আমাদের পেরোতে হবে প্রায় ছ'কিলোমিটার চওড়া নদীর চরের একটা মাঠ। তারপর পড়বে নিথর নিশ্চুপ, আগাছায়-ভরা ওকা নদীর দ্বিতীয় খাতটা। পুরনো একটা সাঁকোর ওপর দিয়ে পার হতে হবে সেটা। আর তারপর একটা বালিয়াড়ি পার হতে পারলেই পাওয়া যাবে জাবোরিয়ে গ্রাম।

'সব চিনতে পারচি, এমন কি ছোটখাট নানা চিহ্ন পর্যন্ত,' উত্তেজিতভাবে বললেন ক্যাপ্টেন। 'মনে হচ্চে কিছুই ভুলি নি। আচ্ছা, দূরে ওই গাছের সার দেখতে পাচ্চেন তো? ওগুলো হল প্রোর্‌ভা নদীর পাড়ের উইলোগাছ। ঠিক বলেচি? দেখলেন তো, বলছিলাম-না সব মনে আচে আমার! ওই দেখুন, সেলিয়ান্‌স্কোয়ে হ্রদের ওপর জমাট কুয়াশা! একটাও পাখির ডাক শোনা যাচ্চে না কিন্তু। অবিশ্যি আমি অনেক দেরিতে এসেচি—পাখিরা সব এ-জায়গা ছেড়ে চলে গ্যাচে ইতিমধ্যে। আহ্‌, কী বাতাস! বাতাসের গন্ধটা শুঁকে দেখুন একবার! ঘাসের গন্ধে ভরভর করচে একবারে। আর জীবনে কোথাও এমন সুগন্ধি বাতাস দেখি নি। আচ্ছা, মোরগের ডাক শুনতে পাচ্চেন? ত্রেবুতিনো গাঁয়ের মোরগ ওগুলো। শয়তানগুলোর কী গলার জোর! চার কিলোমিটার দূর থেকে ওদের ডাক শোনা যায়!'

এরপর যত এগোতে লাগলুম আমাদের মধ্যে কথাবার্তা তত কমে এল, আর তারপর একসময় একেবারে চুপ করে গেলুম দু'জনে। অনচ্ছ একটা ছায়ায় ঢেকে ছিল যতসব খাঁড়ি, কালো-কালো খড়ের গাদা আর দলা-দলা ঝোপঝাড়। রাতের নিস্তব্ধতা আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের ডানদিকে পড়ল শরবনে-ঢাকা একটা হ্রদ। তার জলটা থেকে-থেকে অস্পষ্টভাবে ঝিলিক দিচ্ছিল। ভাঙা পায়ের জন্যে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল জুইয়েভের। হাওয়ায় ভেঙে-পড়া উইলোর একটা গুঁড়ির ওপর বিশ্রাম নিতে বসলুম আমরা। উইলোর এই গুঁড়িটা আমার চেনা—আজ কয়েক বছর হয়ে গেল এটা ওখানে ঠিক এমনিভাবেই পড়ে আছে, ছোট-ছোট বুনো গোলাপের আগাছায় আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে।

'কথাটা ভাবলে বোঝা যায়, জীবনটা সত্যিই বড় ভালো!' নিশ্বাস ফেলে বললেন জুইয়েভ। 'যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে এটা আমার খুব বেশি করেই মনে হয়েচে। কথাটা শুনলে আপনি হয়তো হাসবেন, কিন্তু আমি বাকি জীবনটা এখন পাইনগাছের চাষ করেই কাটিয়ে দিতে রাজি। সত্যি-সত্যি! কী? আবোলতাবোল বকচি নাকি?'

বললুম, 'বরং উলটো। একেবারেই আবোলতাবোল নয়। আচ্ছা, আপনার স্ত্রী-পুত্র পরিবার আছে?'

'না। আমি বুড়ো আইবড়ো।'

ফের হাঁটা শুরু করলুম আমরা। ওকা-র খাড়াই পাড়ের ওধারে দেখতে-দেখতে চাঁদ অদৃশ্যে হয়ে গেল। তবে ভোর হতে তখনও অনেক দেরি। আকাশের বাকি দিকগুলোর মতো পুবদিকও তখন ঘোর অন্ধকারে ঢাকা। অন্ধকারে পথ দেখে হাঁটা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে আমাদের পক্ষে।

'একটা ব্যাপার আমি ঠিক বুঝতে পারচি নে,' বললেন জুইয়েভ। 'লোকে ঘোড়াগুলোকে রাতের বেলা চরাতে আনে নি কেন? প্রথম বরফ পড়া পর্যন্ত তারা তো গোটা সময় জুড়ে সারারাত ঘোড়াগুলোকে বাইরে চরে বেড়াতে দেয়। কিন্তু এখন তো মাঠে একটাও ঘোড়া দেখচি নে।'

আমিও এ-ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলুম, কিন্তু এর-যে বিশেষ কোনো তাৎপর্য আছে তা মনে হয় নি। চরটা আগাগোড়া এতই নির্জন ঠেকছিল যে মনে হচ্ছিল আমরা ছাড়া মাঠে আর তৃতীয় জীবন্ত প্রাণী নেই।

এবার সামনে কিছুদূরে বেশ চওড়া একটা জলের বিস্তার আমার নজরে পড়ল। এর আগে এ-জায়গাটায় তো জল ছিল না। অন্ধকারের মধ্যে ভালো করে ঠাহর করে দেখে

আমার বুকটা দমে গেল। তাহলে কি ওকা-র পুরনো খাতেই এতটা জল বাড়ল নাকি?

'আরে, ভয় নেই, শিগগিরি সাঁকোটা দেখা যাবে,' নিশ্চিন্তভাবে বললেন জুইয়েভ। 'আর ওই জলের ওপারেই তো জাবোরিয়ে। আমরা তো পেঁাছে গেচি বললে চলে।'

পুরনো খাতের ধারে পেঁাছে দেখা গেল, রাস্তাটা সোজা কালো জলের মধ্যে নেমে গেছে। আমাদের পায়ের কাছে ঢেউ খেলিয়ে জল ধাক্কা খাচ্ছে খাতের পাড়ে। মাঝে-মাঝে পাড় থেকে এখানে-ওখানে মাটি ধসে জলে পড়ছে আর শব্দ উঠছে ঝুপঝুপ করে।

'এ কী, সাঁকোটা গেল কোথায়?' দুশ্চিন্তিতভাবে শুধোলেন জুইয়েভ।

দেখা গেল, সাঁকোর কোনো চিহ্নই নেই। হয় সেটা ভেসে গেছে, আর নয়তো ডুবে গেছে বানের জলে। জুইয়েভ টর্চ জ্বাললেন। দেখলুম, ঘোলা জলে ঢেউ উঠছে আর সেই জল থেকে মাথা জাগিয়ে ঝোপঝাড়গুলো দুলছে ঢেউয়ের ধাক্কায়।

ধাঁধায় পড়ে জুইয়েভ বললেন, 'ওঃ, তাহলে এই ব্যাপার! আমরা ঘেরাও হয়ে গেচি। বানের জলে। এখন বুঝতে পারচি মাঠগুলো কেন এত ফাঁকা। মনে হচ্চে, মানুষজন বলতে আমরা দু'জনই কেবল এখানে আচি। হুঁ, কী করা— ভেবে দেখতে হয়।'

চুপ করে গেলেন তিনি।

'একবার চেঁচিয়ে ডেকে দেখব?'

কিন্তু বুঝতে পারছিলুম চেঁচিয়ে কোনো লাভ নেই। জাবোরিয়ে তখনও বেশ কিছুটা দূরে। আর তাছাড়া হাজার চেঁচালেও কেউ আমাদের ডাক শুনতে পাবে না।

তদুপরি এ-ও আমার জানা ছিল যে জাবোরিয়েতে এমন একখানাও নৌকো নেই যা ওই চর থেকে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারে। ওখান থেকে খেয়াঘাট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দু'কিলোমিটারটাক দূরে ভাটির দিকে, পুস্তিনস্কি বনের ধারে।

বললুম, 'আমার মনে হয়, আমাদের খেয়াঘাট পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে। অবশ্য যদি...'

''অবশ্য যদি' কী?'

'না, কিছু না। চলুন, পথটা আমার চেনা।'

আসলে আমি বলতে যাচ্ছিলুম: 'অবশ্য যদি খেয়াঘাটটা এখনও ওখানে থেকে থাকে।' কিন্তু কিছু না-বলাই ভালো মনে করে চেপে গিয়েছিলুম। কেননা মাঠগুলো যদি ইতিমধ্যে হেমন্তের বন্যার জলে ভেসে গিয়ে থাকে আর জনমনুষ্যহীন হয়ে পড়ে থাকে, তাহলে সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে খেয়াঘাটও ইতিমধ্যে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আর তাহলে খেয়া-পারাপারের মাঝি কড়ামেজাজী বিচক্ষণ বুড়ো ভাসিলি নিশ্চয়ই এখনও মিথ্যে-মিথ্যে তার ছোট্ট কুঁড়েটায় খামোকা বসে থাকবে না।

'ঠিক আচে তাহলে,' আমার আগের কথায় রাজি হয়ে গিয়ে জুইয়েভ বললেন। 'চলুন, যাওয়া যাক। দেখেচেন, রাতটা কীরকম ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে উঠেচে? দূর হোক গে' ছাই!'

টর্চটা ফের জ্বালিয়েই খিস্তি করে উঠলেন তিনি। খাতের জল ইতিমধ্যে আরও বেড়েছে, ঝোপঝাড়ের উঁচনো মাথাও ঢেকে গেছে জলে।

'সত্যি, অবস্থা গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্চে!' বিড়বিড় করে বললেন জুইয়েভ। 'তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলা দরকার!'

খেয়াঘাটের উদ্দেশ্যে চলল্ম আমরা। অন্ধকারের মধ্যে থেকে হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠল। সোঁ-সোঁ আওয়াজ তুলে, তুষারকণা ছড়িয়ে উড়িয়ে আস্তে-আস্তে এসে পড়ল সেই হাওয়ার দমক। খাতের পাড়ের মাটি ধসার আওয়াজ আরও ঘনঘন কানে আসতে লাগল। ধপধপ করে পা ফেলে-ফেলে কষ্ট করে মাটির ঢিপি আর মরা ঘাসের গোছায় হোঁচট খেতে-খেতে চলল্ম আমরা। পথে দ্টো ছোট-ছোট নালা পড়ল। নালাদ্টো সবসময়েই শ্কনো থাকতে দেখেছি। কিন্তু এখন একহাঁটু জল ভেঙে সেদ্টো পার হতে হল।

'নালাগ্লোও জলে ভরে উঠচে,' বললেন জ্ইয়েভ। 'আশা করি বানের জলে আমরা ভেসে যাব না। কিন্তু আমি কিছ্তেই ব্ঝতে পারচি নে জল এত তাড়াতাড়ি বাড়চে কেন!'

সত্যি, হেমন্তের সবচেয়ে প্রচণ্ড বর্ষণেও কোনোদিন এ-তল্লাটে এত তাড়াতাড়ি জল বাড়তে কিংবা চরের মাঠটা এভাবে ভেসে যেতে দেখি নি।

'দেখচেন, গাছগাছালি কিছ্ নেই এখেনে,' হঠাৎ বলে উঠলেন জ্ইয়েভ। 'ঝোপ ছাড়া আর তো কিছ্ দেখচি নে।'

খেয়াঘাটের কাছাকাছি এসে একটা ঘোড়ার গাড়ি চলার রাস্তা পেয়ে গেল্ম আমরা। চাকার দাগের গর্তে জমা কাদা আর ঘোড়ার নাদের গন্ধে পথটার সন্ধান পাওয়া গেল। প্রনো খাতের ওপারে এই জায়গাটায় দেখা গেল পাড়টা একেবারে খাড়াই উঁচু আর বড়-বড় পাইনগাছে ঢাকা। বাতাসে পাইনগাছগ্লোয় সোঁ-সোঁ শব্দ উঠছে।

রাতটা ক্রমেই আরও অন্ধকার আর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। হিস্‌হিস শব্দ উঠছে জল থেকে। জ্ইয়েভ ফের টর্চ

জ্বাললেন। দেখা গেল নদীর জল ভরে উঠেছে পাড়ের কানায়-কানায় আর ছোট-ছোট জলের ধারা ইতিমধ্যেই লাফিয়ে মাঠে ঢুকে পড়তে শুরু করেছে।

'মা—ঝি—!' জুইয়েভ চেঁচিয়ে ডাকলেন। তারপর কান পেতে শুনলেন কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে কিনা। 'ও—মাঝিভাই—!'

কেউ সাড়া দিল না। পাইনগাছগুলো ফোঁপাতে লাগল শুধু।

এইভাবে অনেকক্ষণ চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করলুম আমরা। গলা ধরে গেল তবু কারও সাড়া মিলল না। বরফ-পড়া থেমে গিয়ে থেকে-থেকে বৃষ্টি পড়তে লাগল এবার। দমকে-দমকে বৃষ্টির ফোঁটা সজোর আওয়াজ করে মাটিতে পড়তে লাগল।

ফের কিছুক্ষণ চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করলুম আমরা। আর আগের মতোই পাইনগাছগুলো নির্বিকারভাবে ফোঁপাতে লাগল।

'খেয়ার মাঝি-যে চলে গ্যাচে, এটা স্পষ্ট!' বিরক্ত হয়ে বললেন জুইয়েভ। 'তা, সে-বেচারা মরতে থাকবেই-বা কেন এখেনে যখন গোটা চরটা জলে ভেসে যাচ্চে আর জনপ্রাণী বলতে কেউ নেই এ-তল্লাটে? সত্যি, কী হাস্যকর পরিস্থিতি!.. গাঁয়ের ঠিক দোরগোড়ায় পেঁাছে কিনা!..'

বেশ বুঝতে পারছিলুম নেহাত দৈবক্রমে ছাড়া আমাদের প্রাণে বাঁচার উপায় নেই। মাঠের জল বেড়ে-ওঠা যদি হঠাৎ বন্ধ হয়, কিংবা আমরা আচমকা ফেলে-যাওয়া কোনো নৌকো পেয়ে যাই যদি, তাহলেই এটা সম্ভব। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার এই যে আমরা বুঝে উঠতে পারছিলুম না জল কেন এত তাড়াতাড়ি বাড়ছে। এটা ভাবলেও গায়ে কাঁটা

দিয়ে ওঠে যে মাত্র একঘণ্টা আগেও আমাদের বিন্দুমাত্র জানা ছিল না, রাত্রে আমরা এই ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে যাব। নিজেরাই সেধে হেঁটে এসে এই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি।

'আসুন, খাঁড়ির পাড় ধরে হাঁটা যাক,' আমি বললুম। বলা যায় না, হয়তো এক-আধটা নৌকোর দেখা পেলেও পেতে পারি।'

হাতড়ে-হাতড়ে খাঁড়ির পাড় ধরে চললুম আমরা। পাড়ের যেসব জায়গায় জল উঠেছে সে-জায়গাগুলো এড়িয়ে ঘুরে চললুম। জুইয়েভ মাঝে-মাঝে টর্চ জ্বালছিলেন, কিন্তু দেখা গেল টর্চের আলো ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। অবশেষে একেবারে চরম দরকারের সময় ব্যবহারের জন্যে টর্চ জ্বালানো বন্ধ করলেন তিনি।

অন্ধকারে নরমমতো কী-একটা জিনিসের গায়ে আমি একসময় হোঁচট খেলুম। দেখা গেল, জিনিসটা ছোট্ট একটা খড়ের গাদা। জুইয়েভ একটা দেশলাই-কাঠি জ্বালিয়ে খড়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন। গোটা গাদাটা টকটকে লাল আগুনের শিখা তুলে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। আগুনের আভায় আলো হয়ে উঠল ঘোলাজলের নদীটা, আমাদের সামনে যতদূর চোখ যায় ততদূর ইতিমধ্যে-জলে-ভাসা মাঠঘাট, এমন কি ওপারের পাইনবনটাও। বনটা তখনও হাওয়ার দমকে আন্দোলিত হচ্ছে আর নির্বিকারভাবে ফুঁপিয়ে চলেছে।

জ্বলন্ত খড়ের গাদার পাশটিতে দাঁড়িয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে ছিলুম আমরা দু'জন। আমার মনে টুকরো-টুকরো নানা ভাবনা চমকে যাচ্ছিল। প্রথমেই এই ভেবে দুঃখ হল যে জীবনে যা-কিছু করব বলে মনস্থ করেছি তার এক-দশমাংশও এখনও সমাধা হয় নি। তারপর মনে হল, নিজের

বোকামিতে এইভাবে প্রাণ দেয়াটা নিছক আহাম্মকি ছাড়া কিছু নয়—যখন জীবনে এইরকম আরও কত দিন আমি উপভোগ করতে পারতুম, হয়তো তা এইরকমই হিমেল, নির্জন, হেমন্তের দিন তবু কী তর্‌তাজা আর প্রাণের অধিক প্রিয়, যখন প্রথম তুষার রীতিমতো পড়ে নি, অথচ সবকিছুতে—বাতাসে, জলে, গাছপালায়, এমন কি বাঁধাকপির পাতায় পর্যন্ত তুষারের গন্ধ ম-ম করছে।

মনে হয় জুইয়েভও আমার মতো একই চিন্তায় বিভোর হয়ে ছিলেন। কোটের পকেট থেকে আস্তে-আস্তে দোমড়ানো-মোচড়ানো সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। জ্বলন্ত খড়ে সিগারেট ধরিয়ে নিলুম।

'এখুনি আগুনটা নিবে যাবে'খন', চাপাগলায় বললেন জুইয়েভ। 'জল কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের পা ছুঁয়েচে।'

এর কোনো জবাব দিলুম না। আসলে আমি তখন কান খাড়া করে শুনছিলুম। পাইনবনের ফোঁপানি আর জলের ছলছল শব্দ ছাপিয়ে আমার কানে আসছিল তালে-তালে নিয়মিত একটা খুব অস্পষ্ট আওয়াজ। মনে হল শব্দটা ক্রমেই যেন কাছে এগিয়ে আসছে। নদীর দিকে মুখ করে আমি হঠাৎ হাঁক পাড়লুম:

'হে-ই, নৌকোয় কে আছ? এইদিকে এস!'

আর সঙ্গে সঙ্গে নদীর দিক থেকে বাচ্চা ছেলের গলায় সাড়া মিলল:

'আসচি-ই-ই!'

তাড়াতাড়ি খড়টা খুঁচিয়ে আগুনটা উস্‌কে দিলেন জুইয়েভ। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের মোটা একটা শিখা লকলকিয়ে আকাশে উঠল, অন্ধকারে ছিটিয়ে উঠল অসংখ্য

ফুলকি। নরম হাসিতে ছলবল করে উঠলেন জুইয়েভ।

বললেন, 'আরে, এ-যে দাঁড়! দাঁড়ের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শুনেচি-যে! আচ্ছা বলুন তো, কী করে এক-মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পেরেছিলাম যে আমাদের প্রাণের প্রিয় এই জায়গাটাতে পেঁাছে মারা পড়ব আমরা?'

আমার ডাকে সাড়া দিয়ে 'আসচি' বলে ওই ডাকটা বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল আমাকে। অর্থাৎ, আমি আসছি, তোমাদের সাহায্য করতে আসছি! আমি আসছি অন্ধকার ভেদ করে শিবিরাগ্নির জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে! ওই ডাক আমার মনে জাগিয়ে তুলল ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সাহায্যের সেই সুপ্রাচীন রীতির স্মৃতি, যা নাকি আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে এখনও জীবন্ত।

'হেই, নিচের বালিতে নেমে আসেন! এইদিকে!' নিচের নদী থেকে ফের সেই গলাটা ভেসে এল। আর হঠাৎ আমার খেয়াল হল যে গলাটা পুরুষের নয়, মেয়ের।

জলের ধারে তাড়াতাড়ি নেমে এলুম আমরা। খড়ের আগুনের অস্পষ্ট আলোয় হঠাৎ একটা নৌকোকে এগিয়ে এসে বালির চড়ায় ভিড়তে দেখা গেল।

'এখুনি উঠবেন না। নৌকো থেকে খানিকটা জল ছেঁচে ফেলি আগে,' ফের সেই গলাটা শোনা গেল।

একটি মেয়ে লাফিয়ে নৌকো থেকে নেমে নৌকোটাকে টেনে বালির চড়ার ওপর তুলল খানিকটা। মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তুলোভরা জ্যাকেট আর উঁচু বুট পরনে ছিল মেয়েটির, আর মাথাটা ঢাকা ছিল গরম রুমালে।

'এখেনে কী করতে এয়েচেন আপনেরা?' নৌকোর জল সেচতে-সেচতে আমাদের দিকে না-তাকিয়েই রুক্ষভাবে মেয়েটি বলল।

একটু যেন নির্বিকারভাবেই আমাদের দুঃখের কাহিনী শুনল সে, তারপর একইরকম রুক্ষ গলায় বলল:

'বাতিঘরওয়ালা আপনেদেরকে বলে নি কেন? গতকাল থেকেই তো নদীর স্লুস-গেট খুলে দেয়া হয়েচে, শীতের জন্যে। ভোরের আগেই এই গোটা চরটা জলে ডুবে যাবে।'

'আর আপনি এই রাতের বেলা এ-জঙ্গলে কী করচেন, প্রাণদায়িনী দেবী?' মজা করে শুধোলেন জুইয়েভ।

কিছুটা অনিচ্ছাভরেই যেন মেয়েটি জবাব দিল। বলল, 'আমি কাজে যাচ্চি—পুস্তিন থেকে জাবোরিয়েতে। যাওয়ার পথে এই চরে আগুন জ্বলচে দেখলাম, আপনেদেরও দেখতে পেলাম। কাজেই ব্যাপারটা আন্দাজ করলাম। খেয়ার মাঝি আজ দু'দিন হল চলে গ্যাচে। তার আর এখেনে থাকার কোনো কারণ ছিল না। আমারও এই দাঁড়দুটো খুঁজে বার করতে সময় লেগেচে। মাঝির কুঁড়েয় খড়ের নিচে লুকনো ছিল দাঁড়গুলো।'

যাবার সময় আমি বসলুম নৌকোর দাঁড় ধরে, আর প্রাণপণে যথাসাধ্য জোরে দাঁড় বাইতে লাগলুম। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে কেন যেন আমার মনে হতে লাগল যে নৌকোখানা মোটেই সামনের দিকে না-এগিয়ে অন্ধকার চওড়া একটা জলপ্রপাতের দিকে সজোরে ছুটে চলেছে আর সেই জলপ্রপাত বেয়ে নদীর ঘোলাজলের স্রোত, অন্ধকার আর গোটা রাতটাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ছে নিচে।

অবশেষে নদীর অপর পাড়ে পেঁছনো গেল। খাড়াই পাড় বেয়ে ওপরে উঠলুম আমরা আর একেবারে জঙ্গলটায় না-পেঁছনো পর্যন্ত এমন কি সিগারেট ধরানোর জন্যেও থামলুম না। জঙ্গলের ভেতরটা একেবারে শান্ত আর বেশ উষ্ণ। পচা পাতার গন্ধে ভরে আছে জায়গাটা। কেবল

আমাদের মাথার অনেক ওপরে একটানা গুরুগম্ভীর একটা আওয়াজ হয়ে চলেছে — বাদলার অন্ধকার রাত আর আমাদের সাম্প্রতিক বিপদের কথা একমাত্র ওই আওয়াজটাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। এখন কিন্তু রাতটা ভারি সুন্দর, ভারি চমৎকার ঠেকছে। আর সিগারেট ধরানোর জন্যে দেশলাই জ্বালানোয় অল্পক্ষণের সেই আলোয় অল্পবয়সী সঙ্গিনী মেয়েটির মুখখানাও ভারি মিষ্টি আর কেমন যেন পরিচিত ঠেকল। ওর ধূসর চোখদুটো আমাদের লক্ষ্য করছিল সলজ্জভাবে। রুমালের তলা থেকে দু'এক গোছা ভিজে চুল পিছলে নেমে এসেছিল ওর মুখের ওপর।

'তুমি দাশা নাকি?' হঠাৎ ভারি নরম গলায় শুধোলেন জুইয়েভ।

'হ্যাঁ, ইভান মাত্‌ভেয়েভিচ,' বলে খিলখিল করে হালকা হাসিতে মুখর হয়ে উঠল মেয়েটি, যেন শুধু নিজেই জানে এমন একটা গুপ্তকথা মনে পড়েছে, এইভাবে। 'আমি কিন্তু আপনেরে সাথে-সাথেই চিনেচি। কিন্তু তা প্রেকাশ করতে চাই নি। যুদ্ধে জেতার পর থেকে আমরা কিন্তু আপনের জন্যে অপেক্ষা করচি তো করচিই! আপনি আর আমাদের এখেনে ফিরবেন না একথা বিশ্বেসই হয় নি আমাদের।'

'বুঝলেন, এমনিই হল গে জীবন!' বললেন জুইয়েভ। 'চার-চারটে বছর আমি ফ্রন্টে কাটিয়েচি আর মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েচি বহুবার। আর এখন দেখুন, আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাল কে? না দাশা!' এরপর দাশার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'ও হল আমার সহকারী। বনবিভাগের আপিসে কাজ করে। কাজটা আমিই ওকে শিখিয়েচি। আগে ও ছিল ছোট্টখাট্ট দুর্বল একটা মেয়ে, ফুলের ডাঁটার মতন রোগা লিকলিকে। আর এখন

দেখুন, কী সুন্দর দেখতে হয়েচে মেয়েটা। আবার বেশ কড়ামেজাজীও হয়েচে।'

'না-না, মোটেই না! একদম কড়া নই আমি,' দাশা বলল। 'ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটল কিনা, তাই। আচ্ছা, আপনে কি ভাসিলিসা ইওনভ্‌নার ওখেনে উঠতে যাচ্চেন?' শেষের প্রশ্নটা আচমকা আমাকে শুধিয়ে বসল দাশা। মনে হল, আলোচনার বিষয়টা বদলাতে চাইছে ও।

ওর কথার জবাবে জানালুম, হ্যাঁ, আমি ভাসিলিসা ইওনভ্‌নার বাড়িতেই উঠতে যাচ্ছি। ওঁদেরও আমার সঙ্গে আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানালুম। সকলেই আমরা চাইছিলুম ভিজে জামাকাপড়গুলো শুকিয়ে নিতে আর পুরনো উষ্ণ বাড়িটাতে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে।

অত রাত্রে আমাদের ত্রিমূর্তির আবির্ভাবে ভাসিলিসা ইওনভ্‌না কিন্তু কিছুমাত্র অবাক হলেন বলে মনে হল না। আসলে উনি সেই বয়সটায় পেঁৗছেছিলেন যখন কোনোকিছুই আর মানুষকে অবাক করে না, চারপাশে যা-কিছু ঘটছে সেই সবকিছুকেই নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে সে। যেমন এখন—আমাদের ঝামেলায়-ভরা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী শুনে তিনি অম্লানবদনে বললেন:

'রুশদেশের ভগমান পরম করুণাময়! আর ওই সফ্রোনটার কথা বলচ? আমি চেরটা কাল বলে এসেচি, ও হতভাগা মাথামোটা, গাধা। তবে আমি বুঝি না, তুমি গপ্পোনিখিয়ে হয়েও হতভাগাটারে এখনও চিনতে লারলে কেনে! এয়ার মানে, কিছু-কিছু নোক সম্বন্ধে তুমিও অন্ধ।' এরপর দাশার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী, খুশি তো? তোমার কথা ভেবে আমারও আনন্দ নাগচে। তোমার ইভান মাত্‌ভেয়েভিচ শেষ পয্যন্ত ফিরে আলেন।'

কথাটা শুনে টকটকে লাল হয়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল দাশা, তারপর খালি একটা বালতি তুলে নিয়ে ছুটে বাগানে বেরিয়ে গেল। এমন কি যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করতে পর্যন্ত ভুলে গেল।

'আরে, চললে কোথা?' চমকে উঠে ভাসিলিসা ইওনভ্না চেঁচিয়ে শুধোলেন।

'সামোভারের জন্যে জল আনতে-এ!' চেঁচিয়ে জবাব দিল দাশা।

'আজকালকার ছুঁড়িদেরে আমি ঠিক বুইতে লারি,' বললেন ভাসিলিসা ইওনভ্না। জুইয়েভ কেন-যে তাঁর দেশলাইটা ধরাতে পারছেন না, সেদিকে নজরই দিলেন না তিনি। বলে চললেন, 'তুমি কিছু-এট্টা কথা বল ওদেরে, অমনি তুবড়িবাজির মতন ফেটে পড়বে-নে। তবে, যাই বল, ছুঁড়িটে কিন্তু বড্ড ভালো! সত্যি কথা বলতে কী, ও আমার একমাত্তর অন্ধের নড়ি।'

'হ্যাঁ, তা যা বলেচেন,' সায় দিলেন জুইয়েভ। 'সত্যি, মেয়েটি বড্ড ভালো।' অবশেষে দেশলাইটা ধরাতে পেরেছেন উনি।

আর যা ভেবেছি তাই, জল তুলতে গিয়ে দাশা বালতিটা কুয়োয় ফেলে দিয়েছে আর তুলতে পারছে না। লম্বা একটা ডান্ডা নামিয়ে কুয়ো থেকে কী করে বালতি তুলতে হয় তা আমার জানা ছিল। কাজটা করতে দাশা আমায় সাহায্যও করল। উত্তেজনায় আর লজ্জায় বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল তার হাতদুটো। খালি বারবার বলছিল সে:

'সত্যি, ভাসিলিসা ইওনভ্না কী করে বলতে পারলেন কথাটা! কী করে বলতে পারলেন!'

এতক্ষণে দমকা বাতাস ঝড়ের মেঘ উড়িয়ে নিয়ে

গিয়েছিল, আর অন্ধকার বাগানটার মাথার ওপর ঝিকমিক করছিল তারাভরা আকাশ। কুয়ো থেকে বালতিটা শেষ পর্যন্ত টেনে তোলা গেল। সোজা বালতিতেই চুমুক দিয়ে জল খেতে লাগল দাশা, অন্ধকারে ভিজে দাঁতের পাটি ঝলমলিয়ে তুলে।

'হায়-হায়, এখন কী করে ফিরে যাই ঘরে?' ও বলল।

'আরে, ও কিছু নয়, চলে আসুন।'

ফের ঘরে ফিরে গেলুম দু'জনে। দেখলুম, ঘরের বাতিগুলো ইতিমধ্যে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে আর পরিষ্কার একখানা ঢাকা পেতে দেয়া হয়েছে টেবিলের ওপর। আর দেয়ালে-টাঙানো কালো ফলকখানা থেকে তুর্গেনেভ শান্তভাবে তাকিয়ে আছেন গোটা দৃশ্যপটের দিকে। সবচেয়ে সূক্ষ্ম ছুঁচ দিয়ে ইস্পাতের ফলকের ওপর কুঁদে-তোলা বিরল এই প্রতিকৃতিটি তাঁর। প্রতিকৃতিটি ভাসিলিসা ইওনভ্‌নার গর্ব আর আনন্দের বস্তু।

১৯৪৬

টেলিগ্রাম

সেবার অক্টোবর মাসটা ছিল বিশেষরকম ঠান্ডা আর বাদলা। বাড়ির কাঠের ছাদগুলো স্লেটের মতো কালো হয়ে উঠেছিল, বাগানে দলাপাকানো ঘাসের গোছা নুয়ে পড়েছিল মাটিতে, কেবল বেড়ার ধারে একটামাত্র ছোট্ট সূর্যমুখীর ফুল টিকে ছিল তখনও—সবকটা পাপড়ি তার তখনও ঝরে নি।

ঘন, কেশরফোলানো মেঘের দল নদীর ওপার থেকে উঠে এসে পাতাহীন উইলোগাছগুলোর মাথা ঢেকে মাঠের-পর-মাঠ জুড়ে নেমে এসেছিল যেন, আর ঝরিয়ে চলেছিল একটানা অসহ্য গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি।

রাস্তাঘাটও পুরোপুরি চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল, রাখালেরা মাঠে গোরু-ভেড়া চরাতে নিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। পরের বসন্ত পর্যন্ত রাখালের শিঙার আওয়াজও গিয়েছিল চুপ মেরে।

প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সেই এক অপরিবর্তনীয় দৃশ্য চোখ মেলে দেখা কাতেরিনা পেত্রোভ্‌নার পক্ষে ক্রমশ বেশি-বেশি কষ্টকর হয়ে উঠছিল।

সেই একই রকম সব ঘর আগুন না-জ্বালানো চুল্লির গুমোট কটু গন্ধে ভরা, ধুলোমাখা সেই 'ইউরোপিয়ান হেরাল্ড' পত্রিকা, টেবিলের ওপর হলদে ছোপ-ধরা চায়ের কাপগুলো, অনেকদিনকার না-মাজা সামোভারটা, দেয়ালে-ঝোলানো সেই এক ছবির সার। হয়তো ঘরগুলো বেশি অন্ধকার আর কাতেরিনা পেত্রোভ্‌নার চোখের দৃষ্টি ক্রমশ কমে আসছে বলে, কিংবা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আঁকা-ছবিগুলোর রঙই ফিকে হয়ে আসছে বলে কিনা কে জানে, তবে এটা ঠিক ছবিগুলোর রঙরেখার খুঁটিনাটি এখন আর তিনি ধরতে পারেন না। একমাত্র আগেকার কথা মনে করেই কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না বলতে পারেন যে ওখানে যে-ছবিখানা টাঙানো আছে ওটা হল তাঁর বাবার প্রতিকৃতি, আর ওই-যে গিল্টি-করা ফ্রেমে-বাধানো ছোট্ট ছবিখানা রয়েছে এপাশে সেটা হচ্ছে ক্রামস্কয়ের দেয়া উপহার একটা—তাঁর 'ভেল্‌ভেট-জ্যাকেট পরিহিতা অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা'র প্রাথমিক স্কেচ ওটা।

কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটাচ্ছেন তাঁর বাবার তৈরি এই পুরনো বাড়িটায়। বাবা ছিলেন এককালের সুপরিচিত এক শিল্পী।

বৃদ্ধ বয়সে তিনি সেন্ট পিটার্সবুর্গ ছেড়ে তাঁর জন্মস্থান এই গাঁয়ে বাস করতে আসেন, যাতে নিরিবিলিতে বাকি জীবনটা শখের বাগান করে কাটিয়ে দিতে পারেন। তখন আর তাঁর ছবি আঁকার ক্ষমতা নেই—হাত কাঁপে, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, চোখে প্রায়ই যন্ত্রণা হয়, ইত্যাদি।

কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না বলেন যে বাড়িখানা নাকি এখন একটি 'স্মৃতিভবন', আঞ্চলিক মিউজিয়মের রক্ষণাধীনে

আছে এটি। কিন্তু বাড়িখানির শেষ বাসিন্দা তিনি স্বয়ং মারা যাওয়ার পর এটির-যে কী গতি হবে তা তাঁর কল্পনার বাইরে।

গাঁয়ের নাম জাবোরিয়ে। গাঁয়ে এমন কেউ নেই যার সঙ্গে কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না আলোচনা করতে পারেন চিত্রকলা আর সেন্ট পিটার্সবুর্গের জীবন নিয়ে কিংবা বাবার সঙ্গে তিনি যখন কিছুদিন প্যারিসে বাস করেছিলেন আর ভিক্তর উগো-র অন্ত্যেষ্টি দেখেছিলেন তার বিষয়ে।

যতই যাই হোক, এ-নিয়ে তো তিনি আর মানিউশ্‌কার সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন না। মানিউশ্‌কা তাঁর প্রতিবেশী, গাঁয়ের মুচির মেয়ে। প্রতিদিন সে এসে কুয়ো থেকে জল তুলে দেয়, ঘরের মেঝে ঝাঁট দেয় আর সামোভারে আগুন দিয়ে গরম করে।

তার এই কাজের প্রতিদানে কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না মেয়েটিকে এটা-ওটা উপহার দেন মাঝে-মাঝে। যেমন, একজোড়া দোমড়ানো-মোচড়ানো দস্তানা, উটপাখির কিছু পালক কিংবা হয়তো কালো পুঁতি-বসানো মেয়েদের একটা টুপি।

জোরে-জোরে ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে-ফেলতে ধরাগলায় মানিউশ্‌কা তখন বলে, 'এ লিয়ে আমি কী করব? আমি কি পুরানো জামা বিক্রিওলা মেয়ে নাকি?'

আর ফিস্‌ফিস করে কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না বলেন, 'বিক্রি করিস, মেয়ে।' গত একবছর ধরে এত দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি যে জোরে কথা পর্যন্ত বলতে পারেন না। শুধু ফিস্‌ফিসিয়ে বলেন, 'বিক্রি করিস'।

‘যাক গে, ছেঁড়া ন্যাকড়া-কুড়ুনে নোকেরে দিয়ে দেব-নে এয়া,’ মনে-মনে সাব্যস্ত করে মানিউশ্‌কা। তারপর উপহারের জিনিসগুলো কুড়িয়ে নিয়ে চলে যায়।

এছাড়া কখনও-কখনও এ-বাড়িতে আসে তিখন, গাঁয়ের দমকলের আটচালার হাড়গিলে লালচুলো পাহারাদার। এখনও তার মনে পড়ে কাতেরিনা পেত্রোভ্‌নার বাবাকে, সেই যখন এই বাড়িটা আর সংলগ্ন বাগানটা তৈরি করার সময় মাঝে-মাঝে সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে তিনি এখানে আসতেন তখনকার কথা।

তখন তিখন ছিল নেহাতই বাচ্চা ছেলে, তবু তারপর সারা জীবন সেই শিল্পী সম্পর্কে ওর সভয় শ্রদ্ধার ভাবটা রয়ে গেছে। এখনও তাঁর আঁকা ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে নিশ্বাস ফেলে ও বলে, ‘একবারে খাঁটি শিল্পকম্মো, সত্যি!’

এ-বাড়িতে এসে প্রায়ই উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায় তিখন, কেমন একটা দুঃখ বোধ করে সবকিছুর জন্যে। তবু বৃদ্ধাকে সাহায্য করে বাগানের শুকনো গাছ কেটে করাতে চিরে জ্বালানির জন্যে চেলাকাঠ টুকরো করে দিয়ে। তারপর যাবার সময় দোরগোড়ায় একবার দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে যায়, ‘কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না, আজকালের মধ্যে নাস্তিয়ার কোনো খবর পেয়েচেন নাকি?’

কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না অবশ্য জবাব দেন না। আরও ছোট্ট আর কুঁজো হয়ে ডিভানটায় গুটিসুটি মেরে বসে বাদামিরঙের চামড়ার একটা থলির মধ্যে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে থাকেন।

এদিকে দরজায় দাঁড়িয়ে অস্বস্তিভরে ইতস্তত করতে থাকে তিখন, নাকঝাড়ার জন্যে সময় নেয় কিছুক্ষণ। অবশেষে

জবাব পাওয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে বলে, 'আচ্ছা, চলি তাইলে, কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না।'

'হ্যাঁ, তাই যাও, তিশা,' কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না এবার ফিস্‌ফিস করে বলেন। 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!'

এরপর দরজাটা সাবধানে ভেজিয়ে দিয়ে চলে যায় তিখন, আর নিঃশব্দে কাঁদতে থাকেন কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না। আর বাইরে গাছের শেষ পাতাগুলো উপড়ে ঝরিয়ে দিয়ে শূন্য ডালপালার মধ্যে বাতাস শিস দিয়ে ফিরতে থাকে। টেবিলের ওপর রাতজাগা প্যারাফিনের বাতির শিখা দপদপ করে জ্বলে। বাতির ওই শিখাটাকেই একমাত্র জীবন্ত বলে ঠেকে এই জনশূন্য বাড়িতে। আগুনের ওই দুর্বল শিখাটুকু জ্বলতে না-থাকলে কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না হয়তো ভেবেই পেতেন না কী করে ভোর পর্যন্ত টিকে থাকবেন তিনি।

রাতগুলো অনিদ্রারোগের মতোই লম্বা আর কষ্টকর। আর সকালগুলো দিনকে-দিন দেরি করে-করে আসতে থাকে, আধোয়া জানলার কাচের মধ্যে দিয়ে যেন অনিচ্ছাভরে উঁকি দেয় তারা। আর জানলার দুটো কাঠের ফ্রেমের ফাঁকে পেতে-রাখা তুলোর পটির ওপর জমে থাকে ছাতাপড়া, কালো-কালো গত বছরের হেমন্তের যতসব হলুদ ঝরাপাতা।

কাতেরিনা পেত্রোভ্‌নার মেয়ে আর আত্মীয় বলতে আছে একমাত্র নাস্তিয়া। তা, সে-ও থাকে সুদূর লেনিনগ্রাদে। তার মায়ের সঙ্গে শেষবার দেখা করে যাওয়ার পর ইতিমধ্যে তিন-তিনটে বছর কেটে গেছে।

কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না অবশ্য বোঝেন যে বুড়ো মায়ের কথা ভাবার চেয়ে আরও অনেক জরুরি ভাবনার বিষয় আছে নাস্তিয়ার। আজকালকার দিনে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের নিজস্ব অনেক ব্যাপারস্যাপার, আজগবি

যতসব আগ্রহের বিষয়, নিজস্ব সুখসাধের ব্যাপার থাকে। সে-সবের মধ্যে পারতপক্ষে মাথা না-গলানেই ভালো। একারণেই কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না কদাচিৎ নাস্তিয়াকে চিঠি লেখেন। তবে তিনি মেয়ের কথা ভাবেন কিন্তু প্রত্যেক দিন, পুরনো ধসে-যাওয়া কৌচখানার একটা প্রান্তে চুপটি করে বসে। আর তখন এত চুপচাপ বসে থাকেন তিনি যে নিস্তব্ধতা দেখে মানুষজন ধারে-কাছে নেই ভেবে কখনও-কখনও একটা ইঁদুর চুল্লির পেছন থেকে বেরিয়ে এসে পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে নাক কুঁচকে-কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে ঘরের গুমোট বাতাসটা শুঁকতে থাকে পর্যন্ত।

নাস্তিয়াও চিঠিপত্র বড়-একটা লেখে না মাকে, তবে প্রতি দুই বা তিনমাস অন্তর হাসিখুশি ছোকরা-ডাকপিওন ভাসিলি কাতেরিনা পেত্রোভ্‌নাকে দু'শো রুব্‌লের একটা করে মনিঅর্ডার এনে দেয়। তারপর যাতে তিনি রসিদটাতে ভুল জায়গায় সই করে না-বসেন তার জন্যে সাবধানে তাঁর হাতখানা ধরে ঠিক জায়গাটা দেখিয়ে দেয়।

ভাসিলি চলে যাওয়ার পর হাতের মুঠোয় টাকার নোটগুলো ধরে আনমনা হয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকেন কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না। তারপর একসময় চশমা চোখে দিয়ে মনিঅর্ডারের কাগজখানার উলটোপিঠে লেখা অল্প কয়েকটা কথা পড়তে থাকেন। তবে সেই সংক্ষিপ্ত চিঠির বক্তব্য সবসময় একই রকমের হয়। অর্থাৎ, খুব ব্যস্ত, এমন সময় নেই যে বসে ভালো করে একখানা চিঠি লিখি, বাড়ি যাওয়ার তো কথাই ওঠে না, ইত্যাদি।

কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না সন্তর্পণে নোটের বাণ্ডিলটায় হাত বুলোন এরপর। বয়সের দরুন তিনি ভুলে যান যে ঠিক

ওই নোটগুলোই নাস্তিয়া হাতে করে পাঠায় নি, তাঁর মনে হয় নাস্তিয়ার গায়ে-মাখা সুগন্ধি সেন্টের গন্ধই যেন নোটগুলো থেকে পাচ্ছেন।

অক্টোবরের শেষে একদিন রাত্রে তিনি শুনলেন বাগানের একদম ওধারের কাঠের ফটকটা কে যেন অনবরত ঝাঁকিয়ে চলেছে। ফটকটা বছর-কয়েক আগে থেকেই পেরেক ঠুকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

এ-সময়ে কে আবার ফটক ঠেলছে এই ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে কাতেরিনা পেত্রোভ্না কিছুটা সময় নিয়ে মাথার চারপাশে গরম একখানা রুমাল বাঁধলেন, তারপর পুরনো ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে সে-বছর সেই প্রথম বাড়ির বাইরে বেরোলেন। পথ হাতড়ে-হাতড়ে আস্তে-আস্তে হেঁটে চললেন তিনি। ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়ায় তাঁর মাথা দপদপ করতে লাগল, বহুদিনকার ভুলে-যাওয়া তারাগুলো ক্যাটক্যাট করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল, ঝরাপাতা জমে থাকায় পথ চলতে অসুবিধে হতে লাগল তাঁর।

ফটকের কাছে পেঁছে কাতেরিনা পেত্রোভ্না ফিস্ফিস করে শুধোলেন, 'কে হে বাপু, কে ওখানে?'

কিন্তু ফটকের ওধার থেকে এর কোনো জবাব মিলল না।

'নিশ্চয়ই শুনতে ভুল করেছি,' ভাবলেন কাতেরিনা পেত্রোভ্না। হাতড়ে-হাতড়ে ফের বাড়িতে ফিরে চললেন তিনি।

বুড়ো একটা গাছের কাছাকাছি এসে দম ফেলার জন্যে গাছের ঠাণ্ডা ভিজে একটা ডাল চেপে ধরে দাঁড়ালেন একসময়। আর গাছটাকে দেখেই তিনি চিনতে পারলেন—এটা সেই মেপ্ল গাছ! অনেক—অনেক বছর আগে যখন তিনি নিজে প্রাণচঞ্চল হাসিখুশি তরুণীটি ছিলেন, কথায়-

কথায় খিলখিল করে হেসে উঠতেন যখন, তখন নিজের হাতে এই গাছ তিনি পুঁতেছিলেন। আর এখন এটা ঠান্ডায় হিম হয়ে সবক'টা পাতা খসিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এই আশ্রয়হীন, জোরালো হাওয়ার রাতে কোথাও এর পালিয়ে মাথা বাঁচাবার জায়গা নেই।

মেপ্‌ল গাছটার জন্যে ভারি কষ্ট লাগল তাঁর। গাছের রুক্ষ গুঁড়িটায় একবার হাত বুলিয়ে হাতড়ে-হাতড়ে বাড়ি ফিরলেন তিনি। তারপর সেই রাত্রেই নাস্তিয়াকে একখানা চিঠি লিখতে বসে গেলেন।

লিখলেন, 'প্রাণাধিকাসু মা আমার, এই শীতটা আর আমার কাটবে না। অন্তত একদিনের জন্যে হলেও একটু আয়। একবার তোকে দেখি প্রাণভরে, তোর হাতখানা একবার হাতে ধরি। এত বুড়ো আর দুর্বল হয়ে পড়েছি যে হাঁটাচলা দূরের কথা এমন কি বসতে কিংবা শুতে পর্যন্ত কষ্ট হয়, শরীর ভার-ভার ঠেকে। যমও ভুলে গেছে আমায়। বাগানটা শুকিয়ে গেছে, একদম পাল্‌টে গেছে বাগানটা—অথচ আজকাল আমি ওটা দেখতে পর্যন্ত যেতে পারি না। এবারের হেমন্তকালটা সাংঘাতিক। এত অন্ধকার আর বিষণ্ণ এই হেমন্ত যে মনে হচ্ছে আমার গোটা জীবনের চেয়েও এটা যেন বেশি লম্বা।'

ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে-ফেলতে মানিউশ্‌কা চিঠিখানা ফেলতে গেল পোস্ট-অফিসে। চিঠির বাক্সে চিঠিখানা ফেলার পর বাক্সের ফাঁকটা দিয়ে সে ভেতরে বারবার উঁকি দিল। ব্যাপারটা কী? ওখানে কী আছে? কিন্তু টিনের শূন্যতা ছাড়া ভেতরে আর কিছুই দেখল না সে।

নাস্তিয়া শিল্পী-সঙ্ঘের একজন সেক্রেটারি। শিল্প-প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা ও এই ধরনের নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে তাকে খুব খাটতে হয়।

একদিন যখন সে কাজে ব্যস্ত এমন সময় কাতেরিনা পেত্রোভ্‌নার চিঠিখানা হাতে এল তার। না-পড়েই চিঠিখানা সে হাতব্যাগে ভরে রাখল, ভাবল কাজের পর পড়বে। কাতেরিনা পেত্রোভ্‌নার কাছ থেকে চিঠি পেলে নাস্তিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে থাকে। ভাবে, চিঠি আসছে মানেই মা বেঁচে আছে। আবার সেইসঙ্গে প্রত্যেকখানা চিঠি পাবার পর ওর মধ্যে চাপা একটা অস্বস্তির ভাবও জেগে ওঠে, মনে হয় প্রত্যেকখানা চিঠিই যেন এককেবারের নিঃশব্দ ভর্ৎসনা।

সেদিনকার কাজের পর নাস্তিয়াকে তরুণ ভাস্কর তিমোফেয়েভের স্টুডিওয় যেতে হল তাঁর বাসস্থানের অবস্থা দেখে সে-সম্বন্ধে সঙ্ঘের পর্ষতের কাছে রিপোর্ট পেশ করার জন্যে। এর আগে তিমোফেয়েভ অভিযোগ করেছিলেন যে তাঁর স্টুডিওর ঘরটা ভীষণ ঠাণ্ডা, তাছাড়া সাধারণভাবে তাঁর প্রতি অবহেলা দেখানো হচ্ছে আর শিল্পী হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগও পাচ্ছেন না তিনি।

শিল্পীর ফ্ল্যাটে ওঠার সময় সিঁড়ির একটা বাঁকের চাতালে দাঁড়িয়ে নাস্তিয়া তার কমপ্যাক্টের কৌটোটা বের করে নাকে একটু পাউডার ঘষল তারপর ছোট্ট আয়না থেকে যে ছায়ামূর্তিটি তার দিকে তাকিয়ে আছে তাকে দেখে খুশি হয়ে আপনমনে হাসল একটু। হালকা বাদামি চুল আর বড়-বড় ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ চোখের জন্যে শিল্পীরা ওকে ‘পিঙ্গলা’ বলে ডাকে।

তিমোফেয়েভ নিজে ফ্ল্যাটের দরজা খুললেন। দৃঢ়চেতা,

রাগী, ছোটখাট মানুষটি। গায়ে ওভারকোট আর গলায় প্রকাণ্ড মাফলার জড়িয়ে আছেন তিনি। আর নাস্তিয়া লক্ষ্য করল, উনি পায়ে একজোড়া মেয়েদের ফেল্টবুট পরে আছেন।

'উঁহু, কোট খুলবেন না,' তিমোফেয়েভ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। 'দেখবেন, পশমের জামাসুদ্ধই জমে যাবেন আপনি! আসুন, ভেতরে আসুন।'

অন্ধকার একটা বারান্দা দিয়ে নাস্তিয়াকে নিয়ে এসে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে তারপর সরু একটা দরজা খুলে স্টুডিওতে ঢোকালেন তিনি।

ধোঁয়ার গন্ধে স্টুডিওর বাতাস ভারি হয়ে আছে। মেঝের ওপর প্যারাফিনের স্টোভ জ্বলছে একটা, পাশেই রাখা আছে ভিজে কাদামাটির একটা পাত্র। কয়েকটা টুলের ওপর সাজানো রয়েছে ভিজে কাপড়ে-ঢাকা কয়েকখানা ভাস্কর্যমূর্তি। জানলার বাইরে তেরছা হয়ে বেঁকে আকাশ জুড়ে বরফ পড়ছে। নেভা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না, তার কালো জলে বরফ পড়ে গলে যাচ্ছে। জানলার শার্সির ফাঁকে সোঁ-সোঁ আওয়াজ তুলে বাতাস ঢুকছে আর মেঝের ওপর ছড়ানো পুরনো খবরের কাগজ দিচ্ছে উলটেপালটে।

'ইস্, কী ঠাণ্ডা ঘরটা!' বলে উঠল নাস্তিয়া। দেয়াল-জুড়ে-সাজানো শাদা মার্বেলপাথরের ব্যাস-রিলিফ মূর্তিগুলোর জন্যে ঘরখানা যেন আরও বেশি করে ঠাণ্ডা ঠেকছিল।

'এই-যে, এইখানে বসুন,' বলে মাটিছিটনো একখানা আর্মচেয়ার এগিয়ে দিলেন তিমোফেয়েভ। 'আমি-যে এই কুঠুরিতে বেঁচে আছি এখনও এটাই আশ্চর্য। অথচ পের্‌শিনের স্টুডিওয় যান, দেখবেন হিটারগুলো একেবারে সাহারার গরম ছড়াচ্ছে।'

'পের্শিনকে আপনি তেমন কিছু শিল্পী বলে মনে করেন না, তাই না?'

'শিল্পী কিসের আবার? একেবারে ভুঁইফোঁড়! একদম গতরখাটা-মজুর!' খেপে উঠে বললেন তিমোফেয়েভ। 'ওর গড়া মূর্তিগুলোর কাঁধ তো মানুষের কাঁধ নয়, কোট-ঝোলানোর হ্যাঙার। ওর বানানো যৌথখামারী মেয়ে আসলে এপ্রনচড়ানো গ্রানিটপাথরের আদিবাসী ছুঁড়ি। ওর শ্রমিককে নিয়াণ্ডারথাল মানুষের মতো দেখতে লাগে। কাঠের বেলচা দিয়ে মূর্তি গড়ে ও। তবে লোকটা কিন্তু ভারি ধুরন্ধর, বুঝলেন? একেবারে শেয়ালের মতো ধূর্ত লোকটা।'

প্রসঙ্গটা বদলানোর জন্যে নাস্তিয়া এবার বলল, 'আচ্ছা, আপনার তৈরি গোগলের মূর্তিটা দেখতে পারি একবার?'

'তাহলে ওইদিকে যান,' রূঢ়ভাবে হুকুম দিলেন শিল্পী। 'না-না, ওদিকে নয়! উলটোদিকের কোণে!'

এরপর নিজে এগিয়ে এসে একটা মূর্তির ওপর চাপা-দেয়া ভিজে ন্যাকড়াগুলো তুলে ফেলে চারিদিক থেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন সেটাকে, তারপর প্যারাফিন স্টোভের পাশে গুড়ি মেরে বসে হাতদুটো আগুনতাতে সেঁকতে-সেঁকতে বললেন, 'ইনিই হলেন নিকলাই ভাসিলিয়েভিচ। দেখুন এঁকে, ইচ্ছে হলে।'

দেখে চমকে উঠল নাস্তিয়া। চোখা নাক আর ঢালু কাঁধ নিয়ে একজন মানুষ হালকা কৌতুকের ভঙ্গিতে দেখছেন তাকে, যেন একেবারে তার ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছেন। এমন কি ও যেন দেখতে পেল তাঁর রগের ওপর সরু আর কঠিন একটা শিরা পর্যন্ত দপদপ করছে।

'আর চিঠিখানা পর্যন্ত না-খুলে ব্যাগে রেখে দিয়েছ,'

ও শুনতে পেল গোগলের অন্তর্ভেদী ধারালো চোখদুটো যেন বলছে। 'আচ্ছা লঘুচিত্ত মেয়ে তো তুমি!'

'কী? মূর্তিটা দেখে কী মনে হয়?' শুধোলেন তিমোফেয়েভ।

'এ তো আশ্চর্য সৃষ্টি!' কোনোক্রমে নাস্তিয়া বলল। 'সত্যিকার ওস্তাদের মার!'

শুনে তেতোহাসি হাসলেন তিমোফেয়েভ। নাস্তিয়াকে ভেঙিয়ে বললেন, 'ওস্তাদের মার! তা, সবাই তাই বলে বটে, এ নাকি ওস্তাদের মার। পের্‌শিনও তাই বলে, মাতিয়ানও বলে, হরেক রকম কমিটির বিশেষজ্ঞরাও এই একই কথা বলে। কিন্তু তাতে আমার কী যায়-আসে? এদিকে এটাকে ওরা বলছে ওস্তাদের মার, ওদিকে ভাস্কর হিসেবে আমার ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে যেখানে সেখানে সেই এক পের্‌শিন গোলমেলে ঘোঁতঘোঁত আওয়াজ করছে—ব্যস, ফুরিয়ে গেল। আর পের্‌শিনের ঘোঁতঘোঁত আওয়াজটাই আমার দফারফা করে দিচ্ছে!.. এদিকে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না পর্যন্ত!' কথাগুলো বলতে-বলতে চেঁচাতে লাগলেন তিমোফেয়েভ আর ফেল্টের বুটজোড়া মেঝেয় ঠুকে-ঠুকে স্টুডিওর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত দ্রুত পায়চারি করে চললেন। বললেন, 'ঠাণ্ডা কাদামাটি ঘেঁটে-ঘেঁটে আমার দু'হাতে বাত ধরে গেল। তিন-তিনটে বছর গোগল সম্বন্ধে লেখা প্রত্যেকটি শব্দ তন্নতন্ন করে পড়েছি আমি।'

বলতে-বলতে টেবিল থেকে একপাঁজা বই তুলে নিয়ে দু'হাতে নাড়ালেন তিমোফেয়েভ, তারপর ফের বইগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেন টেবিলে। আর টেবিল থেকে একরাশ জিপ্‌সামের ধুলো উড়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

'এই হল গিয়ে গোগলের ব্যাপার!' বলে হঠাৎ শান্ত হয়ে

গেলেন তিনি। তারপর বললেন, 'কী? ঘাবড়ে দিল্ম নাকি আপনাকে? যদি দিয়ে থাকি তো ক্ষমা চাইছি, কিন্তু ব্ঝলেন, সত্যি কথা বলতে কী, লড়াই করার জন্যে খেপে উঠেছি আমি।'

'ঠিক আছে, আপনার হয়ে আমরা দ্'জনেই না-হয় লড়াই করব,' বলে দাঁড়িয়ে উঠল নাস্তিয়া।

সজোরে হাত চেপে ধরে তার করমর্দন করলেন তিমোফেয়েভ। প্রতিভাবান মান্ষটিকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ও তিমোফেয়েভের বাড়ি ছাড়ল।

সঙ্ঘের অফিসে ফিরে এসেই নাস্তিয়া সঙ্ঘের সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে গেল। অবিলম্বে তিমাফেয়েভের ভাস্কর্যের একটা প্রদর্শনীর অন্ষ্ঠান করাটা-যে কত গ্র্ত্বপূর্ণ তা বোঝাতে আর তা নিয়ে তর্ক করতে অনেকটা সময় কাটাল সে সভাপতির অফিসঘরে। সভাপতি টেবিলের ওপর পেন্সিলের টোকা দিতে-দিতে কিছ্ক্ষণ গ্ঁইগাঁই করে অবশেষে নাস্তিয়ার প্রস্তাবে রাজি হলেন।

অতঃপর বাড়ি ফিরল নাস্তিয়া। মোইকা বাঁধের ওপর ছাদে গিল্টি-করা প্লাস্টারের প্রলেপ-দেয়া তার সেকেলে ঘরখানায় ফিরে অবশেষে কাতেরিনা পেত্রোভ্নার চিঠিখানা পড়ার ফুরসত পেল সে।

'কিন্তু এখন তো আমি যেতে পারব না,' বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল সে। 'কেউই আমায় যেতে দেবে না এখন।'

ভিড়ে-থইথই ট্রেনের কামরা, ট্রেন বদলে ছোট-লাইনের ট্রেনে চাপা, তারপর ঘোড়ার গাড়িতে ঝাঁকুনি খেতে-খেতে যাওয়া, বাড়ির শ্কনো বাগানটা, মায়ের সেই এক চোখের জল ফেলা, গাঁয়ের সেই ক্লান্তিকর, নিরবচ্ছিন্ন একঘেয়ে

জীবন — এইসব দৃশ্য একের-পর-এক মনে পড়ে গেল তার। চিঠিখানা সে টেবিলের ড্রয়ারে পুরে রাখল।

এরপর পুরো দুটো সপ্তাহ তিমোফেয়েভের প্রদর্শনী সংগঠনের কাজে ব্যস্ত রইল নাস্তিয়া।

এই সময়টায় বদমেজাজী শিল্পীর সঙ্গে তার ক্রমান্বয়ে ঝগড়া করা আর ঝগড়া মিটিয়ে নেয়ার পালা চলল। প্রদর্শনীতে সাজানোর জন্যে তিমোফেয়েভ তাঁর ভাস্কর্যগুলো এমনভাবে বাঁধাছাঁদা করছিলেন যে মনে হচ্ছিল সেগুলো যেন আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতে চলেছেন।

'কিছুতেই কিছু হবে না, বুঝলেন সুন্দরী,' এমন বিদ্বেষ নিয়ে নাস্তিয়াকে কথাগুলো বললেন তিনি যে মনে হল সে যেন তাঁর নয় ওর নিজেরই কোনো প্রদর্শনীর আয়োজন করতে চলেছে। বললেন, 'আমি বলে রাখছি, দেখবেন। মিথ্যে-মিথ্যে সময় নষ্ট করছি শুধু।'

প্রথম-প্রথম এ-সমস্ত কথায় নাস্তিয়া ভারি বিরক্ত হোত, চটেও উঠত সময়-সময়, কিন্তু পরে ও বুঝল যে তিমোফেয়েভের এই খামখেয়ালিপনা আসলে ভান ছাড়া কিছু নয়, প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হতে চলেছে বলে লোকটি কিন্তু মনে-মনে খুশিই হচ্ছেন।

প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হল একদিন সন্ধেবেলায়। এতেও তিমোফেয়েভের প্রবল আপত্তি ছিল, চটেমটে তিনি জানিয়েছিলেন যে ভাস্কর্য-শিল্প ইলেক্‌ট্রিক বাতির আলোয় দেখা চলে না।

'একদম মরা আলো, সবকিছু নষ্ট করে দেয়!' ঘোঁতঘোঁত করে বলেছিলেন তিনি। 'এর চেয়ে প্যারাফিনের বাতি জ্বাললেও ভালো ছিল।'

'তাহলে কী ধরনের আলো চান আপনি, বলুন? সত্যি,

আপনাকে নিয়ে চলা অসম্ভব!’ চটে উঠে নাস্তিয়া বলেছিল।

‘কেন? মোমবাতি! আমি বলছি, মোমবাতি জ্বালুন!’ যন্ত্রণায় যেন গোঁ-গোঁ করতে-করতে বলেছিলেন তিমোফেয়েভ। ‘গোগলকে কখনোই ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বের নিচে রাখা চলে না! একেবারেই অসম্ভব তা!’

দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসবে উপস্থিত ছিলেন যতসব ভাস্কর আর চিত্রশিল্পী। উৎসবে ভাস্কররা যা বললেন তা শুনলে শিল্পব্যাপারে অনভিজ্ঞ লোকজনের পক্ষে বুঝে-ওঠা মুশকিল হোত যে তাঁরা আসলে তিমোফেয়েভের শিল্পসৃষ্টির প্রশংসা করছেন না নিন্দে করছেন। তিমোফেয়েভ নিজে অবশ্য বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

উত্তেজনাপ্রবণ একজন পাকাচুলো চিত্রী নাস্তিয়ার কাছে এসে তার হাতখানা ধরে চাপড়ে দিলেন। বললেন, ‘ধন্যবাদ। আমি শুনেছি আপনিই এই কাণ্ডটা করেছেন, তিমোফেয়েভকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসেছেন। দারুণ কাজ করেছেন আপনি! জানেন তো, আমাদের মধ্যে অনেক লোক আছে যারা এমনভাবে কথা বলবে যে মনে হবে শিল্পীদের জন্যে দরদে বুঝি রাত্রে তাদের ঘুম নেই, সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা আর কতকিছু নিয়েই-না কথা বলবে তারা, কিন্তু যখন হাতে-কলমে শিল্পীদের জন্যে কিছু করার দরকার হবে, তখন দেখবেন আপনার সামনে খাড়া দেয়াল, মাথা কুটে মরলেও তখন কিছু হবে না। যা করেছেন তার জন্যে ফের একবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই!’

এরপর আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হল। অনেকেই বক্তৃতা দিলেন প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে, আবেগকম্পিত গলায়,

আর এই তরুণ আর অকারণে অন্যায়ভাবে অবহেলিত ভাস্করের জন্যে দরদ দেখানো সম্বন্ধে বৃদ্ধ শিল্পীটি ইতিপূর্বে যা বলেছিলেন প্রত্যেকটি বক্তৃতাতেই তার পুনরুক্তি শোনা গেল।

নকশা-করা কাঠের মেঝের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে গুটিসুটি মেরে চেয়ারে বসে ছিলেন তিমোফেয়েভ। তবে তিনি সারাক্ষণ থেকে-থেকে আড়চোখে বক্তাদের দিকে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিলেন সত্যিই তাঁদের কথা বিশ্বাস করা চলে কিনা, নাকি এখনও তা যাচাই করার সময় আসে নি।

একসময় সভার ঘরের দোরগোড়ায় এসে উঁকি দিল সঙ্ঘের সংবাদবাহিকা দাশা। স্নেহশীলা, তবে একটু মোটা মাথা মেয়েটির। দরজায় দাঁড়িয়ে সে ইঙ্গিতে ডাকল নাস্তিয়াকে। নাস্তিয়া উঠে ওর কাছে যেতে একগাল হেসে দাশা তার হাতে একখানা টেলিগ্রামের কাগজ ধরিয়ে দিল।

নিজের জায়গায় ফিরে এসে চুপিচুপি মোড়কটা ছিঁড়ে টেলিগ্রামখানা পড়ল নাস্তিয়া, কিন্তু মাথামুণ্ড কিছুই বুঝল না। টেলিগ্রামে লেখা: 'কাতিয়া মরণাপন্ন। তিখন।'

'কাতিয়া কে আবার?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নাস্তিয়া ভাবল। 'তিখনই-বা কে? এটা নিশ্চয়ই আর কারও টেলিগ্রাম।'

উল্টেপাল্টে কার নাম-ঠিকানায় টেলিগ্রামটা এসেছে তা দেখল সে। টেলিগ্রামটা যে তারই নামে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এতক্ষণে তার নজরে পড়ল কাগজের ফিতের ওপর টাইপ-করা সরু-সরু হরফগুলো। দেখল, লেখা আছে 'জাবোরিয়ে'।

হাতের মুঠোয় টেলিগ্রামের কাগজখানা মুচড়ে ধরে ভুরু কোঁচকাল নাস্তিয়া। তখন পের্শিন বলতে উঠেছেন।

অল্প-একটু দুলে-দুলে আর হাত দিয়ে চোখের চশমাজোড়া ঠিক করতে-করতে পের্‌শিন বলে চলেছেন, ‘আমাদের একালে মানুষের জন্যে দরদের ব্যাপারটা চমৎকার একটা বাস্তব ঘটনা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর তার ফলে আমাদের কাজকর্মে আর মানুষ হিসেবে বিকাশে সাহায্যও হচ্ছে প্রচুর। আমাদের মাঝখানে, আমাদের ভাস্কর আর চিত্রীদের মধ্যেও এই দরদের প্রকাশ লক্ষ্য করে আমি সত্যিই সুখী। কমরেড তিমোফেয়েভের শিল্পকর্মের এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের কথাটাই ধরা যাক। এই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানের জন্যে আমরা পুরোপুরি ঋণী (আমাদের পর্ষত-সদস্যদের প্রতি কটাক্ষ করে কিন্তু মোটেই একথা বলছি না) সঙ্ঘের একেবারে সাধারণ স্তরের একজন কর্মচারির কাছে। তিনি হলেন আমাদের সকলের প্রিয়পাত্রী আনাস্তাসিয়া সেমিওনভ্‌না।’

এই বলে পের্‌শিন নিচু হয়ে নাস্তিয়াকে অভিবাদন জানালেন আর সকলে হাততালি দিয়ে উঠল। এই হাততালি আর হর্ষধ্বনি স্থায়ী হল কিছুক্ষণ। নাস্তিয়ার চোখে জল এসে গেল এই সংবর্ধনায়।

এমন সময় পেছন থেকে কে যেন নাস্তিয়ার বাহুতে আঙুল ছুঁইয়ে ডাকল। নাস্তিয়া ফিরে দেখল, ডাকছেন সেই উত্তেজনাপ্রবণ বৃদ্ধ শিল্পী। নাস্তিয়ার হাতের দোমড়ানো টেলিগ্রামখানার দিকে তাকিয়ে তিনি ফিস্‌ফিস করে বললেন, ‘কী খবর ওতে? খারাপ কিছু নাকি?’

‘না,’ ফিস্‌ফিসিয়ে জবাব দিল নাস্তিয়াও। ‘এমনিই একটা... জানাশুনো একজনের কাছ থেকে...।’

‘ও,’ থতমত খেয়ে বৃদ্ধ বললেন, তারপর ফের মন দিলেন পের্‌শিনের বক্তৃতা শোনায়।

সভার সকলেই তাকিয়ে ছিল পের্‌শিনের দিকে, কিন্তু নাস্তিয়ার সারাক্ষণই মনে হচ্ছিল কে যেন একাগ্র, তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে ওকে। অস্বস্তি বোধ করলেও লোকটা-যে কে মাথা তুলে তা দেখতে ওর ভয় করছিল। মনে-মনে ভাবছিল, 'কে হতে পারে লোকটা? কেউ কি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারল নাকি? আচ্ছা, কী বোকার মতো ভাবছি! আমার নার্ভের অবস্থা ভালো নয় দেখছি।'

অবশেষে অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলে চোখদুটো তুলল ও, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার চোখ ফিরিয়ে নিল। একমুহূর্ত তাকিয়েই ও দেখতে পেয়েছিল গোগল ওর দিকে তাকিয়ে আছেন বিদ্রূপভরা চোখে। রগের ওপর সেই সরু শক্ত শিরাটা যেন সজোরে দপদপ করছে মনে হল, আর নাস্তিয়া শুনল দাঁতে দাঁত চেপে আস্তে-আস্তে বিড়বিড় করে তিনি বলছেন, 'কী? এবার নিজের স্বপক্ষে তোমার কী বলার আছে?'

তাড়াতাড়ি নাস্তিয়া উঠে পড়ল, তারপর হল ছেড়ে বেরিয়ে এল। লবিতে দাঁড়িয়ে তাড়াহুড়ো করে ওভারকোটটা পরে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

আকাশ থেকে তুষার পড়ে গলে যাচ্ছে। পাঁশুটেরঙের বরফকণা জমে আছে সন্ত ইসাকের ক্যাথিড্রালের দেয়ালে। মেঘে-ঢাকা আকাশ নিচু হয়ে ক্রমশ যেন নেমে আসছে শহরের ওপর, নাস্তিয়ার ওপর, নেভা নদীর ওপর।

'প্রাণাধিকাসু,' শেষ চিঠির সম্বোধনটা মনে পড়ল নাস্তিয়ার। 'প্রাণাধিকা!'

নৌবাহিনীর সদর দপ্তরের কাছের পার্কে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল নাস্তিয়া। তারপর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল আকুলভাবে। ওর গালের ওপর তুষারের গুঁড়ো পড়ে

গলে গিয়ে তা মিশে যেতে লাগল চোখের জলের সঙ্গে।

বসে থাকতে-থাকতে ঠান্ডায় কাঁপুনি ধরে গেল। আর একেবারে হঠাৎই ওর মনে হল সেই নিঃসঙ্গ জাবোরিয়েতে সবার পরিত্যক্ত অথর্ব বুড়ো মানুষটা ওকে যতখানি ভালোবাসেন এমন আর কেউ ভালোবাসে না, ভালোবাসে নি কোনোদিন।

'নাঃ, বড্ড দেরি হয়ে গেছে! মা-মনিকে আর আমি দেখতে পাব না কোনোদিন,' নিজের মনেই বলল নাস্তিয়া। আর ওর খেয়াল হল গত এক বছরে এই প্রথম ও বাচ্চা বয়সের আদরের ডাক 'মা-মনি' কথাটা উচ্চারণ করল।

লাফিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি পা চালাল ও। প্রচন্ড বেগে মুখে ঝাপট মারতে লাগল ঝরা-তুষার।

'এ কী হল, মা-মনি? এ কী হল?' ভাবছে ও। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। 'মা-মনি! কী করে হল এমনটা? আমার-যে আপন বলতে আর কেউ নেই। তোমার চেয়ে বেশি প্রিয় আর-যে কেউ নেই আমার, কেউ কখনও হবেও না। আহ্, যদি আমি ঠিক সময়ে পেঁছিতে পারি, যদি তিনি আমায় দেখতে পান, আমায় ক্ষমা করেন!'

নাস্তিয়া নেভ্স্কি প্রস্পেক্টে এসে পড়ল, তারপর শহরের রেলওয়ে স্টেশনের দিকে চলল।

কিন্তু অনেক দেরি করে ফেলেছে সে। সেদিন রাত্রের ট্রেনের আর কোনো টিকেট নেই।

বুকিং কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নাস্তিয়া, ঠোঁট কাঁপছে, কথা বলতে পারছে না। ওর মনে হচ্ছে, মুখ খুললেই বুঝি হাউহাউ করে কেঁদে উঠবে।

বুকিং কাউন্টারের ওধারে-বসা বয়স্কা মহিলাটি ফোকরের মধ্যে দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলেন:

‘কী ব্যাপার? কী হল আপনার?’ তাঁর কথায় বিরক্তি প্রকাশ পেল।

‘কিছু না,’ নাস্তিয়া বলল। ‘আমার মা...।’ হঠাৎ পিছু ফিরে বাইরের দরজার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলল ও।

‘আরে, দাঁড়ান একমিনিট!’ পেছন থেকে হেঁকে বললেন মহিলাটি। ‘গোড়াতেই একথা বলা উচিত ছিল আপনার।’

ওই রাত্রেই শহর ছাড়ল নাস্তিয়া। ‘রক্তশায়ক’ নামের এক্সপ্রেস ট্রেনটি একেবারেই চলছে বলে মনে হচ্ছিল না ওর, যদিও ট্রেন কিন্তু ছুটে চলেছিল তীব্রবেগে রাতের অন্ধকারে-ঢাকা বনজঙ্গল চিরে, শাদা ধোঁয়ার মেঘ ছড়িয়ে দিয়ে চতুর্দিকে আর সতর্কতাজ্ঞাপক চিল-চিৎকারে বাতাস ছিঁড়েখুঁড়ে।

...টেলিগ্রাম করার জন্যে পোস্ট-অফিসে আসার পর তিখন প্রথমেই ডাকপিওন ভাসিলির সঙ্গে চুপিচুপি কিছুক্ষণ পরামর্শ করে নিল। তারপর টেলিগ্রামের একখানা ফর্ম নিয়ে উলটেপালটে দেখে অনেকক্ষণ সময় কাটাল আঁকাবাঁকা অক্ষরে কথাক’টা লিখতে। লেখার ফাঁকে-ফাঁকে থেকে-থেকে ঘনঘন জামার হাতায় গোঁফজোড়া মুছতে হল ওকে। তারপর সাবধানে ফর্মখানা ভাঁজ করে টুপির কাপড়ের ফাঁকে গুঁজে নিল আর পা চালাল কাতেরিনা পেত্রোভ্না‌র বাড়ির দিকে।

দশদিন হয়ে গেল কাতেরিনা পেত্রোভ্না শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। আর কিছু কষ্ট হচ্ছে না তাঁর, কেবল সাংঘাতিক একটা দুর্বলতা বুক, মাথা আর পা’দুটোর ওপর চেপে বসেছে, এমন কি দম নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

গত ছ’দিন ধরে মানিউশ্‌কা তাঁর বিছানার পাশে-পাশে রয়েছে। রাত্রে জামাকাপড় না-খুলেই সে শুয়ে থাকে ধসে-

যাওয়া কৌচখানার ওপর। কখনও-কখনও মনে হয় তার কাতেরিনা পেত্রোভ্না‌র বুঝি নিশ্বাস পড়ছে না। তখন ভয় পেয়ে সে কান্নাভরা নাকীসুরে ডাকতে থাকে, 'ঠাকমা? ও ঠাকমা? বেঁচে আচ তুমি?'

ডাক শুনে কম্বলের তলায় কাতেরিনা পেত্রোভ্না হাতখানা নাড়াতে আশ্বস্ত হয় মানিউশ্‌কা।

সারাদিন ধরে ঘরগুলোয় লেপটে থাকে নভেম্বরের গোধূলির আবছা আলো, তবে মানিউশ্‌কা নিয়মিত চুল্লি জ্বালানোয় গরম থাকে ঘরগুলো। চনমনে আগুনের আলো যখন গাছের গুঁড়ি-দিয়ে-তৈরি দেয়ালগুলোয় খেলা করে বেড়ায় তখন চুপিচুপি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন কাতেরিনা পেত্রোভ্না। ভাবেন, ঘরগুলো কেমন আরামদায়ক আর বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে, যেমন ছিল এগুলো সেই অনেক—অনেকদিন আগে যখন নাস্তিয়া থাকত এখানে। কাতেরিনা পেত্রোভ্না চোখ বন্ধ করে ফেলেন আর একফোঁটা জল চোখের কোণ দিয়ে বেরিয়ে হলদে-হয়ে-যাওয়া রগ বেয়ে নেমে এসে জড়িয়ে যায় তাঁর পাকা চুলের রাশে।

তিখন ঘরে ঢোকে। অনবরত কাশতে আর নাক ঝাড়তে থাকে সে, বোঝা যায় কোনো একটা ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

'কী ব্যাপার, তিখন?' দুর্বলকণ্ঠে শুধোন কাতেরিনা পেত্রোভ্না।

'না, এই বলচি কী, ঠাণ্ডা বাড়চে কেরমে-কেরমে কাতেরিনা পেত্রোভ্না,' হাতে-রাখা টুপিটার দিকে চিন্তিতভাবে তাকাতে-তাকাতে তিখন দ্রুত কথা বলে যায়। 'শিগগির বরফ পড়বে মনে লিচ্চে। যদি বলেন তাতে কী, তো বলি বরফ চটপট পড়ে যাওয়াই ভালো। কেনে? না

এয়াতে রাস্তার জলকাদা জমে শক্ত হয়ে যাবে-নে আর ওয়ার পক্ষে এখেনে আসা সহজ হবে।'

'কার পক্ষে বললে?' বলতে-বলতে কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না চোখ মেলে তাকান আর তাঁর শুকিয়ে-যাওয়া স্থবির হাতখানা প্রচন্ডভাবে কাঁপতে-কাঁপতে গায়ের কম্বলখানায় চাপড় দিতে থাকে।

'কেনে, নাস্তাসিয়া সেমিওনভ্‌নার পক্ষে,' বাঁকাহাসি হেসে বলল তিখন আর টুপি থেকে টেলিগ্রামখানা টেনে বের করল। 'আবার কার?'

শুনে কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না ধড়মড় করে উঠে বসার চেষ্টা করলেন, কিন্তু না-পেরে ফের ধপ করে শুয়ে পড়লেন বালিশের ওপর।

'এই-যে, টেলিগেরাফ এয়েচে,' বলল তিখন, তারপর সাবধানে টেলিগ্রামের ফর্মখানার ভাঁজ খুলে ওঁর দিকে মেলে ধরল।

কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না অবশ্য টেলিগ্রামখানা নিলেন না, কেবল অনুনয়ভরা চোখে তাকিয়ে রইলেন তিখনের দিকে।

'ওঁরে টেলিগেরাফ পড়ে শোনাও না কেনে,' ধরাগলায় মানিউশ্‌কা বলে উঠল। 'ওনি আর পড়তে লারেন। চোখদুটো একবারে গ্যাচে।'

পাছে কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিল তিখন, তারপর জামার কলারটা ঠিক করে, মাথার বিরল লাল চুলে একবার হাত বুলিয়ে ফাঁপা আর কাঁপা-কাঁপা গলায় পড়ল: 'এখুনি আসচি। ইতি আপনারই আদরের মেয়ে নাস্তিয়া।'

'থাক, থাক, তিখন,' ফিস্‌ফিস করে বলে উঠলেন কাতেরিনা পেত্রোভ্‌না। 'নক্ষী ভাই আমার, থাক। ভগবান

তোমার মঙ্গল করুন। তোমার এই দয়া দেখানোর জন্যে, এই ভালোমানুষির জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

কষ্ট করে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে পাশ ফিরে শুলেন কাতেরিনা পেত্রোভ্না। তারপর যেন ঘুমিয়ে পড়লেন বলে মনে হল।

ঘরের বাইরে ঠান্ডা দালানটায় একটা বেঞ্চিতে বসে মাথা নিচু করে সিগারেট টানতে লাগল তিখন। আর থেকে-থেকে থুথু ফেলতে আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে লাগল। অবশেষে একসময় মানিউশ্কা বেরিয়ে এসে তাকে কাতেরিনা পেত্রোভ্নার ঘরে যেতে ডাকল।

পা টিপে-টিপে ঘরে ঢুকে হাত দিয়ে মুখখানা একবার মুছল তিখন। দেখল, কাতেরিনা পেত্রোভ্না ফ্যাকাশে আর ছোট্ট দেহটি এলিয়ে শুয়ে আছেন বিছানায়, যেন শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন।

'তাইলে মেয়েরে দেখার জন্যে ওনি আর থাকলেন না,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'বেচারা, অনেক কষ্ট পেয়ে গেলেন।' তারপর মানিউশ্কার দিকে তাকিয়ে কেন যেন চটে উঠে বলল, 'এই হাবা মেয়ে, শোন্। ভালো ব্যাভার দে দয়ার ঋণ এট্টু শোধ কর্ দিনি। আমি যতক্ষণ গেরাম-সোভিয়েতে খবর দে ফিরে না-আসি ততক্ষণ এখেনে এট্টু চৌকি দে দিনি।'

তিখন চলে গেল, আর মানিউশ্কা একটা টুলের ওপর হাঁটুদুটো জড়ো করে তুলে বসে-বসে শিউরে উঠতে লাগল আর একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কাতেরিনা পেত্রোভ্নার দিকে।

পরদিন কাতেরিনা পেত্রোভ্নাকে কবর দেয়া হল। তখন ঠান্ডা নেমে গেছে হিমাঙ্কের নিচে, হালকা একপশলা

বরফও পড়ে গেছে ইতিমধ্যে। তবু দিনটা ছিল আগের চেয়ে উজ্জ্বল আর আকাশটা স্যাঁতসেঁতে নয়, শুকনো, আর মেঘে ভারি নয়, অপেক্ষাকৃত হালকা। তবু তা এমন পাঁশুটে হয়ে ছিল যে মনে হচ্ছিল মাথার ওপর যেন সদ্য-কাচা, জমাট, কোরা কাপড়ের একখানা চাঁদোয়া টাঙানো। নদীর ওপারে মাঠের বিপুল বিস্তার তখন হালকা পাঁশুটে রঙ ধরে আছে আর সেখান থেকে সদ্য-ঝরা তুষারের আর প্রথম বরফের ঘা-খাওয়া উইলোর বাকলের কটু, মনোরম গন্ধ ভেসে আসছে।

অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিয়েছে বৃদ্ধারা আর বাচ্চারা। কবরখানায় কফিন বয়ে নিয়ে চলেছে তিখন, ভাসিলি আর মালিয়াভিনরা দুই ভাই। মালিয়াভিনরা দু'জনেই বুড়ো আর তাদের দেখলে মনে হয় সারা গায়ে যেন তাদের শণের ফেঁসোর ঘন জঙ্গল গজিয়েছে। ভাই ভলোদিয়ার সঙ্গে মানিউশ্‌কা কফিনের ঢাকনিটা বয়ে নিয়ে চলেছে, আর চোখের পলক না-ফেলে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

কবরখানাটা গাঁয়ের ঠিক বাইরে, নদীর পাড়ের ওপর। সেখানে রয়েছে হলদে ছাতায়-ভরা লম্বা-লম্বা ক'টা উইলোগাছ।

যাওয়ার পথে রাস্তায় শোভাযাত্রীদের সঙ্গে ইশ্‌কুলের শিক্ষিকার দেখা হয়ে গেল। আঞ্চলিক সদর শহর থেকে সবেমাত্র মেয়েটি এসেছে, এখনও গাঁয়ের কারও সঙ্গে তেমন আলাপ-পরিচয় হয় নি।

ওকে দেখে ইশ্‌কুলের ছেলেরা কানাকানি করতে লাগল, 'এই, দিদিমনি এয়েচেন রে, দিদিমনি!'

মেয়েটির নিতান্ত অল্প বয়স, প্রায় বাচ্চা বললেই চলে।

লাজ্বক আর কটাচোখো মেয়েটি। অন্ত্যেষ্টির শোভাযাত্রা যাচ্ছে দেখে ভীর্-ভীর্ চলনে দাঁড়িয়ে গেল সে, আর ভয়ে-ভয়ে কফিনে-শোয়ানো ছোটখাট চেহারার বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে রইল। কাঁটা-কাঁটা তুষারের ফলক বৃদ্ধার ম্বখে পড়ে জমে থাকছিল, গলছিল না। শিক্ষিকার মনে হল, আঞ্চলিক সদরে সে-ও তার মা-কে রেখে এসেছে, এমনি ছোটখাট দেখতে, এমনি পাকাচুলে-ভরা মাথা, আর মেয়ের জন্যে সারাক্ষণই বিষম দ্বশ্চিন্তিত তার মা।

প্রথমটায় একটু ইতস্তত করল শিক্ষিকা-মেয়েটি, তারপর আস্তে-আস্তে শোভাযাত্রার পিছ্বপিছ্ব চলল। বৃদ্ধা মহিলারা আড়চোখে মেয়েটিকে দেখে নিজেদের মধ্যে এই বলে কানাকানি করতে লাগল যে মেয়েটিকে দেখে তো ভারি শান্তশিষ্ট মনে হচ্ছে, বাচ্চাদের সামাল দেয়া গোড়ায়-গোড়ায় ওর পক্ষে হয়তো বেশ কঠিনই হবে। জাবোরিয়ের বাচ্চারা আবার যা দ্বরন্ত, যা দস্যি!

শিক্ষিকাটি অবশেষে পাশের একজন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস না-করে পারল না, 'উনি বোধহয় একাই ছিলেন, তাই না?'

প্রশ্নটা করেছিল সে গাঁয়ের মাত্রিয়োনা-দিদিমাকে। মাত্রিয়োনা সঙ্গে সঙ্গে প্যাঁচাল পেড়ে বসলেন, 'তা, বাছা, তেমনটাই বলতে পার বৈকি। ভারি ভালো, মায়াবী ব্বড়ো মান্বষটে ছেলেন গো, এমন ভালো নোক সচরাচর দেখা যায় না। আর মান্বষটে সারা দিনমান থাপন জ্বড়ে বসে থাকতেন কৌচের ওপর, কথা-যে বলবেন এমন কাকপক্ষীটেও ছেল না গো। আহা, কী কষ্টের জেবন গ্যাচে! এট্টা অবিশ্যি মেয়ে আচে ওনার লেনিনগ্রাদে, তা সে বার-দ্বনিয়ায় ঠাঁই করে নেচে বলে মনে লিচ্চে। ব্বড়ো মান্বষ পেরানটা ত্যাগ

করলেন এখেনে একদম একা, আত্মীয়বান্ধব বলতে কেউ কাচে ছেল না গো।'

কবরখানায় পেঁছে বাহকরা কফিনটাকে সদ্য-খোঁড়া একটা কবরের পাশে নামিয়ে রাখল। বৃদ্ধারা রোদেপোড়া হাতগুলো মাটিতে ছুঁইয়ে অভিবাদন জানাল কফিনকে। শিক্ষিকা-মেয়েটি কফিনের কাছে এসে নিচু হয়ে কাতেরিনা পেত্রোভ্‌নার শুকনো হলদেটে হাতে চুমু দিল। তারপর দ্রুত সোজা হয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াল আর হেঁটে চলে গেল কবরখানার ভেঙে-পড়া ইটের পাঁচিলটার কাছে।

ওইদিকটাতেই হাওয়ায়-ওড়া হালকা বরফের গুঁড়োয় ঢেকে আছে তার প্রাণের প্রিয়, একটু বুঝি-বা বিষণ্ণই, তার জন্মস্থান শহরটা।

অনেকক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি। শুনতে লাগল—পেছনদিকে বুড়োবুড়িরা নিজেদের মধ্যে একটু-আধটু কথাবার্তা বলছে, কফিনের ঢাকার ওপর মাটির চাপড়া ফেলা হচ্ছে আর দূরে বেখাপ্পাভাবে মোরগ ডাকছে এই জানান দিয়ে যে সামনে রয়েছে স্বচ্ছ দিন, হালকা তুষারপাত আর শীতের তুহিন স্তব্ধতা।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হবার পর দ্বিতীয় দিনে নাস্তিয়া এসে পেঁছল জাবোরিয়েতে। আসার পর সে দেখতে পেল শুধু কবরখানায় ঠান্ডায়-জমাট মাটির চাঙড় চাপা-দেয়া নতুন কবরের ঢিপিটা আর কাতেরিনা পেত্রোভ্‌নার ঠান্ডা, অন্ধকার ঘরখানা। মনে হল ঘরখানা থেকে যেন বহু-বহু আগে জীবনের সকল লক্ষণ ধুয়েমুছে দূর হয়ে গেছে।

সেই ঘরে সেদিন সারাটা রাত কেঁদে-কেঁদে কাটাল

নাস্তিয়া, যতক্ষণ-না বিরস মেঘলা ভোরের আলো জানলাগ্লোয় ফিকে রঙের আভাস দিল।

চুপিচুপি সেই ভোরবেলাতেই জাবোরিয়ে ছাড়ল নাস্তিয়া, যাতে কেউ তাকে দেখতে না-পায় বা কিছু জিজ্ঞেস করতে না-পারে। ওর মনে হচ্ছিল একমাত্র কাতেরিনা পেত্রোভ্না ছাড়া আর কেউ অক্ষালনীয় অপরাধের দুর্বহ ভার থেকে ওকে মুক্ত করতে পারবে না।

১৯৪৬

রাশিয়ার হৃৎকেন্দ্রে

রচনা-সংক্রান্ত নিয়মাবলীর বইয়ে যে-সমস্ত 'লৌহকঠিন' কিংবা 'স্বর্ণময়' নিয়মকানুনের কথা বলা আছে তার একটিও নিয়ম নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা না-ঘামিয়ে লেখকরা কখনও-সখনও এক-আধটা গল্প লিখতে চান। ওই সমস্ত নিয়মকানুন অবশ্য খুবই চমৎকার। লেখকের অস্পষ্ট যতসব ধ্যানধারণাকে ওইসব নিয়ম যথাযথ চিন্তার খাতে বইয়ে দেয় আর তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় চরম পরিণতির বা বইয়ের সমাপ্তির দিকে, ঠিক যেমনভাবে নদী তার জলভার বয়ে নিয়ে যায় প্রশস্ত মোহানার অভিমুখে।

তবে সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে সব নিয়মকানুন-যে ঠিকমতো লিপিবদ্ধ করা গেছে তা কিন্তু নয়। লেখকের ধ্যানধারণাকে প্রকাশ করার এমন বহু কার্যকর উপায় ও পদ্ধতি আছে যা এখনও নিয়মের তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয় নি।

যেমন, বছর-কুড়ি আগে মস্কোয় বৃষ্টি নিয়ে পরীক্ষামূলক একখানি ফিল্‌ম তোলা হয়। এটি শুধুমাত্র ফিল্‌ম-শিল্পের সঙ্গে জড়িত লোকজনকেই দেখানো হয় তখন। ভয় ছিল, পাছে সাধারণ দর্শকদের ছবিটি দেখালে তাদের কাছে

তা ক্লান্তিকর ঠেকে আর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে না-পেরে পাছে তারা প্রেক্ষাগার ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

ছবিটিতে সম্ভাব্য যত রকমের দৃষ্টিকোণ থেকে বৃষ্টিপড়া দেখানো হয়। যেমন, শহরের কালো অ্যাস্‌ফল্টের ওপর বৃষ্টিপাত, গাছের পাতায় বৃষ্টিপাত, বৃষ্টিপাত দিনে আর রাতে, প্রবল ধারাবর্ষণ, থেকে-থেকে একেক পশলা বৃষ্টি, ইলসেগুঁড়ি বৃষ্টি, রোদ্দুর আর বৃষ্টি একসঙ্গে, নদীর জলের ওপর বৃষ্টি, সমুদ্রের ওপর বৃষ্টি, রাস্তার বা মাঠের খোঁদলে-জমা জলে বুদ্বুদের বিস্ফোরণ, মাঠঘাটের ওপর দিয়ে ছুটে-যাওয়া বৃষ্টিভেজা ট্রেন, নানাধরনের বৃষ্টির মেঘ এবং আরও অনেক-কিছু যা নিয়ে এখানে আমার বাগ্‌বিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

এই ছবিখানি বহুদিন পর্যন্ত আমার মনে জীবন্ত হয়ে ছিল, আর সাধারণ বৃষ্টিপাতের মধ্যে যে-আশ্চর্য কাব্য লুকনো আছে সে-সম্বন্ধে আগের চেয়ে অনেক বেশি তীব্রভাবে সচেতন করে তুলেছিল আমাকে। একপশলা বৃষ্টির পর ধুলোভরা রাস্তার টাটকা সোঁদা গন্ধ অন্য অনেকের মতো আমার মনও-যে মাতিয়ে তুলত না তা নয়, তবে আমি আগে কখনও মন দিয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনি নি কিংবা বৃষ্টিভেজা বাতাসে অনুজ্জ্বল প্যাস্টেল-রঙের বর্ণালি লক্ষ্য করি নি।

প্রত্যেক গদ্যলেখকের একই সঙ্গে কবিও হওয়া দরকার। আর কোনো লেখকের পক্ষে একেবারে আশেপাশেই কবিতার এমন সব নতুন-নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কারের চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে, যা নাকি বস্তুনিচয় সম্পর্কে তার বোধ, চেতনা ও স্মৃতিকে সমৃদ্ধ করে তোলে?

আসলে এত কথা বলার উদ্দেশ্য—এই গল্পের বিষয়বস্তু

আমার ওপর কড়া যে-সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চলার দায় চাপাতে চাইছে তা এড়িয়ে চলার একটা কৈফিয়ত খাড়া করার চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়।

এই গল্প শুরু হচ্ছে যে-সকালবেলা থেকে সেই সকালটা ছিল মেঘলা, তবে উষ্ণ। আগের রাতে বৃষ্টি হওয়ায় দিগন্তবিস্তৃত মাঠগুলো ভিজে ছিল, ফলে প্রতিটি ফুলের পাপড়িতে ঝলমল করছিল জলের ফোঁটা আর গোটা মাঠের গাছপালা আর ঝোপঝাড় থেকে উঠছিল তীব্র চনমনে একটা গন্ধ।

মাঠের মধ্যে দিয়ে আমি হেঁটে চলেছিলুম রহস্যের কিছুটা রোমাঞ্চে-ঘেরা ছোট্ট একটা হ্রদের দিকে। যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে অবশ্য হ্রদটাতে রহস্যের কিছু ছিল না, তবু লোকের কিন্তু সর্বদাই মনে হোত কী-একটা যেন হেঁয়ালির ব্যাপার আছে ওটাতে। তবে অনেক চেষ্টা করেও আমি এর কারণ কিছু খুঁজে বের করতে পারি নি।

আমার কাছে এই রহস্যের উৎস ছিল অবশ্য হ্রদের জলটা। জলটা ছিল কাচস্বচ্ছ আবার ওই একই সঙ্গে হালকা সবুজের আভালাগা তরল আলকাতরার রঙের। প্রাচীন বাচাল বুড়োদের কাহিনী অনুসারে, ওই জলের অতল অন্ধকারে নাকি বাস করে বড়-বড় 'সামোভারের বারকোশ'এর আকারের একেকটা প্রকাণ্ড রুইমাছ। এ-পর্যন্ত কেউই নাকি সে-মাছ ধরতে পারে নি, তবে কখনও-সখনও হ্রদের জলে তাদের ব্রোঞ্জকালো আভা আর তার সঙ্গে লেজের ঝাপট নাকি চমকে উঠে মুহূর্তে তলিয়ে যায় অতল জলে।

আমাদের অজানা আর অস্বাভাবিক কোনোকিছুর প্রত্যাশা থেকেই রহস্যের ভাব জাগে মনে। আর সত্যিই সেই ছোট্ট হ্রদটার চারপাশ-ঘেরা গাছপালার উচ্চতা আর ঘনত্বের বহর

দেখে এটা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে সেই ঘন জঙ্গলে অসাধারণ কিছু লুকিয়ে আছে নিশ্চয়ই। তা সে লাল পাখাওয়ালা গঙ্গাফড়িং হোক, শাদা ফোঁটাকাটা নীল গুটি পোকাই হোক, কিংবা মানুষের হাতের সমান মোটা রসালো ডাঁটাওয়ালা বুনো জলপাইয়ের বিষাক্ত ফুল—যাই হোক-না কেন।

সত্যি কথা বলতে কী এ-সবই ছিল সেই বনটাতে, এমন কি তরোয়ালের মতো পাতাওয়ালা প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড হলদে আইরিস ফুলের গাছও ছিল। এই ফুলের ছায়া পড়ত হ্রদের জলে, আর যে-কোনো কারণেই হোক, চুম্বকের গায়ে যেমন করে লোহার পিন আটকে থাকে তেমনি করে ওইসব ছায়ার চারপাশে ভিড় জমিয়ে থাকত ছোট-ছোট রুপোলি মাছের ঝাঁক।

যাওয়ার পথে মাঠটা একেবারে জনশূন্য দেখলুম। মাঠের ঘাস কেটে তুলতে তখনও সপ্তাহ-দুয়েক বাকি। কেবল একসময় দূরে একটি বাচ্চা ছেলেকে দেখতে পেলুম, ছেলেটির মাথায় আকারে অনেক বড় একটা রঙচটা গোলন্দাজের টুপি। তামাটেরঙের একটা ঘোড়ার লাগামটা চেপে ধরে রেখে ছেলেটি চিৎকার করে লোক ডাকছিল। এদিকে ঘোড়াটা অনবরত মাথা ঝাঁকিয়ে চলেছিল আর তার মোটা লেজের ঝাপট মেরে যেমন করে মাছি তাড়ায় সেইভাবে ছেলেটাকেও সরিয়ে দিয়ে ছাড়া পাবার চেষ্টায় ছিল।

‘হেই, খুড়ো!’ ছেলেটা ডাকছে শুনলুম। ‘খুড়ো, এদিকপানে এস একবারটি!’

ডাক শুনে বুঝলুম সাহায্যের জন্যে আকুল আবেদন এটি। ফলে মাঠের পথ ছেড়ে ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেলুম।

‘খুড়ো,’ আমার দিকে অনুনয়-ভরা অথচ বেশ সহজ

চোখে তাকিয়ে ছেলেটি বলল, 'ঘোড়াটার পিঠে উঠতে আমারে এট্টু সাহায্য কর দেখি। একা আমি পেরে উঠচি নে।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'কোথায় থাক তুমি?'

'ডাক্তারখানায়,' জবাব দিল ছেলেটি।

আমি জানতুম গাঁয়ের ডাক্তারখানার কম্পাউন্ডার দ্‌মিত্রি সের্গেয়েভিচের কোনো ছেলেপিলে নেই, তাই ছেলেটির কথায় একটু আশ্চর্য না-হয়ে পারলুম না।

ছেলেটিকে আমি তুলে ধরলুম, কিন্তু এতে ঘোড়াটা সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে গেল আর কায়দা করে পাশের দিকে পা ফেলে-ফেলে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল, যাতে ওর আর আমার মধ্যে অন্তত হাতখানেকের ব্যবধান বজায় থাকে।

'হেই, বজ্জাত শয়তান কাঁহাকা!' ঘোড়াটাকে ধমক দিল ছেলেটি। বলল, 'বুইলেন না, ভীষণ ভিতু! আচ্ছা, দাঁড়ান, আগে আমি লাগামগাছ পাকড়ে ধরি, তাম্পর আমারে তুলে ধরেন। এভাবে ও কিছুতেই আপনেরে কাছে ঘেঁষতে দেবে না।'

ছেলেটা লাগামগাছ চেপে ধরল আর ঘোড়াটাও সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গেল, যেন ঘুমিয়ে পড়ল প্রায়। ছেলেটিকে এরপর ঘোড়ার পিঠে তুলে দিলুম, তবু ঘোড়াটা মাথা নিচু করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল একভাবে। ভাবখানা এমন যেন সারাদিন ওই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে বলে মনস্থ করেছে ওটা। এমন কি অস্পষ্ট একটু নাকও যেন ডাকাল ঘোড়াটা। এরপর ছেলেটি খালি-পায়ের গোড়ালি দিয়ে ঘোড়াটার ফোলা-ফোলা ধুলোমাখা পেটে সজোরে একটা খোঁচা দিল। এতে যেন একটু অবাক হয়েই ঘোড়াটা একটা

হেঁচকি তুলল, তারপর বীবর নদীর অপর পাড়ের উঁচু বালিয়াড়ির দিকে হেলেদুলে যাত্রা শুরু করল।

চলতে-চলতে ছেলেটি ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠতে লাগল অনবরত, কনুইদুটো দোলাতে লাগল আর পায়ের দুটো গোড়ালি দিয়ে খোঁচা মারতে লাগল ঘোড়াটার পেটে। বুঝলুম, ঘোড়াটাকে চালাতে হলে অতখানি পরিশ্রম করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

খাড়াই পাড়ের আড়ালে গভীর খাতের মধ্যে লুকনো হ্রদটার জলে পড়েছে সবুজ পলিরঙের একটা ছায়া। আর সেই ছায়ায় গা ঢেকে রুপোলি ঝাড়ুগাছ ঝলমল করছে রুপোলি শিশিরে।

লালরঙের জ্যাকেট আর হলুদ টাই পরে ছোট্ট একটা পাঁশুটেরঙের পাখি ঝাড়ুগাছের একটা ডালে বসে ঠোঁট না-খুলেই কাটা কাটা মিষ্টি রিনরিনে শিস দিচ্ছে। পাখিটার এই তাজ্জব কাণ্ড আর তার অবকাশ উপভোগের এই আয়োজন দেখে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গেলুম সেখানে। তারপর নেমে এলুম জলের ধারে।

মাশা নামে একটি শহুরে মেয়ে গাছগাছালির খুব ভক্ত বলে স্কুলের শেষ পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর মস্কো থেকে আমাদের কাছে থাকতে এসেছে। তার জন্যে সুন্দর-সুন্দর ফুলের একটা গুচ্ছ তুলে নিয়ে যেতে আমি এসেছি এখানে। কিন্তু এখানে বিশ্রী বলতে কোনো ফুল নেই বলে আমার পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়াল বেছে-বেছে ফুল তোলা। অবশেষে ঠিক করলুম, হ্রদের চারপাশ ঘিরে ঘন, সুগন্ধ, শিশিরে-ছাওয়া যে গাছপালা রয়েছে তার প্রত্যেকটি ঝাড় থেকেই একটা করে ডাল আর একটি করে ফুল ছিঁড়ে নেব।

ভালো করে চারপাশে তাকিয়ে দেখলুম একবার। মাঠমিষ্টি নামের ফুলগাছে ইতিমধ্যেই হলদেটে, শিথিল, গুচ্ছগুচ্ছ ফুল এসেছে। ফুলগুলোর গন্ধ অনেকটা লজ্জাবতী ফুলের মতো। এ-ফুল এতই ঠুনকো যে তা বাঁচিয়ে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া, বিশেষ করে জোর হাওয়ার মধ্যে প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। তবু আমি গাছটা থেকে একটা ডাল কেটে নিলুম, তারপর যাতে ফুলগুলো তাড়াতাড়ি ঝরে না-যায় তার জন্যে একটা ঝোপের নিচে আলো-হাওয়া থেকে আড়াল করে রেখে দিলুম সেটাকে।

এরপর মিষ্টি নলখাগড়ার তরোয়ালের আকারের কয়েকটি পাতা কেটে নিলুম। পাতাগুলো থেকে কড়া একটা মশলা-মশলা গন্ধ ছাড়ছিল। মনে পড়ল, ইউক্রেনে মেয়েরা বড়-বড় উৎসবের আগে ঘরের মেঝেয় মিষ্টি এই নলখাগড়ার পাতা ছড়িয়ে রাখে আর এর ঝাঁঝালো গন্ধ প্রায় শীত আসা পর্যন্ত ম-ম করতে থাকে তাদের বাড়িতে।

শায়কশীর্ষ নামের ফুলগাছে আগাগোড়া নরম-নরম কাঁটায়-ছাওয়া প্রথম সবুজ মঞ্জরী দেখা দিয়েছিল। মঞ্জরীসুদ্ধ এরও একটা ডাল কেটে নিলুম আমি।

এরপর শুকনো একটা ডাল বাগিয়ে ধরে অনেক কষ্টে জল থেকে ব্যাঙের নামের ফুলের একটা লতা টেনে পাড়ে তুললুম। এই ফুলগুলোর পাপড়ি শাদারঙের আর ফুলের মাঝখানটায় লালচে একটা ছোপ। কিন্তু পাপড়িগুলো একেবারে সিগারেটের কাগজের মতোই পাতলা। জল থেকে তোলামাত্র সেগুলো নেতিয়ে পড়ল। কাজেই ফুলগুলো ফেলে দেয়া ছাড়া উপায় রইল না। ওই একই শুকনো ডাল দিয়ে এবার আমি জলজ বাজরার কতগুলো ফুল টেনে আনলুম। ডাঁটায়-সাজানো জলজ বাজরার এই গোলাপি

মঞ্জরীগুলো ছোট-ছোট গোল-গোল ঝোপের মতো মাথা জাগিয়ে ছিল জলের ওপর।

শাদা শালুক ফুলগুলোর নাগাল ডাল বাড়িয়েও পাওয়া গেল না। জামাজুতো খুলে হ্রদের জলে নামতেও ইচ্ছে হল না আমার, কেননা জলের তলায় এত কাদা যে হাঁটু পর্যন্ত কাদায় বসে যাবার ভয় ছিল। তার বদলে পাড়ের ওপর থেকেই অন্য এক রকমের ফুল তুলব বলে ঠিক করলুম। এই ফুলটার নাম 'সুসাক', কানে শুনতে কিছুটা কর্কশ ঠেকলেও ফুলগুলো দেখতে সুন্দর। হাওয়ায় ছাতা উল্টে গেলে যেমন দেখতে লাগে, ছোট-ছোট ফুলগুলো দেখতে অনেকটা সেইরকম।

পুদিনাগাছে-ছাওয়া পাড়ের ওপর থেকে বড়-বড় এককে চাপড়া নিরীহ নীলচোখো 'ফরগেট-মি-নট' ফুল উঁকি দিচ্ছিল। আরও ওদিকে কালো বেরি গাছের ঝুলন্ত আঁকশিগুলোর পেছনে দেখা যাচ্ছিল একটা ঢালু জমির ওপর কচি একটা বুনো পাহাড়ি অ্যাশগাছে শক্ত-বাঁধুনিতে-বাঁধা থোকা-থোকা হলদে ফুল ফুটে রয়েছে। লম্বা-লম্বা লালরঙের 'ক্লোভার' ঘাসের সঙ্গে মিশে ছিল 'কাউভেচ' আর 'বেডস্ট্র' আগাছা, আর এদের ফুলের সুন্দর রঙবাহারের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল প্রকাণ্ড একটা 'থিস্‌ল' কাঁটাগাছ। কোমর পর্যন্ত ঘাসে-ডোবা সেই গাছটাকে দেখতে লাগছিল কনুইয়ে আর হাঁটুতে কাঁটাওয়ালা চাকতি-লাগানো বর্মপরা এক নাইটের মতো।

ফুলগুলোর ওপর গরম হাওয়া কেঁপে-কেঁপে লুটোপুটি খাচ্ছিল। আর প্রায় সব ফুলের পাপড়ির ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছিল ভিমরুল কিংবা মৌমাছির ডোরাকাটা পেট। প্রজাপতিরাও উড়ে বেড়াচ্ছিল ডানা নেড়ে-নেড়ে, মনে

হচ্ছিল যেন শাদা আর হালকা হলুদরঙের যতসব পাতা তেরছাভাবে উড়ে ফুলে এসে পড়ছে।

আরেকটু দূরে দেখা যাচ্ছিল বৈঁচি আর বনগোলাপের ঘন ঝোপের দেয়াল। গাছগুলো এমন ঘন হয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ছিল যে মনে হচ্ছিল বনগোলাপের টকটকে লালরঙের ফুল আর বাদামের গন্ধওয়ালা শাদা বৈঁচি-ফুলগুলো কী-এক অলৌকিক উপায়ে যেন একই ঝোপ থেকে ফুটেছে।

বনগোলাপের গাছগুলো দাঁড়িয়ে ছিল সগর্বে মাথা তুলে, উৎসবের সাজপোশাক পরে, গাদা-গাদা কাঁটাওয়ালা ধারালো কুঁড়িতে আচ্ছন্ন হয়ে। এ-গাছে ফুল আসে সবচেয়ে ছোট রাতের দিনগুলোয় — আমাদের রুশদেশে উত্তরাঞ্চলের ছোট রাতের দিন আসে যখন, যখন নাইটিঙ্গেল পাখি সারা রাত জেগে শিশিরে গা-ভিজিয়ে ডাকাডাকি করে, দিনে-রাতে কোনোসময়েই দিগন্ত থেকে সবুজের আভা মুছে যায় না যখন, আর যখন রাতের সবচেয়ে অন্ধকার প্রহরেও সে-অন্ধকার এত ফিকে থাকে যে আকাশে মেঘের এবড়োখেবড়ো মাথাগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। আর তখন মেঘেদের তুষার-শাদা চুড়োগুলোর এখানে-ওখানে সূর্যের আলো গোলাপি ঝিলিক হানতে থাকে। অনেক-উঁচু-দিয়ে-ওড়া একটা রুপোলি এরোপ্লেন রাতের অন্ধকার ছাড়িয়ে তার ওপরে আস্তে-আস্তে উড়ন্ত তারার মতো ঝলমল করতে থাকে তখন, কারণ অত ওপরে তখনই সূর্যের আলোয় ছেয়ে যায় গোটা আকাশ।

অবশেষে বনগোলাপের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে আর বিছুটিপাতার ঘষায় জ্বলতে-জ্বলতে যখন আমি বাড়ি গিয়ে পৌঁছলুম, তখন দেখলুম আমাদের মাশা একটুকরো

কাগজ ফটকের গায়ে পেরেক দিয়ে সাঁটছে। কাগজখানায় ছাপার অক্ষরে লেখা ছিল:

রাস্তার ধারে ধুলোর রাজ্যি
রাস্তা জুড়েও ধুলো,
ঘরে ঢোকবার জানালে আর্জি
পা মুছতে নাহি ভুলো।

বললুম, 'তাই বল! তুমি তাহলে ডাক্তারখানায় ঢু মেরে এসেছ আর সেখানে দরজায় লটকানো এই ছড়াটাও দেখে এসেছ। কেমন?'

'উঃ, কী সুন্দর ফুলগুলো!' মাশা বলে উঠল। 'সত্যি, দারুণ! হ্যাঁ, কী বলছিলেন যেন? তা, ডাক্তারখানায় গেছিলামই তো। আর সেখানে ভারি চমৎকার একজন লোকের সঙ্গে দেখা হল। তার নাম—ইভান স্তেপানভিচ ক্রিশ্‌কিন।'

'সে আবার কে?'

'বাচ্চা ছেলে একটি। অন্যদের থেকে একদম আলাদা ধরনের।'

কথাটা শুনে হাসলুম। এখানে এমন যদি কিছু লোক থাকে যাদের আগাপাছতলা আমি চিনি, তাহলে তারা হল গাঁয়ের বাচ্চা ছেলেরা। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় একথা জোর করেই আমি বলতে পারি যে আমাদের এইসব হুল্লোড়ে, অশান্ত, অস্থির পুঁচকে দেশবাসী সকলেই একটা সত্যিকার অসামান্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। একজন পদার্থবিজ্ঞানী একে হয়তো আখ্যা দেবেন 'সর্বভেদক' গুণসম্পন্ন বলে। সত্যিই, এই ছেলেরা 'সর্বভেদী', কিংবা অপ্রচলিত গালভরা শব্দে যাকে বলে 'সর্বত্র বিরাজমান', তা-ই।

যে-কোনো জঙ্গলের, হ্রদের কিংবা জলার সবচেয়ে অগম্য আর নিভৃত অংশেও আমি এই ছেলেপিলেদের দেখেছি—কত রকমের কাজ-কারবার নিয়ে, এমন কি কখনও-কখনও রীতিমতো চমকলাগানো কাজকর্ম নিয়েও ব্যস্ত থাকতে।

আর সময়-অসময়ের কথা নাই-বা তুললুম। এইসব ছেলেপিলেকে আমি দেখেছি কনকনে ঠান্ডা, কুয়াশাভরা সেপ্টেম্বরের ভোরে সূর্যোদয়ের সময়, কাছাকাছি যে-কোনো বসত থেকে অন্তত কুড়ি কিলোমিটার দূরে নিভৃত কোনো হ্রদের পাড়ে ভিজে অ্যাল্ডার-ঝোপের মধ্যে বসে ঠান্ডায় হি-হি করে কাঁপতে। দেখেছি, বাড়িতে-তৈরি মাছধরা-ছিপ নিয়ে সেই ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে তারা, তাদের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে একমাত্র সেই নাক টানার পরিচিত ফোঁসফোঁস আওয়াজে। আবার কখনও-কখনও এমনও হয়েছে, এত চমৎকারভাবে লুকিয়ে থেকেছে ওরা যে ওদের অস্তিত্ব এতটুকুও টের পাই নি, যতক্ষণ-না আশপাশে কোথা থেকে হঠাৎ ধরা-ধরা, ফিস্‌ফিসে গলার অনুনয় শুনে চমকে উঠেছি। শুনেছি কে যেন বলছে:

'এট্টা কেঁচো ধরে দ্যান-না, খুড়ো!'

এইসব ছেলেপিলের অফুরন্ত কল্পনাশক্তি আর কৌতূহল তাদের নাকে-দড়ি-দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে ওইসব দুর্গম অঞ্চলে—যেখানে অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প-লিখিয়েদের ভাষায় 'মানুষ কখনও পদার্পণ করেছে কিনা সন্দেহ'।

এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে যদি আমি উত্তর মেরুতে, কিংবা ধরা যাক, চৌম্বক মেরুতে, গিয়ে উপস্থিত হতুম, তাহলে সেখানে নিশ্চয়ই দেখতে পেতুম বরফের মধ্যে

গর্ত খুঁড়ে অল্পবয়সী একটি ছেলে ছিপ ফেলে ঠিক বসে আছে, নাক টানছে আর ছিপে কডমাছ পড়ার অপেক্ষায় রয়েছে। আর নয়তো দেখতে পেতুম ভোঁতা একটা ভাঙা ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে মাটি থেকে একটুকরো চুম্বক বের করছে ছেলেটি।

যেহেতু বাচ্চা ছেলেদের এই একটিমাত্রই অসামান্য বৈশিষ্ট্যের ব্যাপার আমার জানা ছিল, তাই আমি মাশাকে শুধোলুম:

'তা, তোমার ইভান স্তেপানভিচ ক্রিশ্‌কিন ঠিক কোনদিক থেকে অন্যদের চেয়ে আলাদা বল তো?'

মাশা বলল, 'ছেলেটির বয়স মাত্র আট বছর, অথচ সে কম্পাউন্ডারের জন্যে সবরকম ভেষজ লতাপাতা-শেকড়বাকড় সংগ্রহ করে আনে। যেমন ধরুন, 'ভালেরিয়ান' পর্যন্ত।'

ছেলেটির আরও নানা কীর্তিকলাপের ও যা বর্ণনা দিল তা থেকে মনে হল যে-ছেলেটিকে বুড়ো ঘোড়াটার পিঠে উঠতে আমি সাহায্য করেছিলুম ইভান স্তেপানভিচ ক্রিশ্‌কিনের সঙ্গে তার যেন দারুণ একটা মিল আছে। এ-ব্যাপারে যা-ও বা কিছু সন্দেহ ছিল তা দূর হয়ে গেল যখন শুনলুম যে ক্রিশ্‌কিন ছেলেটি ডাক্তারখানায় এসে পৌঁছেছে বাদামি রঙের একটা ঘোড়া নিয়ে, আর ঘোড়াটার লাগাম বেড়ার গায়ে বেঁধে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুনলুম ইভান স্তেপানভিচ ক্রিশ্‌কিন নাকি চটপট ডাক্তারখানায় ঢুকে কম্পাউন্ডারের হাতে বীবর নদীর ওপার থেকে সংগ্রহ-করে-আনা একথলে ভালেরিয়ান'-এর শেকড় তুলে দিয়েছে।

একটা ব্যাপার কেবল আমার কাছে একটু অস্পষ্ট হয়ে রইল। তা এই যে ইভান স্তেপানভিচ ক্রিশ্‌কিন ঘোড়া থেকে

না-নেমেই কী করে ভালেরিয়ানের শেকড় সংগ্রহ করল? তবে যখন শুনলুম যে সে ঘোড়ার পিঠে চেপে না-এসে ঘোড়ার লাগাম ধরে হেঁটে ডাক্তারখানায় পেঁছেছিল, তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝলুম, ভালেরিয়ানের ঝোপ পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠে এসে পরে বাকি রাস্তাটা ঘোড়া নিয়ে পায়ে হেঁটে এসেছে সে।

এবার যথেষ্ট সময় হয়েছে আমার এই গল্পের যা আসল বিষয়বস্তু তার দিকে নজর দেয়ার। অর্থাৎ, কম্পাউন্ডার দ্মিত্রি সের্গেয়েভিচের জীবনের দিকে। কিংবা যতটা-না তাঁর জীবনকাহিনীর দিকে, তার চেয়ে বেশি করে যে-বিষয়টা ওই সময়ে আমার মনকে কিছুকাল অধিকার করে ছিল সেই নিজের পেশা সম্পর্কে মানুষের মনোভঙ্গির বিষয়টির দিকে।

যাই হোক, দ্মিত্রি সের্গেয়েভিচ কিন্তু পুরোপুরি নিজের ডাক্তারখানার কাজে ডুবে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আমার এই দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে কিছু-কিছু কাজ বিরস বা মোটেই আগ্রহোদ্দীপক নয় বলে সাধারণের মধ্যে যে-ধারণা চলতি আছে তা অজ্ঞতা থেকে জাত একটা কুসংস্কারমাত্র। আর এটা বুঝতে পারার পর থেকে গাঁয়ের ওই ডাক্তারখানার সবকিছুই আমার ভালো ঠেকতে লাগল— তা সে সদ্য-ধোয়ামোছা সেখানকার কাঠের মেঝে আর জুনিপারের তেলের স্নিগ্ধ গন্ধই হোক, কিংবা ফেনা-ওঠা খনিজ জল 'বর্জুমি'র অস্বচ্ছ বোতলগুলো আর তাকের ওপর সাজিয়ে-রাখা 'ভেনেনা' বা বিষের লেবেলমারা শাদা-শাদা পাত্রগুলো, যা-ই হোক-না কেন।

দ্মিত্রি সের্গেয়েভিচের মতে প্রায় সব গাছপালাতেই হয় ভেষজ গুণসম্পন্ন আর নয়তো বিষাক্ত রস আছে। কেবল

সমস্যাটা হল এই রস নিষ্কাশন, তার গুণাগুণ নির্ধারণ আর কোন কাজে তা ব্যবহার করা যায় তা স্থির করা।

এইসব উদ্ভিজ্জ রসের অনেকগুলির গুণাগুণ অনেককাল আগেই অবশ্য আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। যেমন জানা গেছে মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের ওপর 'লিলি-অব-দি-ভ্যালি', 'ফক্সগ্লাভ্‌' বা ওই ধরনের অন্যান্য গাছপালার রসের ক্রিয়ার ব্যাপারটা। তবে এখনও এমন হাজার-হাজার গাছপালা আছে যাদের গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখা হয় নি। আর দ্‌মিত্রি সের্গেয়েভিচ এই ভেষজ রসের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারটিকেই দুনিয়ার সবচেয়ে আগ্রহোদ্দীপক কাজ বলে মনে করতেন।

আমি যে-বছরের কথা বলছি ওই বছর গ্রীষ্মকালে তিনি পাইনগাছের কচি পাতা থেকে ভিটামিন নিষ্কাশনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের সবাইকে তিনি বাধ্য করতেন ওই পাতা ছেঁচে তৈরি সবুজরঙের একটা মুখে-জ্বালা-ধরানো তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করতে। যদিও আমরা জিনিসটা খেয়ে মুখ বিকৃত করে নানারকম আপত্তি জানাতুম, তবু মানতেই হোত যে ওষুধটা খুবই ফলপ্রদ।

একদিন দ্‌মিত্রি সের্গেয়েভিচ প্রকাণ্ড মোটা আর ভারি একখানা বই আমাকে পড়তে দিলেন। সেখানা ছিল গাছগাছড়ার ভেষজ গুণাগুণ ও ঔষধপ্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধীয় বই। বইখানার নামটা ঠিক কী ছিল এখন আর তা আমার মনে নেই। তবে সবচেয়ে মনোহর একখানা উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক ঠেকেছিল বইখানা। তাতে ছিল অসংখ্য গাছগাছড়ার গুণাগুণের বর্ণনা। আর এই গাছগাছড়া বলতে শুধুই বড়-বড় গাছ কিংবা মাঝারি আকারের ঝোপঝাড়ের কথাই বলা হয় নি, তাতে বলা হয়েছিল নানা জাতের

শ্যাওলা, গাছের ছাতা ও ব্যাঙের ছাতারও গুণাগুণের কথা। একেক সময়ে নানা গাছের অপ্রত্যাশিত নানা গুণের খোঁজখবর পেয়ে তাজ্জব বনে যেতে হচ্ছিল। এছাড়া বইটিতে ওইসব গাছের রস বা শেকড়বাকড় থেকে কীভাবে ওষুধ তৈরি করতে হয় তারও বিস্তৃত নির্দেশ ছিল।

প্রতি সপ্তাহে দ্মিত্রি সের্গেয়েভিচ স্থানীয় জেলার সংবাদপত্রে একটি করে ছোট প্রবন্ধ লিখতেন, তাতে গাছগাছড়ার ভেষজ গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা থাকত। এমন কি একেবারেই সাধারণ কলাগাছের কিংবা তামাকগাছের ছাতার কী ভেষজ গুণ আছে তা-ও লিখতেন। এই সমস্ত প্রবন্ধকে কী কারণে যেন তিনি 'লঘু নিবন্ধ' বলে উল্লেখ করতেন। এগুলি ছাপা হোত পত্রিকাটিতে 'বন্ধুদের জগৎ' এই শিরনামের নিচে।

আমি দেখতুম গাঁয়ের নানা লোকের বাড়িতে দেয়ালের গায়ে খবরের কাগজ-থেকে-কাটা তাঁর একেকটা প্রবন্ধ পিন দিয়ে সেঁটে রাখা আছে, আর ওই প্রবন্ধ পড়েই জানতে পারতুম সেই বিশেষ বাড়িটিতে কেউ-না-কেউ প্রবন্ধে উল্লিখিত একটি বিশেষ অসুখে ভুগছে।

ডাক্তারখানাটিতে সবসময়েই একদল বাচ্চা ছেলের ভিড় লেগে থাকত। দ্মিত্রি সের্গেয়েভিচের ঔষধি লতাপাতার প্রধান যোগানদার ছিল এরাই। লতাপাতা যোগাড়ে এইসব ছেলেপিলের চেষ্টার অন্ত ছিল না, এর জন্যে বহু দূর-দূর জায়গায় চলে যেত তারা। যেমন, তারা হানা দিত গিয়ে খ্ভোশ্চি জলায়, কিংবা যেদিকে বড়-একটা কেউ পা বাড়াত না সেই সুদূর কাজিয়ন্নায়া নদীর ওপারে পর্যন্ত। আর যারা ওইসব জায়গায় ঘুরে আসত তারা গল্প করত যে সেখানে নাকি প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পতিত জমিতে পলি-পড়া

অগভীর অনেক হ্রদ আর টক সরেললতার উ'চু-উ'চু সব ঝোপ আছে।

এই লতাপাতা যোগাড় করে দেয়ার বিনিময়ে ছেলেরা আর-কিছু নয়, কেবল চাইত বাচ্চাদের রবারের চুষিগুলো। প্রাণপণে, মুখ লাল করে ফ‍ুঁ দিয়ে-দিয়ে চুষিগুলো ফুলিয়ে তুলত তারা। তারপর সুতো দিয়ে চুষির খোলা মুখগুলো বাঁধত আর সেগুলো তখন দেখতে লাগত 'উড়ন্ত বুদ্বুদ' বেলুনের মতো। বলা বাহুল্য, এই 'বেলুন' অবশ্য উড়ত না। তবে ছেলেরা সবসময় সেগুলো হাতে নিয়ে ঘুরত, আর কখনও-কখনও সুতো দিয়ে হাতের আঙুলে সেগুলোকে বে'ধে নিয়ে প্রাণপণে ঘোরাত। এতে অদ্ভুত একটা বোঁ-বোঁ আওয়াজ উঠত। কিংবা 'বেলুন'গুলো দিয়ে পরস্পরের মাথায় বাড়ি মারত, আর এতে যে মজাদার ঢপ-ঢপ আওয়াজ উঠত তাতে ভারি আমোদ পেত তারা।

অবশ্য একথা বললে অন্যায় হবে যে ওই ছেলেরা তাদের দিনগুলো এইরকম খেলাধুলো করেই কাটাত। এই খেলাধুলোয় মেতে উঠত তারা কেবলমাত্র গ্রীষ্মের ছুটির দিনগুলোয়। আর তা-ও আবার প্রত্যেক দিন নয়। প্রত্যেক দিন খেলে বেড়াবার সময় ছিল না তাদের। ছুটির দিনগুলোতেও বেশির ভাগ সময় তাদের কাটাতে হোত বড়দের সাহায্য করায়। যেমন, মাঠে বাছুর চরানোয়, জ্বালানি কাঠকুটো সংগ্রহ করায়, উইলোগাছের ডাল কাটায়, আলুখেতে গাছের গোড়ায় বাঁধ দেয়ায়, বাড়ির বেড়া মেরামতির কাজে এবং বড়রা যখন বাড়ি থাকত না তখন ছোট ভাইবোনেদের পাহারা দেয়ায়। পাহারা দেয়ার এই কাজটা ছিল আবার সবচেয়ে জ্বালাতনের, কেননা বাচ্চা ভাইবোনেরা অনেকেই হে'টেচলে বেড়াতে পারত না বলে

বড় ভাইদের সর্বদাই তাদের পিঠে নিয়ে বয়ে বেড়াতে হোত।

গাঁয়ের ছেলেরা যে-দুটি লোককে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত তাঁরা হলেন দ্মিত্রি সের্গেয়েভিচ আর অপর একজন বুড়ো মানুষ, যাঁকে সবাই ডাকত 'জঞ্জাল' বলে।

'জঞ্জাল' গাঁয়ে আসতেন মাসে একদিন করে, কখনও-কখনও আবার তার চেয়েও কম। ধুলোমাখা আলগা একটা আঙরাখা গায়ে চাপিয়ে একটা বুড়ো ঘোড়া আর ঝরঝরে পুরনো একখানা গাড়ির পাশে-পাশে পা টেনে-টেনে আস্তে-ধীরে গাঁয়ের পথ ধরে আসতেন তিনি। দড়িবাঁধা হাতের চাবুকখানা বালির রাস্তায় ঘষটে টানতে-টানতে করুণ সুরে তিনি তখন হাঁক পাড়তেন:

'ছেঁড়া কাপড়, রবারের জুতো, খুর, গোরুর শিঙ্, জঞ্জাল বদল দি—ই!'

'জঞ্জাল'এর গাড়ির সামনের দিকটায় থাকত সাধারণ পাতলা কাঠের তৈরি ঢাকনা-খোলা একটা ম্যাজিকের বাক্স। বাক্সটার খোলা ঝুলন্ত ডালায় ঝোলানো থাকত গাদা-গাদা ঝলমলে রঙিন খেলনা—হুইস্‌ল, ইয়ো-ইয়ো, নানান পুতুল, জলছবি আর এমব্রয়ডারির কাজের জন্যে উজ্জ্বল রঙিন সুতোর ফেটি।

'জঞ্জাল' গাঁয়ে ঢোকামাত্র সবক'টা বাড়ি থেকে যতসব বাচ্চা ছেলেমেয়ে হুড়োহুড়ি ধাক্কাধাক্কি করতে-করতে ছুটে বেরিয়ে আসত, মুরগির ছানাপোনাদের খাবার দিয়ে ডাকলে যেমনটা হয় অনেকটা সেইভাবে। ছোট-ছোট ভাইবোনেদেরও টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসত তারা, আর নিয়ে আসত পুরনো থলে, বাড়ির তৈরি জীর্ণ চটিজুতো, গোরুর ভাঙা শিঙ, আরও কত কী ভাঙাচোরা, ঝড়তিপড়তি জঞ্জাল।

এইসব বস্তা আর গোরুর শিঙের বদলে 'জঞ্জাল' ওদের দিতেন সদ্য রঙ-করা নতুন-নতুন খেলনা, আর তারপর তাঁর খুদে যোগানদারদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে চালাতেন আলাপ-আলোচনা, এমন কি খেলনা ইত্যাদি নিয়ে তর্কবিতর্কও।

বড়রা কিন্তু বদলানোর জন্যে কোনো জিনিস 'জঞ্জাল'এর কাছে আনতেন না। এটা ছিল শুধুমাত্র বাচ্চাদেরই এক্তিয়ারভুক্ত।

বাচ্চাদের সঙ্গে মেলামেশা করলে মানুষের মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ জন্মায়। এমনিতে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া কোকড়ানো চুল, খোঁচা-খোঁচা দাড়িভর্তি গাল আর রোদে-হাওয়ায় ছালবাকলা-ওঠা টকটকে লাল নাক দেখে 'জঞ্জাল'কে বেশ কড়া মেজাজের, এমন কি ভয়ঙ্কর বলেই মনে হোত। তাঁর গলার স্বরও ছিল চড়া আর কর্কশ। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর চেহারা সত্ত্বেও বাচ্চাদের কখনও খালি-হাতে ফিরিয়ে দেয়া তাঁর স্বভাবে ছিল না। কেবল একবারই মাত্র তিনি রঙচটা লাল ফ্রকপরা বাচ্চা একটি মেয়ের কাছ থেকে একেবারে জীর্ণ তার বাবার একজোড়া বুট নিতে অস্বীকার করে বসেন।

সেদিন বুটজোড়া না-নেয়ায় মেয়েটি মনোকষ্টে কুঁকড়ে যেন এতটুকু হয়ে গেল। মাথাটা তার কাঁধের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল একেবারে, তারপর 'জঞ্জাল'এর গাড়ির কাছ থেকে বাড়ির দিকে এমনভাবে পায়ে-পায়ে হেঁটে চলল মেয়েটি যেন কেউ তাকে আচ্ছা করে ঠেঙিয়েছে। এদিকে 'জঞ্জাল'এর চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল যে-ছেলেমেয়েরা তারা হঠাৎ একেবারে চুপ মেরে গেল, ভুরু কুঁচকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল তারা আর কেউ-কেউ ফোঁসফোঁস করে নাক টানতে শুরু করে দিল।

এদিকে 'জঞ্জাল' মেয়েটির কান্না কিংবা তাঁর এই নিষ্ঠুর আচরণে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা অন্য ছেলেমেয়েদের যেন দেখতেই পাচ্ছেন না এমন ভাব করে মোটা করে একটা সিগারেট পাকাতে লাগলেন। কাগজের খোলা মুখটায় জিভ ঠেকিয়ে জুড়ে এরপর আস্তে-ধীরে ধরিয়ে নিলেন সিগারেটটা, তারপর থুতু ফেললেন একদলা। ছেলেমেয়েরা তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে।

'কী, হলটা কী তোদের?' চটে উঠে বললেন 'জঞ্জাল'। 'বুঝিস নে কেনে ব্যাপারটা? আমি রাষ্ট্রের হয়ে কাজ করচি, বুইলি? আমার ঘাড়ে একবোঝা ভুসিমাল চাইপ্যে দিলে চলবে কেনে? এমন জিনিস চাই আমি যা দেশের উৎপাদনের কাজে ব্যাভার করা চলবে। বুইলি ব্যাপারখান?'

তবু ছেলেমেয়েরা কোনো কথা বলল না। সিগারেটে কষে একটা টান দিয়ে ওদের দিকে না-তাকিয়ে 'জঞ্জাল' এবার বলে উঠলেন:

'যা, ওরে ডেকে লিয়ে আয়। শিগগিরি যা! বাপ রে, এমনভাবে তাইক্যে আচিস তোরা আমার পানে যেন আমি দত্যি-দানো না কী এট্টা!'

সঙ্গে সঙ্গে তাড়া-খাওয়া একঝাঁক চড়ুইয়ের মতো ছেলেমেয়ের দলটা ছুটল লাল ফ্রকপরা সেই মেয়েটির বাড়ি। তারপর টানতে-টানতে নিয়ে এল লজ্জায় রাঙা, চোখে জলভরা মেয়েটিকে। 'জঞ্জাল' ফের একবার তার হাতের বুটজোড়া মনোযোগের ভান করে পরীক্ষা করলেন, গাড়ির ওপর ছুড়ে ফেললেন বুটজোড়া, তারপর মেয়েটির হাতে ধরিয়ে দিলেন সবচেয়ে সুন্দর ঝলমলে একটা পুতুল—তার টোপা-টোপা লাল টুকটুকে গাল, খুশিতে

ডগমগ গোল-গোল ঘননীল চোখ আর গোলালো ছড়ানো আঙুল।

লজ্জা-লজ্জা ভাব করে পুতুলটা নিল মেয়েটি, হাড়-জিরজিরে বুকে সেটা জড়িয়ে ধরে হেসে উঠল তারপর। এবার ঘোড়ার লাগামটায় ঝাড়া দিলেন ‘জঞ্জাল’ আর বুড়ো ঘোড়াটা কানদুটো চ্যাপ্টা করে পেতে জোয়ালের কাঠদুটো টানতে শুরু করল। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে ‘জঞ্জাল’এর গাড়ি এরপর বালির রাস্তা ধরে ফের এগিয়ে চলল আর ‘জঞ্জাল’ একটিও কথা না-বলে কড়ামেজাজী চালে, রুক্ষ কর্কশ দেহখানা নিয়ে হেঁটে চললেন গাড়ির পাশে-পাশে। একমাত্র খান-কুড়ি বাড়ি পার হয়ে যাবার পরই তবে গলাখাঁকারি দিয়ে ফের তিনি টেনে-টেনে সুর ধরলেন:

‘ছেঁড়া কাপড়, রবারের জুতো, খুর, গোরুর শিঙ, জঞ্জাল বদল দি—ই!’

পেছন থেকে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে সেদিন আমার মনে হয়েছিল, ছেঁড়া ন্যাকড়া-বদলিওয়ালার এই পেশার চেয়ে কম আকর্ষণীয় কাজ যদিও আর আছে কিনা সন্দেহ, তবু এই লোকটি কিন্তু সেই একঘেয়ে কাজটাকেই চাষীর ঘরের ছেলেমেয়েদের আনন্দ বিলনোর একটা বড় উপায় করে তুলেছেন।

আরেকটা কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হল এই যে ‘জঞ্জাল’ তাঁর কাজটা করতেন এক ধরনের অনুপ্রেরণা, নতুন আবিষ্কারের উদ্দীপনা আর তাঁর হুল্লোড়ে, বাচ্চা মাল-যোগানদারদের জন্যে আন্তরিক দরদ নিয়ে। গাঁয়ে-গাঁয়ে প্রত্যেকবার টহল দেবার আগে তিনি তাঁর ওপরওয়ালাদের কাছ থেকে নতুন একপ্রস্থ খেলনা আদায় করে ছাড়তেন।

'জঞ্জাল'এর এই খেলনাগুলো ছিল যেমন রকমারি তেমনই মনোহারি।

কম্পাউন্ডারের জন্যে ঔষধি লতাপাতা সংগ্রহকারী ছেলেদের পরিশ্রমের একধরনের পুরস্কার হিসেবে দেয়ার উদ্দেশ্যে দ্‌মিত্রি সের্গেয়েভিচের অনুরোধে 'জঞ্জাল' যেদিন বেশকিছু ব্রোঞ্জের তৈরি মাছধরার বঁড়শি এনে দিলেন, সেদিন গাঁয়ে যেন উৎসব পড়ে গেল। ইভান স্তেপানভিচ ক্রিশ্‌কিন তার মূল্যবান কাজের জন্যে উপহার পেল দশটা অমন বঁড়শি।

বঁড়শিগুলো বিতরণ করা হল গম্ভীর আনুষ্ঠানিক নিস্তব্ধতার মধ্যে। আর যেন কোনো নীরব সাংকেতিক নির্দেশে ছেলেরা তাদের জীর্ণ-হয়ে-যাওয়া টুপিগুলো মাথা থেকে খুলে সেগুলোর অস্তরের কাপড়ের মধ্যে প্রচন্ড যত্ন নিয়ে, সমনোযোগে বঁড়শিগুলো গেঁথে রাখতে লাগল। তাদের যা-কিছু মূল্যবান সম্পদ লুকিয়ে রাখার ওটাই ছিল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জায়গা।

রাশিয়ায় আমরা সকলেই এই ধারণায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি যে শাদাসিধে আর বিনীত ধরনধারণের মানুষের পক্ষেও রীতিমতো অসামান্য ও অসাধারণ বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করা খুবই সম্ভব। আমাদের সাহিত্যিক লেস্‌কোভ এ-ব্যাপারে বিশেষ সচেতন ছিলেন। কারণ তিনি নিজের দেশকে চিনতেন পুঙখানুপুঙখভাবে, ভালোবাসতেন তাকে সমগ্র প্রাণমন সঁপে। আর এই বোধ অর্জন করতে তিনি গোটা দেশ চষে বেড়িয়েছিলেন, শ'য়ে-শ'য়ে সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও আস্থার অধিকারী হয়েছিলেন।

দ্‌মিত্রি সের্গেয়েভিচের শাদাসিধে ধরনধারণ—রসিকতা করে বলতে গেলে যা নাকি সবরকম বিশেষত্ববর্জিত বলেই

লক্ষণীয় ছিল—তা আড়াল করে রেখেছিল তাঁর বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে অক্লান্ত একজন অনুসন্ধানী বিজ্ঞানীকে। তিনি ছিলেন সত্যিকার একজন উঁচুদরের মানুষ, নিজের কাছে আর চারপাশের সকলের কাছে তাঁর দাবির মাত্রা ছিল খুবই উঁচু।

অপরদিকে 'জঞ্জাল'এর প্রতিকূল বাহ্য চেহারার অন্তরালে লুকিয়ে ছিল বন্ধুতায়-ভরা দরদী প্রাণ। তদুপরি তিনি ছিলেন কল্পনাপ্রবণ মানুষ, আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ নিজের কাজেও তিনি সেই কল্পনার যাদু ছোঁয়াতে পারতেন।

ওঁদের কথা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল অপর একটা মজার ঘটনার কথা। দেশের ওই অঞ্চলেই একবার আমাকে আর আমার এক বন্ধুকে জড়িয়ে ঘটনাটা ঘটে।

আমরা সেবার মাছ ধরতে গিয়েছিলুম স্তারায়া কানাভা নামে জঙ্গলের মধ্যেকার প্রবল স্রোতওয়ালা ঘোলা বাদামি জলের শীর্ণ একটা নদীতে। নদীটা ছিল মানুষের বসতি থেকে বহু দূরে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে, আর সেখানে গিয়ে পেঁছিনোটা রীতিমতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেখানে পেঁছিতে হলে প্রথমে চল্লিশ কিলোমিটার পথ ছোট লাইনের ট্রেনে গিয়ে পরে আরও তিরিশ কিলোমিটারের মতো রাস্তা যেতে হোত পায়ে হেঁটে।

স্তারায়া কানাভার ঘূর্ণিজলে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড রুইজাতীয় আইড মাছ পাওয়া যায়, আর এই মাছ ধরাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য।

নদীটার ধারে একদিন কাটিয়ে পরদিন পায়ে হেঁটে ফিরে এসে জঙ্গলের শান্ত নিভৃত গোধূলিবেলায় ছোট লাইনের

টার্মিনাল স্টেশনটাতে পেঁছিলুম। স্টেশন-এলাকাটা তখন ভরপুর হয়ে ছিল তার্পিন তেল, চেরা-কাঠের গুঁড়ো আর লবঙ্গের ঝাঁঝালো গন্ধে। সময়টা ছিল অগস্ট মাস, বার্চগাছে এখানে-ওখানে তখনই হলুদ পাতা দেখা দিতে শুরু করেছে। আর অস্তগামী সূর্যের আলো পড়ে সেই পাতাগুলো একে-একে ঝলমল করে উঠছে।

অনেকগুলো খালি মালগাড়ি নিয়ে ছোট্ট ট্রেনখানা এসে গেল একসময়। যে-মালগাড়িটায় লোক ছিল সবচেয়ে বেশি তাতে আমরা উঠে পড়লুম। আমাদের সঙ্গে চলল ঝোড়ায় করে বুনো জাম আর ব্যাঙের ছাতা নিয়ে বেশ কিছু গাঁয়ের মেয়ে আর দু'জন নোংরা পোশাক-পরা, দাড়ি না-কামানো শিকারি। শিকারি দু'জন মালগাড়ির খোলা দরজার ধারে বাইরে পা ঝুলিয়ে বসে সিগারেট টানছিল।

প্রথম-প্রথম মেয়ে-যাত্রীরা তাদের গাঁয়ের ব্যাপারস্যাপার নিয়ে বকবক করে যাচ্ছিল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে জঙ্গলের সন্ধেবেলার অলৌকিক যাদু রেলগাড়ির কামরাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলল আর দেখতে-দেখতে নিশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল সবাই।

এরপর ট্রেনখানা জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে এল মাঠের মধ্যে আর মাঠের পারে সূর্যাস্তের শান্ত মহিমায় উদ্ভাসিত দৃশ্য চোখে পড়ল সকলের। দেখতে-দেখতে ঘাস, কুয়াশা আর শিশিরের দিগন্তে সূর্য গেল ডুবে আর এমন কি ট্রেনের আওয়াজেও লাইনের ধারে-ধারে ঝোপে-ঝাড়ে পাখির ডাকাডাকি আর গান চাপা পড়ল না।

এমন সময় ট্রেনের মেয়ে-যাত্রীদের মধ্যে যে ছিল সবচেয়ে কমবয়সী সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে ঝলমলে সোনাঝরা চোখ নিয়ে হঠাৎ গান ধরে দিল সে। রিয়াজান অঞ্চলের সরল

একটা লোকগীতি সে গাইছিল। দেখতে-দেখতে আরও কিছু-কিছু মেয়ে গলা মেলাল তার সঙ্গে।

যখন ওদের গান গাওয়া শেষ হল তখন পুরনো ফৌজী গ্রেটকোট কেটে বানানো পট্টি পায়ে-জড়ানো নোংরা পোশাকের একজন শিকারি তার সঙ্গীকে নিচুগলায় শুধোল:

'আমরাও গান গাইলে কেমন হয়, ভানিয়া?'

'তা, মন্দ কী,' জবাব দিল সঙ্গীটি।

নোংরা চেহারার লোকদুটি গান ধরল এবার। ওদের একজনের গলাটা দেখলুম ভারি দরাজ আর মাঝারিরকম মোটা। তার সেই আশ্চর্য গলার শক্তি আর সুরের অনায়াস খেলা দেখে সবাই আমরা তাজ্জব বনে গেলুম। মেয়েরাও অবাক বিস্ময়ে মাথা নাড়তে লাগল আর গান শুনতে লাগল মন দিয়ে। সবচেয়ে অল্পবয়সী সেই মেয়েটি তো নিঃশব্দে কাঁদতেই শুরু করে দিল। কিন্তু কেউই তার দিকে ফিরে পর্যন্ত তাকাল না, কারণ সকলে বুঝেছিল যে তার ওই কান্না যন্ত্রণা বা দুঃখের কারণে নয়, তা গভীর মুগ্ধতার মোহাবেশে।

গায়ক-দু'জন যখন গান শেষ করল মেয়েরা তাদের প্রাণখুলে আশীর্বাদ করতে লাগল, দুর্লভ এই আনন্দের শরিক করার জন্যে দীর্ঘ জীবন কামনা করল তাদের।

আশ্চর্য গলার সেই গায়কটির পরিচয় জানতে চাইলুম আমরা। সে জানাল, এক যৌথখামারে হিসাবরক্ষকের কাজ করে। এরপর আমরা তাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলুম যাতে সে মস্কোয় আসে আর বিখ্যাত গায়ক-গায়িকা আর সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা তার গান শুনতে পান। বললুম, 'অমন একটা গলা এইভাবে লোকের চোখের

আড়ালে লুকিয়ে রাখা আর আপনার প্রতিভাকে নষ্ট হতে দেয়া রীতিমতো অপরাধ।' কিন্তু শিকারিটি আমাদের সব অনুরোধ-উপরোধের জবাবে সলজ্জভাবে হাসল শুধু, তবে প্রস্তাবটা মানতে কিছুতেই রাজি হল না।

বলল, 'আরে, ছাড়ান দিন। আমার এই রেওয়াজ-না-করা গলা নিয়ে কী করে অপেরায় গাইতে পারি বলুন দেখি! তাছাড়া আমার সে-বয়স কী আছে যে এতবড় একটা ঝুঁকি নিয়ে হৈ-হৈ করে বেড়াব? গাঁয়ে আমার বাড়ি-বাগান আছে, স্ত্রী আর ইশ্‌কুলের পড়ুয়া দুটি বাচ্চাও আছে। আর আপনারা বলছেন কিনা এ-সব ছেড়েছুড়ে আমায় মস্কোয় যেতে? বটে! ঠাট্টা করছেন নাকি মশাই? বছর-তিনেক আগে আমি একবার মস্কোয় গেছিলাম। তা, বলব কি মশাই, সকাল থেকে রাত অবধি এমন হৈ-হল্লা চলছে সেখানে যে আমার মাথাটাথা ধরে একশা'। বেশিদিন আর তিষ্ঠুতে পারলাম না মশাই, তাড়াতাড়ি ওকার ধারে আমার গাঁয়ে ফিরে এসে তবে রক্ষে পেলাম।'

ছোট্ট এঞ্জিনটা এমন সময় সজোরে মিহিসুরে বাঁশি বাজিয়ে দিল। বুঝলুম, আমাদের গন্তব্য স্টেশন এসে যাচ্ছে এবার।

'শুনুন,' আমার বন্ধু এবার বেশ জোর দিয়ে শিকারিটিকে বলল, 'এই স্টেশনে আমাদের নামতে হচ্ছে। তবে আমি আপনাকে আমার মস্কোর বাড়ির ঠিকানা আর টেলিফোন-নম্বর দিচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই আসবেন, অন্যথা করবেন না। আমি আপনাকে যথাযোগ্য লোকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।'

ডায়েরির খাতা থেকে একখানা পাতা ছিঁড়ে দ্রুতহাতে নিজের নাম-ঠিকানা লিখে দিল সে। ট্রেনটা ততক্ষণে স্টেশনে

পেঁৗছে গিয়েছিল আর ফের যাত্রা শুরু করার জন্যে দম ফেলছিল জোরে-জোরে।

শিকারিটি কাগজখানা নিয়ে সূর্যাস্তের অস্পষ্ট আলোয় লেখাটা পড়ল। তারপর শুধোল:

'আচ্ছা, আপনি তো একজন সাহিত্যিক, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।'

'বিলক্ষণ! আমি আপনার লেখা পড়েছি বৈকি। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় আনন্দ পেলাম। কিন্তু এবার আমায় আসল পরিচয়টা দিতে দিন—আমার নাম কিন্তু পিরগোভ, বল্‌শয় থিয়েটরের একক কণ্ঠের গায়ক। আগে আমি একটু বাঁদরামি করেছি বলে দয়া করে অপরাধ নেবেন না। তবে এই দুষ্টুমির স্বপক্ষে একটিমাত্রই ভালো কথা বলবার আছে, তা হল এই যে আমাদের এই দেশটা সত্যিই ভারি সৌভাগ্যে-ভরা। কেননা এখানে মানুষের মধ্যে এত মমতার, পরস্পরকে সাহায্য করার জন্যে এত ব্যগ্রতার দেখা মেলে যে কী বলি!'

কথাগুলো বলে হেসে উঠলেন তিনি।

'বুঝতেই পারছেন আমি আপনাদেরই উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলছি। যৌথখামারের এক খাজাঞ্চিকে অপেরার গায়ক হতে সাহায্য করার জন্যে আপনাদের ব্যগ্রতার কথাই বলছি আমি। যদি আমি সত্যিই খাজাঞ্চি হতুম তাহলে আপনারা-যে কিছুতেই আমাকে গলাটা মাটি করতে দিতেন না এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। যাই হোক, এজন্যে অনেক ধন্যবাদ!'

আন্তরিক আবেগ নিয়ে আমাদের করমর্দন করলেন ভদ্রলোক। ট্রেনখানা দেখতে-দেখতে ছেড়ে দিল আর আমরা দু'জন হতভম্ব হয়ে স্টেশনের কাঠের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে

রইল্ম। হতভম্ব ভাবটা কাটলে আমাদের মনে পড়ল, দ্মিত্রি সের্গেয়েভিচ একবার বলেছিলেন বটে যে কণ্ঠশিল্পী পিরগোভ প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে আমাদের ওই অঞ্চলের কাছাকাছি ওকা নদীর ধারে তাঁর জন্মস্থান বড় একটা গ্রামে এসে থাকেন।

যাই হোক, এখন আমার এ-গল্পের ইতি টানার সময় হয়েছে। আমি দেখছি, ওই অঞ্চলের স্থানীয় বৃদ্ধদের মতো আমারও গল্পের 'জের টেনে চলা'র অভ্যেস জন্মেছে আর খেয়ার মাঝি ভাসিলির মতো গল্পের তোড়ে ভেসে গেছি কখন। আমাদের ভাসিলি যখনই গপ্পো বলতে শ্রু করে তখনই তার সঙ্গে জ্বড়ে আরও একটা গপ্পো মনে পড়ে যায় তার, আর তারপর তিন নম্বর, চার নম্বর করে একের-পর-এক গপ্পের পালা চলতেই থাকে। আর সে-গপ্পের শেষ বলে কিছ্ম থাকে না কখনও।

তবে এই গল্প ফেঁদে বসার পেছনে আমার উদ্দেশ্য ছিল খ্বই সরল। তা হচ্ছে, এমন অতি-সাধারণ কয়েকটা ঘটনার বিবরণ দেয়া যা থেকে আমাদের র্শ চরিত্রের অন্তর্নিহিত প্রতিভা আর হৃদয়বত্তার পরিচয়টা ফুটে ওঠে। আপাতত এই পর্যন্তই, বড়-বড়, অসামান্য সব ঘটনার কথা বলা যাবে আরেক সময়।

১৯৫০

দেওদার-মঞ্জরীর সাজি

বের্জেন শহরের চারপাশ ঘিরে যে-জঙ্গল সুরকার গ্রিয়েগ সেখানে একবার হেমন্তকালটা কাটাচ্ছিলেন। পাতার মর্মর আর ব্যাঙের ছাতার সুগন্ধ নিয়ে সব জঙ্গলই অবশ্য সুন্দর, তবে যে-সব জঙ্গল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সমুদ্র অবধি নেমে যায় তাদের একটা নিজস্ব বিশেষ আকর্ষণ থাকে। পাড়ের ওপর সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দে মুখর হয়ে থাকে তারা। সমুদ্র থেকে অনবরতই হালকা কুয়াশা উঠতে থাকে, আর অপর্যাপ্ত সেই আর্দ্রতায় জঙ্গলে মস-জাতীয় শ্যাওলার বাড়বৃদ্ধি ঘটে অফুরন্ত। অনেক সময় গাছের ডাল থেকে পর্যন্ত সবুজ চুলের বিনুনির মতো এই শ্যাওলা ঝুলে মাটি ছুঁয়ে থাকে।

এইসব জঙ্গলে আবার নকলনবিশ পাখির মতো লুকিয়ে থাকে সুরেলা প্রতিধ্বনিও। সামান্য একটুখানি শব্দের জন্যে কান পেতে অপেক্ষা করে থাকে সে, আর তা পেয়ে গেলেই লুফে নিয়ে সেটাকে ছড়িয়ে দেয় ঝর্নার মতো পাহাড়ের গা বেয়ে।

একদিন বনের মধ্যে গ্রিয়েগের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বনরক্ষকের মেয়ের। দুই বিনুনি-দোলানো বাচ্চা মেয়েটি

হাতে একটা সাজি নিয়ে বনে দেওদারের ছোট-ছোট মোচার আকারের মঞ্জরী কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিল।

আগেই বলেছি সময়টা ছিল হেমন্ত, আর দুনিয়ায় যত সোনা আর তামা আছে কেউ যদি তা হাতিয়ে নিয়ে তা দিয়ে হাজার-হাজার ঝিঁঝির পাতের মতো পাতলা পাতা বানায় তাহলে তা-ও পাহাড়ের ঢালের জঙ্গলে এ-সময়ে যে-রাশিরাশি চোখ-ধাঁধানো ঝলমলে সোনা আর তামা ছড়ানো থাকে তার তুলনায় অতি নগণ্য আর সামান্য ঠেকবে। আর জঙ্গলের সত্যিকার পাতার পাশে, বিশেষ করে কাঁপন-লাগা পপ্‌লারের পাতার পাশে ওইসব হাতে-বানানো পাতা তো নেহাতই স্থূল বলে মনে হবে। এই জাতের পপ্‌লারের পাতায় কাঁপন ধরাবার পক্ষে সামান্য একটা পাখির গানই যথেষ্ট।

'ওগো খুকি, নাম কী তোমার?' গ্রিয়েগ শুধোলেন।

'ডাগ্নি পেডের্সেন,' নিচু গলায় জবাব দিল খুকি। ভয় নয়, লজ্জা পেয়েই অমন নিচুস্বরে কথা বলল ও। এমন বন্ধুতায়-ভরা ঝলমলে চোখের মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে ওর ভয় পাওয়ার কথা নয়।

'কিন্তু বড় মুশকিল হল তো,' গ্রিয়েগ বললেন। 'তোমাকে দেবার মতো আমার কাছে তো কিছু নেই—না একটা পুতুল, না মাথায় বাঁধার ফিতে, না মখমলে-তৈরি খরগোশ, কিচ্ছু নেই।'

'আমার মায়ের পুরনো পুতুল আচে একটা,' খুকি জবাব দিল। 'আগে সেটা এমনি করে চোখ বুজিয়ে ফেলত।'

বলে আস্তে-আস্তে চোখদুটো বন্ধ করে ফেলল ও। তারপর যখন চোখ খুলল গ্রিয়েগ ওর সবুজেটে চোখের তারায় পাতার ছায়া চমকে যেতে দেখলেন।

'কিন্তু এখন পুতুলটা চোখ খুলেই ঘুমোয়,' দুঃখিতভাবে ডাগ্নি বলল। 'বুড়ো হলে ভালো ঘুম হয় না লোকের। ঠাকুর্দা তো সারা রাত উঁ-আঁ করে কাটায়।'

গ্রিয়েগ বললেন, 'বুঝলে ডাগ্নি, আমি তোমাকে মজার একটা জিনিস উপহার দেব। তবে এখুনি নয়, বছর-দশেকের মধ্যে।'

শুনে হাতদুটো ওপরদিকে ছুড়ে দিয়ে ডাগ্নি বলল: 'ওঃ, তাহলে তো অনেক দেরি!'

'ব্যাপারটা কী জানো তো, আমাকে গোড়ায় সেটা বানাতে হবে।'

'জিনিসটা কী, বলেন দেখি?'

'সে তুমি পরে জানতে পারবে।'

'তাহলে বলতে চান আপনি সারা জীবনে পাঁচটা-ছ'টার বেশি খেলনা বানাতে পারেন না, এই তো?'

ওর গলায় ধমকের সুর ফুটল। আর কেমন-যেন লজ্জা পেয়ে গেলেন গ্রিয়েগ।

কিছুটা অপ্রস্তুতভাবে বললেন, 'না, ঠিক তা নয়। হয়তো কয়েক দিনের মধ্যেই আমি তা তৈরি করতে পারি, তবে কিনা তোমার মতো বাচ্চা মেয়ের উপযুক্ত জিনিস হবে না তা। বড়দের জন্যে উপহার বানানো আমার কাজ, বুঝলে তো?'

ওঁর জামার হাতাটা চেপে ধরে অনুনয়ের সুরে ডাগ্নি বলল, 'কথা দিচ্চি, আমি ভাঙব না খেলনাটা। বুঝলেন, ঠাকুর্দার-না একটা কাচের নৌকো আচে, রোজ সেটার ধুলো ঝাড়ি আমি, কিন্তু এখনও একটা চাকলাও ওঠে নি নৌকোটার।'

'ডাগ্নি আমায় মহা ফাঁফরে ফেলেছে দেখছি,' ভাবলেন

গ্রিয়েগ। তারপর ছোটদের কোনো কিছু বোঝানোর ব্যাপারে ঝামেলায় পড়ে গেলে বড়রা সবসময়েই যা বলে থাকে সেই কথা বললেন:

'তুমি এখনও খুব ছোট্টটি আছ তো, তাই অনেক ব্যাপার তোমার জানা নেই। একটু ধৈর্য ধরে থাক, সব বুঝতে পারবে। আচ্ছা, তোমার হাতের সাজিটা আমায় দাও দিকি, আমি একটু বয়ে দিই তোমায়। তোমার পক্ষে বড্ড ভারি ওটা। চল, তোমায় বাড়ি পেঁছে দিয়ে আসি, আর অন্য কথা বলতে-বলতে যাই।'

একটা নিশ্বাস ফেলে হাতের সাজিটা গ্রিয়েগের হাতে তুলে দিল ডাগ্নি। সাজিটা সত্যিই ভারি। দেওদার-মঞ্জরীর মোচাগুলোয় রজনের আঠা বেশি থাকে বলে সেগুলো পাইনের মোচার চেয়ে বেশি ভারি হয়।

গাছের ফাঁকে বনরক্ষকের ঘরখানা দেখা গেল যখন গ্রিয়েগ তখন মেয়েটিকে বললেন:

'এবার তুমি নিজেই সাজিটা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে, তাই না ডাগ্নি পেডের্সেন? নরওয়েতে কিন্তু তোমার এই নামের আরও অনেক বাচ্চা মেয়ে আছে। আচ্ছা, তোমার বাবার নামটা কী যেন?'

'হাগেরুপ,' জবাব দিল মেয়েটি, তারপর ভুরু কুঁচকে শুধোল:

'আপনি একটুখানি আসবেন না আমাদের বাড়িতে? আমাদের একখান এমব্রয়ডারি-করা টেবিলঢাকা আচে, একটা বাদামি বেড়ালও আচে, আর আচে সেই কাচের নৌকোটা। আমি জানি, ঠাকুন্দা আপনারে নৌকোটা হাতে ধরতে দেবে।'

'ধন্যবাদ, ডাগ্নি, কিন্তু এখন আমার সময় নেই কিনা তাই যেতে পারছি না। আচ্ছা চলি, কেমন?'

মেয়েটির মাথায় আস্তে একটু চাপড় দিলেন গ্রিয়েগ, তারপর পেছন ফিরে সমুদ্রের দিকে হেঁটে চলে গেলেন। ঠোঁট ফুলিয়ে ডাগ্‌নি দেখল উনি চলে যাচ্ছেন। অন্যমনস্ক হওয়ায় হাতের সাজিটা তার একটু কাত হয়ে গিয়েছিল আর সাজি থেকে দেওদারের মোচাগুলো ঝরে-ঝরে পড়ছিল মাটিতে।

'একটা সঙ্গীত রচনা করতে হবে মেয়েটিকে নিয়ে,' ভাবলেন গ্রিয়েগ। 'আর সঙ্গীতটির ছাপা উৎসর্গ-পত্রে আমি নির্দেশ দেব এই কথাগুলো ছাপানোর: 'বনরক্ষকের বৃত্তিজীবী হাগেরুপ পেডের্সেনের কন্যা ডাগ্‌নি পেডের্সেনকে, তার অষ্টাদশতম জন্মদিন উপলক্ষে'।'

* * *

বের্জেনে সবকিছু চলছিল যেমন চিরকাল চলে ঠিক তেমনই। কেবল অনেককাল আগেই গ্রিয়েগ তাঁর ঘর থেকে যা-কিছু শব্দ শুষে নেয় তা দূর করে দিয়েছিলেন। যেমন, যতসব কার্পেট, দরজার পর্দা, গদিমোড়া আসবাবপত্র। এখন একখানিমাত্র ডিভান ছাড়া তাঁর ঘরে আর কিছু নেই। ডিভানটাতে জনা-দশেক পর্যন্ত মানুষ বসতে পারে। শেষ পর্যন্ত আর ওটাকে ফেলে দিতে ভরসা পান নি গ্রিয়েগ। বন্ধুরা বলেন তাঁর বাড়িখানা নাকি কাঠুরের ঘরের মতো দেখতে হয়েছে। ঘরখানার একমাত্র শোভা হল প্রকাণ্ড পিয়ানোটা। কল্পনার শক্তি জাগ্রত যার সে কিন্তু এই নিরাভরণ শাদা চার দেয়ালের মধ্যে সুরের আশ্চর্য মোহন যাদুর স্পর্শ পায়। উত্তর মেরু-সাগরের অন্ধকারে তিলে-তিলে সঞ্চয়-করা ঢেউয়ের প্রচণ্ড গর্জন আর সেই ঢেউয়ের

ওপর শিস দিয়ে বাতাসের উন্মত্ত গান থেকে শুরু করে শুনতে পায় সে কোথায় একটি ছোট্ট মেয়ে তার ন্যাকড়ার পুতুলটিকে কোলে করে ঘুমপাড়ানি গান গাইছে, তা-ও।

পিয়ানো গাইতে পারে ভালোবাসার গান, মহৎ কিছু করার জন্যে মানুষের আবেগ-উদ্দীপনার গাথা, দুনিয়ায় যা-কিছু আছে তার কাহিনী গান গেয়ে শোনাতে পারে পিয়ানো। গ্রিয়েগের শক্তিশালী আঙুলের চাপে ঢেউ খেলে যায় কালো-শাদা চাবিগুলোয় আর সহস্র ধারায় ছড়িয়ে পড়ে আকুল আকাঙ্ক্ষা, হাসির উচ্ছ্বাস, আবেগ আর ক্রোধের বন্যা। আর তারপর হঠাৎ প্রশমিত হয়ে যায় সবকিছু। কেবল একটামাত্র অস্পষ্ট সুরের আভাস সেই নৈঃশব্দ্যের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, যেন বোনেদের দুর্ব্যবহারে মর্মাহত সিন্ডারেলা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে গ্রিয়েগ সুরের এই শেষ রেশটুকু কান পেতে শুনতে থাকেন যতক্ষণ-না সেটা হারিয়ে যায় রান্নাঘরে ঝিঁঝির ডাকের মধ্যে। ঝিঁঝিপোকাটা কিছুদিন থেকে ওই রান্নাঘরে আস্তানা গেড়েছে।

এরপরই গ্রিয়েগ শুনতে পান জলের কল থেকে টিপটিপ করে জল পড়ছে, যেন মেট্র্যানোম-যন্ত্রের নিখুঁত যথাযথতা নিয়ে প্রতিটি সেকেন্ড গুনছে জলের ফোঁটা। যেন বলছে, সময় কারও জন্যে বসে থাকে না, যা করবে বলে মনস্থ করেছ তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেল তা।

ডাগ্‌নি পেডের্সেনের জন্যে সঙ্গীত রচনা করতে এক মাসেরও বেশি সময় নিলেন গ্রিয়েগ।

ইতিমধ্যে শীত এসে গিয়েছিল, কুয়াশার ঘন মোড়কে মুড়ে গিয়েছিল শহরটা।

দুনিয়ার নানা দিকদেশ থেকে মরচেধরা জাহাজগুলো

এসে জাহাজঘাটার কাঠের পাটাতনের ধারে নিরুদ্বেগে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে ঝিমোতে থাকে। দেখতে-দেখতে বরফ পড়া শুরু হয়, আর গ্রিয়েগ দেখেন জানলার ওধারে ঝাঁকে-ঝাঁকে সজোরে ছুটে চলেছে তুষার-কণা আর জড়িয়ে যাচ্ছে গাছের মাথায়-মাথায়।

ভাষা আমাদের যতই সমৃদ্ধ হোক সঙ্গীতের ভাষা মুখের কথায় ধরা অসম্ভব।

তরুণী মেয়ে হওয়া যে কী সুখের, কতখানি আনন্দের সঙ্গীতের অক্ষরে তাই লিখছিলেন গ্রিয়েগ।

আর লিখতে-লিখতে তিনি যেন দেখলেন ঝকঝকে সবুজ চোখ নিয়ে আনন্দে রুদ্ধশ্বাস একটি মেয়ে তাঁর দিকে ছুটে আসছে। মেয়েটি এসে দুই হাতে গ্রিয়েগের গলা জড়িয়ে ধরল আর তাঁর না-কামানো পাকা দাড়িতে-ভরা গালে উষ্ণ গালখানি চেপে ধরে বলল, 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ আপনাকে!' কেন-যে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে তা পর্যন্ত জানে না সেই মেয়ে।

আর গ্রিয়েগ তাকে বলেন, 'তুমি সূর্যের মতো, মিষ্টি হাওয়া আর পাখিডাকা ভোরের মতো। একটি শাদা ফুল তোমার বুকের মধ্যে ফুটে রয়েছে আর তোমার সমস্ত সত্তাটিকে ভরিয়ে তুলেছে বসন্তের সৌগন্ধ্যে। জীবনটাকে আমি দেখে নিয়েছি। যে যাই বলুক তুমি কিন্তু সর্বদাই মনে রেখো বড় আশ্চর্য সুন্দর এই জীবন। আমি এখন বুড়ো হয়েছি, কিন্তু আমার গোটা জীবন, আমার শিল্পকর্ম, আমার শিল্পদক্ষতা সবকিছু উৎসর্গ করেছি আমি তারুণ্যকে। আমার সবকিছু প্রত্যর্পণের অপেক্ষা না-রেখেই দিয়ে দিয়েছি আমি, আর হয়তো এজন্যেই আমি এমন কি তোমার চেয়েও সুখী, বুঝেছ ডাগ্নি।

'রহস্যময় আলোর বিভাব নিয়ে তুমি উত্তরের শ্বেতরাত্রি, ডাগ্‌নি। মূর্তিমতী সুখ তুমি। তুমি প্রত্যূষার প্রথম আলোর ঝলক। তোমার কণ্ঠস্বরে রক্ত ছলকে ওঠে, কেঁপে ওঠে বুক।

'যা-কিছু তোমাকে বেষ্টন করে রয়েছে, যা-কিছু স্পর্শ করছে তোমাকে কিংবা তোমার স্পর্শ পাচ্ছে, যা-কিছু তোমাকে আনন্দ দিচ্ছে কিংবা চিন্তার খোরাক যোগাচ্ছে তা-ই পবিত্র হোক, মহিমান্বিত হোক।'

এইসব ভাবনাকেই সঙ্গীতের রূপ দিলেন গ্রিয়েগ। তাঁর মনে হচ্ছিল যেন আরও অনেকে তাঁর এই বাজনা শুনছে। সেই শ্রোতারা কারা তা ভাববার চেষ্টা করতেই তাঁর মনে হল—তারা ওই বাইরে গাছের-ওপর-বসে-থাকা নীল নীল টিট্‌পাখির ঝাঁক, বন্দরে ফুর্তিতে-মাতোয়ারা মাল্লারা, পাশের বাড়ির ধোপা-বউ, ঝিঁঝিপোকাটা, মেঘে-ঢাকা আকাশ থেকে ঝরা তুষার আর ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক-পরা সিন্ডারেলা।

প্রত্যেকেই ওরা নিজের-নিজের মতো করে এই সঙ্গীত শুনছে।

নীল টিট্‌পাখিরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু যতই ওরা ছটফট করুক আর ডাকাডাকি করে মরুক, বাজনার শব্দ ডুবিয়ে দিতে পারছে না কিছুতেই। ফুর্তিতে-মাতোয়ারা মাল্লারা বসে আছে বাড়ির নিচের সিঁড়িতে, চোখে জল নিয়ে বাজনা শুনছে তারা। ধোপা-বউ কাপড় কাচা বন্ধ করে পিঠ টান করে দাঁড়িয়েছে আর জলে-ভরা লাল-লাল চোখদুটো মুছে ফেলে মাথাটা নাড়ছে। আর টালি-বাঁধানো চুল্লির একটা ফাটল থেকে ঝিঁঝিপোকাটা বেরিয়ে এসে দেয়ালের ফোকর দিয়ে তাকিয়ে আছে গ্রিয়েগের দিকে।

পড়ন্ত তুষার মাঝপথে বাতাসে ভেসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যায় সঙ্গীতের ঢেউখেলানো সুর লুফে-লুফে নেবে বলে। হাস্যময়ী সিন্ডারেলা মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখে তার খালি-পায়ের কাছে রাখা রয়েছে একজোড়া কাচের জুতো। জুতোজোড়া নাচছে আর গ্রিয়েগের ঘর থেকে যে-বাজনার সুর ভেসে আসছে একে অপরের গায়ে ঠোকা দিয়ে তাল রাখছে তার সঙ্গে।

গ্রিয়েগের কাছে এরা সবাই সঙ্গীতের আসরের সুবেশ শ্রোতাদের চেয়ে অনেক বেশি প্রিয়।

* * *

আঠারো বছর বয়সে ইশ্‌কুলের পড়া শেষ করল যখন ডাগ্‌নি, তখন তার বাবা ঠিক করলেন যে মেয়ে কিছুদিন ক্রিস্টিয়ানিয়ায় তাঁর বোন মাগ্‌ডা-র কাছে গিয়ে বেড়িয়ে আসুক। ভাবলেন, বাচ্চা মেয়েটা (যদিও ডাগ্‌নি এখন ঘন চুলের রাশ নিয়ে রীতিমতো তন্বী তরুণী, তবু বাবা এখনও ওকে বাচ্চা মেয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না)—বাচ্চা মেয়েটা একবার ঘুরেফিরে দুনিয়াটাকে দেখুক আর এক-আধটুকু আনন্দ করে নিক। কেননা কে বলতে পারে ভাগ্যে ওর কী আছে? হয়তো উঁচু মনের, অনুরক্ত স্বামী জুটতে পারে ওর, কিন্তু নীচমনা, কৃপণ আর ভোঁতা স্বামীও-যে জুটবে না তা-ই বা কে বলতে পারে? কিংবা ও হয়তো গাঁয়ের দোকানে বিক্রিওলা মেয়ের চাকরি পাবে? নাকি বের্গেনে জাহাজী কোম্পানিগুলোর কোনো একটার দপ্তরে চাকরি পাবে, তা-ই বা কে বলতে পারে?

যে-থিয়েটরে স্বামী নীল্‌স পরামানিকের কাজ করেন

মাগ্‌ডা সেখানেই কাজ করেন পোশাক তৈরির।

থিয়েটরের বাড়ির ওপরে ছাদের ছোট্ট একখানা ঘরে থাকেন ওঁরা, আর ঘরটা থেকেই দেখা যায় ইব্‌সেনের প্রকাণ্ড প্রতিমূর্তিটা আর ফিয়োর্ডে নোঙর-করা জাহাজগুলোর নানারঙের উজ্জ্বল নিশান।

সারাদিন ঘরের খোলা জানলা দিয়ে ভেসে আসে জাহাজের বাঁশির শব্দ। পিশে নীল্‌স জাহাজের এই বাঁশি এত ভালো করে চিনে গেছেন যে তিনি বলেন বাঁশি শুনেই নাকি তিনি বলে দিতে পারেন বন্দরে কোন-কোন জাহাজ ভিড়েছে এখন—সে কি কোপেনহাগেনের 'নর্ডার্নার' জাহাজ, নাকি গ্লাসগো থেকে এসেছে 'স্কটিশ মিন্‌স্ট্রেল', না বোর্দো থেকে এল বুঝি 'জোয়ান-অব-আর্ক'।

পিশি মাগ্‌ডার ঘরখানা থিয়েটরের সাজসরঞ্জামের টুকরো-টাকরায় ভরা। যেখানে-সেখানে ছড়ানো ব্রোকেড, সিল্‌ক, জালি-জালি করে বোনা রেশমি কাপড়, ফিতে, লেস, উটপাখির কালো পালক-লাগানো পুরনো আমলের ফেল্টের টুপি, বেদেদের শাল, পাকা মাথার পরচুলা, ব্রোঞ্জের নাললাগানো অশ্বারোহীর পায়ের উঁচু বুটজুতো, তরোয়াল, হাতপাখা, থাকে-থাকে ভাঁজ-করা রুপোর জুতো, আরও কত কী। এই সবকিছু সেলাই করা, মেরামত করা, সাফসুতরো করা, ইস্ত্রি করা—এ-সবই ওঁর কাজ।

ওঁদের ঘরের দেয়ালগুলোও নানা বই আর পত্রিকা থেকে কাটা ছবি দিয়ে ঠাসা। চতুর্দশ লুইয়ের আমলের অশ্বারোহী সৈনিক, ফাঁপানো ঘাগরা-পরা সুন্দরী মহিলা, বীরব্রতী, সারাফান ফ্রকপরা রুশ মেয়ে, নাবিক, মাথায় ওকপাতার মালা-জড়ানো ভাইকিং জলদস্যু, এমনি আরও হরেকরকম ছবি।

সরু একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ঘরটা পর্যন্ত। সদ্য-লাগানো রঙ আর সোনালি কলাইয়ের বার্নিশের গন্ধে সিঁড়িটা ভরা।

* * *

থিয়েটর দেখে ডাগ্নির নেশা লেগে গেল, ঘনঘন থিয়েটরে যেতে শুরু করল সে। কিন্তু অভিনয় দেখার পর রাত্রে ঘুমনো কঠিন হয়ে পড়ল তার পক্ষে, কখনও-কখনও বিছানায় শুয়ে কেঁদে ভাসাতে লাগল পর্যন্ত।

এতে মাগ্ডা-পিশি চিন্তিত হয়ে উঠলেন, তিনি ডাগ্নিকে এই বলে ভোলাতে চেষ্টা করলেন যে স্টেজে যা-কিছু সে দেখছে তা-ই সত্যি বলে বিশ্বাস করা উচিত হচ্ছে না তার। একথা কানে যেতে নীল্স-পিশে কিন্তু মাগ্ডাকে 'ডিমে-তা-দেয়া ভিতু মুরগি' বলে ঠাট্টা করলেন, আর বললেন, ব্যাপারটা বরং উল্টো, থিয়েটরে যা দেখানো হয় সেই সবকিছু বিশ্বাস করাই উচিত, কেননা তা না হলে লোকের পক্ষে থিয়েটর দেখার দরকারই পড়ত না। এটা শুনে ডাগ্নি থিয়েটরের ব্যাপারস্যাপার বিশ্বাস করেই চলল।

তা সত্ত্বেও মাগ্ডা-পিশি বললেন যে অন্তত মুখ বদলানোর জন্যেও ডাগ্নির একবার থিয়েটরের বদলে সঙ্গীতের জলসায় যাওয়া উচিত। নীল্স অবশ্য এতে আপত্তি করলেন না। বললেন, 'সঙ্গীত হল প্রতিভার দর্পণ।'

দুর্বোধ্য লম্বা-চওড়া কথা বলতে ভালোবাসেন নীল্স। তিনি আরও বললেন যে ডাগ্নি হল ঐকতান বাজনার মুখপাতের সুরটুকুর মতো আর মাগ্ডা থিয়েটরের পোশাক বানান বলে মানুষের ওপর ঐন্দ্রজালিক শক্তি বিস্তারের

ক্ষমতা রাখেন তিনি। কেননা সকলেই জানে যে কোনো লোক যখন নতুন পোশাক পরে তখন সে সম্পূর্ণ বদলে যায়। এ-থেকেই বোঝা যায় কাল যে জঘন্য খুনী সেজেছে কেমন করে আজ সেই অভিনেতা ব্যাকুল প্রেমিক বনে যেতে পারে, আসচে কাল যে অভিনয় করবে দরবারের বিদূষকের কী করে আসচে পরশু সে বনে যাবে গণনায়ক।

আর নীল্‌স যখনই এ-ধরনের কথাবার্তা শুরু করেন মাগ্‌ডা-পিশি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, 'এসব আবোলতাবোল বকুনিতে কান দিস নে তো ডাগ্‌নি! কী যে বকচে তোর পিশে তা ও নিজেই জানে না, কুঁড়েঘরের পণ্ডিতমশাই এয়েচেন একবারে!'

সেদিনটা ছিল জুনমাসের উত্তপ্ত একটা দিন, শ্বেতরাত্রির সময়কার দিন একটা। শহরের পার্কে খোলা আকাশের নিচে ক'দিন থেকেই সঙ্গীতের জলসা চলছিল।

জলসা শুনতে মাগ্‌ডা আর নীল্‌সের সঙ্গে ডাগ্‌নিও যাচ্ছে। প্রথমে সে পরতে চাইছিল তার একমাত্র শাদা পোশাকটা, কিন্তু নীল্‌স বললেন সুন্দরী মেয়ের উচিত তার পরিবেশ থেকে বিসদৃশ সাজপোশাক পরা। এ-বিষয়ে তাঁর লম্বা বক্তৃতা শেষ পর্যন্ত এই বক্তব্যে এসে পেঁছিল যে শ্বেতরাত্রিতে কালো পোশাক পরাই নাকি প্রশস্ত, যেমন উলটো, অন্ধকার রাত্রে পরা প্রয়োজন ঝলমলে শাদা পোশাক।

নীল্‌সের সঙ্গে তর্কে এঁটে ওঠা অসম্ভব, তাই ডাগ্‌নি রাজি হল নরম রেশমি মখমলের কালো একটা পোশাক পরতে। পোশাকটা থিয়েটরের পোশাকের আলমারি থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছিলেন মাগ্‌ডা-পিশি।

ডাগ্‌নি পোশাকটা পরতেই অবশ্য মাগ্‌ডাকে মেনে নিতে হল যে নীল্‌স সম্ভবত খাঁটি কথাই বলেছেন—কেননা

রহস্যময় ওই মখমলের পোশাক ছাড়া তরুণী মেয়েটির পাণ্ডুর মুখখানি আর বিবর্ণ সোনালির আভালাগা দীঘল চুলের রাশের শোভা বুঝি তেমন করে খুলত না।

'দ্যাখো, দ্যাখো, মাগ্‌ডা,' আস্তে-আস্তে বললেন নীল্‌স। 'ডাগ্‌নিকে এত সুন্দর দেখাচ্চে যে মনে হচ্চে ও যেন প্রেমিকের সঙ্গে প্রথমবার মোলাকাতের জন্যে বেরোচ্চে।'

'ঠিক বলেচ! তবে আমাদের মধ্যে প্রথম যখন দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল তখন কোনো দুর্দান্ত সুপুরুষ ছোকরার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল বলে তো মনে পড়ে না। বুঝলে, বুড়ো বাচাল কোথাকার!' বলে মাগ্‌ডা-পিশি আদরভরে নীল্‌সের কপালে একটা চুমু দিলেন।

ঠিক সূর্যাস্তের সময় ঐতিহ্য অনুসারে বন্দর থেকে পুরনো কামানটা দাগার পর তবে সঙ্গীতের জলসা শুরু হল।

যদিও ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী সন্ধে ঘনিয়ে এসেছিল তবু কি সঙ্গীত-পরিচালক কি বাজিয়ের দল কেউই তাঁদের বাজনার স্ট্যাণ্ডে-লাগানো ছোট-ছোট আলোগুলো সুইচ টিপে জ্বালিয়ে দিলেন না। তখনও আকাশে এত আলো যে আশপাশের লাইমগাছগুলোর পাতার ফাঁকে-ফাঁকে যে-সব বাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল তা স্পষ্টতই জ্বালানো হয়েছিল জায়গাটার শোভা বাড়ানোর জন্যে, রোশ্‌নাইয়ের জন্যে নয়।

জীবনে সেই প্রথম ডাগ্‌নি সিম্ফনি-সঙ্গীত শুনল। ওর ওপর অদ্ভুত একটা প্রভাব বিস্তার করল সে-সঙ্গীত। এক সুর থেকে অন্য সুরে সংক্রমণের জায়গাগুলোয় আর চড়ায় সুর উঠে ঝঙ্কার দেয়ার সময় ওর চোখের সামনে যেন স্বপ্নে-দেখা অসংখ্য ছায়ামূর্তি রূপ ধরতে লাগল।

হঠাৎ একসময় চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল ও। মনে হল ল্যাজঝোলা-কোটপরা রোগামতো যে-লোকটি একের-পর-এক সঙ্গীতের নাম-পরিচয় ঘোষণা করে যাচ্ছিলেন তিনি যেন হঠাৎ ওরই নাম বললেন।

'আমায় তুমি ডাকলে নাকি, নীল্‌স-পিশে?' পিশেকে শুধোল ও। আর তাঁর মুখে অদ্ভুত একটা ভাব ফুটে উঠতে দেখে নিজেই ও থতমত খেয়ে গেল।

নীল্‌স ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন অবাক বিস্ময় আর আনন্দে ভরা একটা ভাব নিয়ে। মাগ্‌ডা-পিশিরও মুখের ভাবটাও ছিল একই রকম, মুখে রুমাল চাপা দিয়ে তাকিয়ে ছিলেন তিনি।

'কী হয়েচে বল তো?' শুধোল ডাগ্‌নি।

ওর বাহুমূল চেপে ধরে কানে-কানে মাগ্‌ডা বললেন: 'কী বলচে শোন্‌-না!'

আর তখন ডাগ্‌নি শুনল সেই ল্যাজঝোলা-কোটপরা লোকটি বলছেন:

'ভদ্রমহোদয়া ও মহোদয়গণ! শ্রোতাদের মধ্যে পেছনের সারির কেউ-কেউ আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন ফের একবার এই সঙ্গীতের পরিচয়সূচক ঘোষণাটি শুনিয়ে দিতে। এজন্যে আমি জানাচ্ছি যে আমাদের অনুষ্ঠানসূচির পরবর্তী সঙ্গীতটি হচ্ছে প্রখ্যাত সুরকার এড্‌ভার্ড গ্রিয়েগের রচিত একটি গান। এই গানটি গ্রিয়েগ উৎসর্গ করেছেন 'বনরক্ষকের বৃত্তিজীবী হাগেরূপ পেডের্সেনের কন্যা ডাগ্‌নি পেডের্সেনকে, তার অষ্টাদশতম জন্মদিন উপলক্ষে।'

শুনে এমন গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল ডাগ্‌নি যে তার বুকটা ব্যথা করে উঠল। ভেতর থেকে উথলে-ওঠা চোখের জল ঠেকাতে চেষ্টা করছিল সে, কিন্তু কিছুতেই তা

বাগ মানল না। সামনের দিকে উপুড় হয়ে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢাকল সে।

নিজের বুকের ভেতরটাই এমন তোলপাড় করছিল যে প্রথম-প্রথম কিছুই সে শুনতে পাচ্ছিল না। তারপর একসময় সে শুনল, কোথায় যেন কতদূরে খুব ভোরবেলা রাখালের শিঙা বেজে চলেছে আর অনেকগুলো তারে যেন তার প্রতিধ্বনি উঠছে কেঁপে-কেঁপে। দেখতে-দেখতে সেই সুরটা ফুলে-ফেঁপে উঠল, উঠে গেল আকাশে, ঝোড়ো বাতাসের মতো গাছের মাথায়-মাথায় ঝাপট হানতে লাগল, ছিঁড়েখুঁড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছত্রখান করে দিতে লাগল পাতার রাশ, ঘাস পর্যন্ত উপড়ে ফেলল মাটি থেকে আর মুখে ছিটিয়ে দিয়ে গেল ঠান্ডা হাওয়ার ধারা। ডাগ্‌নির মনে হল বাজনাটা থেকে যেন একটা ঠান্ডা হাওয়ার ঢেউ উপচে-উপচে পড়ছে। জোর করে অনেক চেষ্টায় নিজেকে শান্ত করল ও।

হ্যাঁ, এই তো বাজনার সুরে-সুরে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার সেই জঙ্গল, পাহাড়ে-ঘেরা তার জন্মস্থান, রাখালের শিঙার ডাক, সমুদ্রের গুনগুনুনি। আর কাচের নৌকোগুলো ফেনা তুলে জল কেটে ছুটেছে আর বাতাস তাদের মাস্তুলে-পালে ঘা দিয়ে শিস কাটছে। তারপর সেই শব্দ চাপা পড়ে গেল আর শোনা গেল নীল ঘণ্টাফুলের টুংটাং শব্দ, হাওয়ায় উলটেপালটে ঢেউ খেলিয়ে যাওয়া পাখির গলাকাঁপানো সুর, বাচ্চাদের হৈ-হল্লা আর সেই মেয়েটির গান যার প্রেমিক জানলায় ছুড়ে দিয়ে গেছে একমুঠো বালি। ডাগ্‌নি তার জন্মস্থানে পাহাড়-অঞ্চলে এই গান কতবার শুনেছে।

ও! তাহলে সেই পাকামাথার বুড়ো মানুষটি, যিনি নাকি দেওদার-মোচায় ভরা সাজিটা বাড়ি পর্যন্ত বয়ে দিয়ে তাকে

সাহায্য করেছিলেন, তিনিই হলেন মস্ত সঙ্গীত-বিশারদ গ্রিয়েগ! আর সে কিনা তাঁকে ধমক দিয়েছিল এই দোষারোপ করে যে তিনি তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারেন না!

আর এ-ই হল গিয়ে তাঁর সেই উপহার যা তিনি বছর-দশেকের মধ্যে ডাগ্‌নিকে দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন!

কৃতজ্ঞতার বুক-উজাড়-করা অশ্রু গোপন করার চেষ্টাটুকুও না-করে অঝোরে কাঁদতে লাগল ডাগ্‌নি। ওর মনে হল সঙ্গীতটির সুর যেন এখন মাটি আর শহরের আকাশভরা মেঘের মধ্যেকার ফাঁকটুকু সবটাই ভরে ফেলেছে। আর সেই সুরের ঢেউ পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘে অল্প-একটু শিহরণ তুলছে আর মেঘের ফাঁকে প্রকাশ হয়ে পড়ছে তারার দল।

সঙ্গীতটি এখন এক আহ্বানের রূপ নিয়েছে। সে ডাগ্‌নিকে ডাকছে তার পিছুপিছু এমন এক রাজ্যে যেতে যেখানে বিয়োগ-বিচ্ছেদের দুঃখ ভালোবাসার দীপটুকু নিবিয়ে দিতে পারে না, যেখানে অপরের সুখে বাদ সাধে না কেউ, সূর্য যেখানে ঝলমল করে পরীর দেশের রানী-মায়ের মাথার মুকুটের মতো।

হঠাৎ সেই সুরের স্রোত বেয়ে ওর পরিচিত একটা গলা ভেসে এল। কে যেন বলল, 'তুমি-যে মূর্তিমতী সুখ, ডাগ্‌নি। তুমি-যে প্রত্যূষার প্রথম আলোর ঝলক!'

সুরের ঝঙ্কার মিলিয়ে গেল এতক্ষণে আর শুরু হল হর্ষধ্বনি, হাততালি। প্রথমে আস্তে-আস্তে ধীর লয়ে, আর তারপর প্রচণ্ড তীব্র একটা ঝঙ্কার তুলে।

ডাগ্‌নি আসন ছেড়ে উঠে দ্রুত পার্কের ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। আর সবাই মুখ ফিরিয়ে দেখতে লাগল ওকে। হয়তো তাদের মধ্যে কেউ-কেউ আন্দাজ করল

যে এই তরুণী মেয়েটিই নিশ্চয় ডাগ্নি পেডের্সেন হবে, গ্রিয়েগ যাকে উৎসর্গ করেছেন তাঁর অমর সঙ্গীতটি।

'উনি মারা গেছেন শুনেছি,' ডাগ্নি ভাবছিল। 'কিন্তু কেন মারা গেলেন?' আহ্, যদি ও এখন একবার তাঁর দেখা পেত! যদি তিনি হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়ে যেতেন এখানে! তাহলে তাঁর দিকে পড়িমরি করে ছুটে যেতে-যেতে বুকটা কী ধড়ফড়ই-না করত ওর, আর তারপর ও দু'হাত দিয়ে তাঁর গলাটা জড়িয়ে ধরত আর চোখের জলে-ভেজা ওর গালটা আদরভরে চেপে ধরত তাঁর গালে, ফিস্‌ফিস করে বলত, 'ধন্যবাদ!' আর তখন উনি হয়তো শুধোতেন, 'কেন বল তো?' আর ও জবাব দিত, 'তা তো জানি না!.. তবে আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে ভোলেন নি বলে, ধন্যবাদ আপনার উদারতার জন্যে, যে-সব সুন্দর জিনিস আমাদের জীবনকে তাৎপর্যে ভরিয়ে তোলে আমাকে তা চিনিয়ে দিয়েছেন বলে।'

জনশূন্য, ফাঁকা রাস্তা ধরে হেঁটে চলল ডাগ্নি, ওর খেয়াল নেই যে নীল্‌সও পিছুপিছু আসছেন আর ওর চোখ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছেন। মাগ্‌ডাই ওঁকে পাঠিয়েছিলেন ডাগ্নির পিছুপিছু আসতে। নীল্‌স হাঁটছিলেন মাতালের মতো টলতে-টলতে আর তাঁদের মতো সাধারণ মানুষের জীবনে কী-যে এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেল তা-ই নিয়ে কিছু-একটা বিড়বিড় করে বকতে-বকতে।

শ্বেতরাত্রির ছায়া-ছায়া গোধূলি তখনও ডানা মেলে আছে শহরের ওপর, কিন্তু উত্তরদেশের প্রত্যূষা তার মধ্যেই হালকা সোনালির ছোপ লাগিয়েছে বাড়িঘরের জানলার কাচে।

ডাগ্‌নি নেমে এল সমুদ্রের ধারে। মুখে একটুও ফেনা না-তুলে পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে সমুদ্র।

নিজের হাত-দুখানা চেপে ধরে, যে-পৃথিবীর বুকের আশ্রয়ে আছে ও কিন্তু যাকে ডাগ্‌নি পুরোপুরি বুঝতে পারে না সেই পৃথিবীর বিহ্বল-করা সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে অস্ফুট একটা চিৎকার করে উঠল।

তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'জীবন, তোমাকে বড্ড ভালোবাসি!'

চোখ বড়-বড় করে সমুদ্রের স্বচ্ছ পাঁশুটে জলে জাহাজগুলোর আলোর মৃদু দুলুনি দেখতে-দেখতে হঠাৎ হেসে উঠল ডাগ্‌নি।

আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে চুপিসারে নীল্‌স সেই হাসির শব্দ শুনলেন। শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন তিনি। ডাগ্‌নির জন্যে আর তাঁর কোনো দুশ্চিন্তা রইল না। তিনি বুঝলেন, বৃথাই নষ্ট হবে না ডাগ্‌নির জীবন।

১৯৫৩

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union



সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক গল্পের রচয়িতা কন্‌স্তান্‌তিন পাউস্তোভ্‌স্কিকে (১৮৯২-১৯৬৮) বলা হয় রুশ প্রকৃতির চারণ। উপন্যাস, কাহিনী, ছোটগল্প ইত্যাদি নিয়ে তিনি পঞ্চাশটিরও বেশি বই লিখেছেন।

এই গল্প-সংকলনটিতে আছে ক. পাউস্তোভ্‌স্কির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা ‘কলখিদার বাদা’ এবং কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গল্প।

বইটিতে ক. পাউস্তোভ্‌স্কির নিজের লেখা একটি ভূমিকা আছে। তাতে লেখক নিজের এবং নিজ রচনার কথা বলেছেন।